শ্রীমদ্ভগবদগীতা

অতুলচন্দ্র সেন

বদগীতা

জগতে যে সকল বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের সকলেরই মূলে আছে এক বা একাধিক গ্রন্থ। সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাদের উপদেশ ও নির্দেশই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন। খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরান এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু ইহার অনুরূপ কোন গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের নিয়ামক—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ বেদকে এইরূপ গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ হিন্দুর মধ্যে একজনেরও বেদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তো দূরের কথা, ঐ গ্রন্থের সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্ম্ম মানিয়া চলেন তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ ও উপদেশ বেদের মধ্যে মিলিবে না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা উপনিষদ ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনকে হিন্দু ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যদি এমন কোন একখানি গ্রন্থের নাম করিতে হয়, যাহা হিন্দুমাত্রেই ধর্মের মূল উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, তবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার নামই আমাদের মনে হয়। অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দুই যে গীতাকে হিন্দু

... পরের কভারের পাতায়

SRIMAD BHAGAVAD GITA
Edited in Bengali by :
Professor Atul Chandra Sen

Published by :
HARAF PRAKASHANI
A-126, College St. Market
Calcutta : 700007
Phone : 2416898

PRICE RS

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৩৬ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আগস্ট ১৯৭১
তৃতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
পুনর্মুদ্রণ ঃ শনিবার ১ জানুয়ারী ২০০০
১৬ পৌষ ১৪০৬ ■ ২৩ রামাযান ১৪২০

মুদ্রণ ঃ
স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫৮এ/বি লোয়ার রেঞ্জ
কলকাতা-৭০০০১৯

প্রকাশনা ঃ
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭
ফোন ঃ ২৪১৬৮৯৮

প্রচ্ছদ ঃ কাজী আমীনূর রহমান

সূচীপত্র

বিষয়সূচী

শ্লোকসংখ্যা

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায় শ্লোকসংখ্যা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায় শ্লোকসংখ্যা

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায় শ্লোকসংখ্যা

সংযতেন্দ্রিয়, সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন ও সর্বজীবের
হিতসাধনে রত লোকেরা ঈশ্বরকেই লাভ করেন।
গীতা ১২।৪

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ:

আ—আনন্দগিরি	রামানুজাচার্য—রা
নী—নীলকণ্ঠ সুরী	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—বি
ব—বলদেব বিদ্যাভূষণ	শংকরাচার্য—শ
ম—মধুসূদন সরস্বতী	শ্রীধরস্বামী—শ্রী

উল্লিখিত প্রাচীন ভাষ্যকারদের পরিচয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী-কৃত 'গীতাভাষ্য পরিক্রমা' প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবনা

আমার পূজনীয় পিতৃদেব কর্তৃক সম্পাদিত ভগবদ্‌গীতার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই সংস্করণে তিনি বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মত আলোচনা করে বিশদ ও প্রাঞ্জল বাংলা ব্যাখ্যার সাহায্যে গীতার দুরূহ তত্ত্বগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করে তুলতে প্রয়াসী হন। তাঁর সম্পাদিত গীতা তখনকার দিনে পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে।

বহুকাল পূর্বে বইখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। নানা কারণে দীর্ঘকাল এর পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। কোন প্রকাশক যে গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণে উৎসাহী হবেন, এমন ভরসাও ছিল না। আমার পিতৃব্যতুল্য পূজ্যপাদ ডঃ পার্বতীচরণ সেন এই দুঃসাধ্য কাজে আমাকে প্রথম অনুপ্রেরিত করেন। পরে উৎসাহ আসে বন্ধুবর শ্রীশীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এঁদের প্রেরণা, উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে এ-কাজ আদৌ আরম্ভ হত কিনা সন্দেহ। ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও বহু হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টায় আর্থিক ও অন্যান্য বিবিধ সাহায্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসেন। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় পুস্তকখানির পাঁচ শত কপি প্রাক্-প্রকাশন মূল্যে বিক্রীত হয়। এই অর্থ সম্বল করে আমরা পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকার্য আরম্ভ করি। অবশেষে ১৯৭১ সালে এর প্রকাশ সম্ভব হয়।

এই সময় প্রকাশনার ব্যাপারে যে সব সহৃদয় ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবের সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করছি পূজ্যপাদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখা ছাড়া এর প্রকাশনার ব্যাপারেও তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন এবং নিজেদের বহু কাজের মধ্যেও সময় করে প্রয়োজন মত উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে প্রভৃত সাহায্য করেছেন। এঁরা ছাড়া যাঁদের সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় গীতার এই সংস্করণখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন ডঃ অমলেন্দু বসু, শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, ৺ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ও আবদুল আজীজ আল্-আমান। এই রচনাগুলির দ্বারা শুধু যে পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, গীতার শাশ্বত ও সর্বজনীন বাণী বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হওয়ায় তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হয়েছে বলে আমরা মনে করি। পুস্তক সম্পাদনার বিভিন্ন কাজে আমাদের অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন শ্রীকমলকুমার সিংহ, শ্রীমিহির গুপ্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অনুজপ্রতিম শ্রীরাধু গোস্বামী। স্বস্তিক মুদ্রণালয়ের ডঃ সুজিত কুমার ধর ও শ্রীপ্রভাকর লাখি ব্যক্তিগতভাবে এই পুস্তকের মুদ্রণকার্যে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহদান করেছেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত পুস্তকখানি যথাসময়ে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব হত। এঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অনতিকাল পরেই পুস্তকের সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়। পিতৃদেব সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলীর ন্যায় গীতার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনার কাজেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসেন 'হরফ প্রকাশনী'র কর্ণধার সাহিত্যিক বন্ধু আব্দুল আজীজ আল্-আমান। সকল ধর্মমতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল আজীজ সাহেবের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে এই বিশালায়তন গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ একেবারেই অসম্ভব হত বলে মনে করি। আজীজ সাহেবের উৎসাহ শুধু গীতা, উপনিষদ ও কোরান শরীফ প্রকাশনায় সীমাবদ্ধ নয়, চারিটি বেদ-সংহিতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশনার সুমহান কাজেও তিনি ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হোক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

গীতার বর্তমান সংস্করণে আমরা কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ের সংযোজনা করেছি। প্রথমত, বাংলা এবং ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত ভগবদ্গীতা গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক সটীক তালিকা গ্রন্থশেষে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে গীতার শ্লোকাদির অনুক্রমণিকা এবং পারিভাষিক শব্দসমূহের একটি নির্দেশপঞ্জী। গ্রন্থের সর্বত্র পুরাতন বানানরীতি পরিবর্তিত করে আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

১৯৭৫ সালে পিতৃদেবের জন্মের একশত বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে ভগবদ্গীতার এই নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। পিতৃদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম সংস্করণ তাঁর পূজনীয় জনক-জননী, স্নেহময়ী ভগিনী ও পতিপ্রাণা সহধর্মিণীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ গ্রন্থকারের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁরই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তকের বর্তমান সংস্করণখানি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে নিবেদন করলাম। যে অকৃত্রিম অনুরাগ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গীতার ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হন, বর্তমান সংস্করণখানি পাঠকবর্গের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করলে তা সফল হয়েছে মনে করব এবং আমাদের শ্রমও সার্থক বলে পরিগণিত হবে।

১৬।৫ ডোভার লেন
কলকাতা ৭০০০২৯
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

রণব্রত সেন

মুখবন্ধ

ভগবৎকৃপায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মুদ্রণকার্য এতদিনে সমাপ্ত হইল। তিন বৎসর পূর্বে কাশীধামে এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়। কিন্তু তথায় বাংলা অক্ষরে পুস্তকমুদ্রণের বিশেষ অসুবিধাবশতঃ গীতা প্রকাশের কাজ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৎপর এক বৎসরকাল আমার শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন পুস্তকের কাজ এক প্রকার স্থগিত ছিল। ভগবৎকৃপায় স্বাস্থ্যের কতকটা উন্নতি হওয়াতে ঢাকাতে আসিয়া আমি পুনরায় এই কার্যে ব্রতী হই। এক্ষণে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যে পুস্তকের মুদ্রণকার্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি তাহা একমাত্র ভগবানেরই অপার করুণা।

শ্রীগীতার বহু সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কেন এই নূতন সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইলাম তাহার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করি। গীতার যে সকল সংস্করণ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি অতি বিস্তৃত। এই সকল সংস্করণে প্রাচীন গীতাচার্যগণের কৃত ভাষ্য ও টীকা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের বাংলা ব্যাখ্যা না থাকাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বা অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐসকল সংস্কৃত টীকা হইতে বিশেষ কোনও সাহায্য পান না। পক্ষান্তরে কতকগুলি সংস্করণ অতি সংক্ষিপ্ত, ঐসকল পুস্তকে মূল শ্লোক, অন্বয় ও অনুবাদ ব্যতীত আর বেশী কিছু নাই। কিন্তু শ্রীগীতা এমন গ্রন্থ নহে কেবল অনুবাদ পড়িয়াই যাহার সম্যক্ অর্থপরিগ্রহ হইতে পারে।

উপরোক্ত অসুবিধার কথঞ্চিৎ নিরসনকল্পেই বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অন্বয়ের সহিত অনুবাদ, শ্লোকের বিশদ অর্থ, প্রাচীন গীতাচার্যগণের প্রণীত ভাষ্য ও টীকা হইতে সংকলিত গীতার প্রয়োজনীয় শব্দসমূহের বাঙ্গালা অর্থ এবং পরিশেষে সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করা যায় যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ এবং অল্প সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ এই সংস্করণ দ্বারা গীতাপাঠে কথঞ্চিৎ সাহায্য পাইবেন।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমি পূর্ববর্তিগণের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। প্রাচীন গীতাচার্যগণের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাঁহাদের নাম অধিকাংশ পাঠকেরই সুবিদিত।

বর্তমান যুগের গীতাব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 'Essays on the Gita' নামক অপূর্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন এবং অনেক স্থলেই আমি তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় 'অরবিন্দের গীতা' নামে উপরোক্ত গ্রন্থের একখানা অতি উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ অনুবাদ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে আমি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কারণে উক্ত মনীষিদ্বয়ের নিকট আমি একান্ত কৃতজ্ঞ।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের গীতা হইতেও আমি বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থ হইতেই আমার গীতাপাঠের প্রথম আরম্ভ। মজুমদার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যদিও তাঁহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমি সকল স্থলে গ্রহণ করিতে পারি নাই তথাপি তাঁহার ঋণ আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গীতাও আমার যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিলকের গীতা, বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্পূর্ণ গীতা, মহাত্মা গান্ধীর গীতা, কৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও স্থলবিশেষে সাহায্য পাইয়াছি।

গীতার সম্যক্ ব্যাখ্যা করা আমার মত অধমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি পূর্ববর্তী প্রাচীন ও আধুনিক গীতাচার্যগণের ভাব ও চিন্তা সাধারণ পাঠকবর্গের উপকারার্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন আমি ভাল করিয়া প্রুফ দেখিতে পারি নাই, তদ্দরুন পুস্তকে অনেক ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ এবিষয় আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা
১৩৪৩ সাল

ভূমিকা

জগতে যে সকল বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের সকলেরই মূলে আছে এক বা একাধিক গ্রন্থ। সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহার উপদেশ ও নির্দেশই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন। খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরান এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু ইহার অনুরূপ কোন্ গ্রন্থ হিন্দু ধর্মের নিয়ামক—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ বেদকে এইরূপ গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক লক্ষ হিন্দুর মধ্যে একজনেরও বেদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তো দূরের কথা, ঐ গ্রন্থের সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্ম মানিয়া চলেন তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ ও উপদেশ বেদের মধ্যে মিলিবে না। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা উপনিষদ ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনকে হিন্দু ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যদি এমন কোন একখানি গ্রন্থের নাম করিতে হয়, যাহা হিন্দুমাত্রেই ধর্মের মূল উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নামই আমাদের মনে হয়। অন্ততঃ অধিকাংশ হিন্দুই যে গীতাকে হিন্দু ধর্মের মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে উপনিষদ প্রভৃতি জ্ঞানমার্গের পথ-প্রদর্শক এবং এরূপ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারীর সংখ্যা খুব বেশী নাই। কিন্তু গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—মোক্ষ লাভের এই তিনটি পথের সম্বন্ধেই উপদেশ ও নির্দেশ আছে। মানুষ নিজের প্রকৃতি অনুসারে ইহার যে কোনও পথ অনুসরণ করিতে পারে; আর গীতার উক্তি সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয়, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের দুরূহ তথ্যগুলি অনেকের পক্ষেই বোঝা খুব কঠিন।

এই সমুদয় কারণে গীতা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ইহার উপদেশ সর্বজনীন সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, কারণ ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই এবং বর্তমান কালের হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক গীতাকে প্রচলিত হিন্দু ধর্মমতের দার্শনিক ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ও আত্মার স্বরূপ এবং মানবের কর্তব্য ও অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ গভীর ভাবের সহিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে তাহার তুলনা হিন্দুর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে গীতা কেবল লক্ষ লক্ষ হিন্দু নহে, বিদেশী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন। ইহার দার্শনিক তথ্য সম্বন্ধে অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

সংক্ষেপে আমরা যাহাকে গীতা বলি, তাহার সম্পূর্ণ নাম 'ভগবদ্গীতা উপনিষৎ' অর্থাৎ ভগবান (ভগবৎ) কর্তৃক কথিত (গীত) আধ্যাত্মিক শাস্ত্র (উপনিষৎ)। ইহা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের একটি অংশ মাত্র (২৫ হইতে ৪২, এই আঠারো

অধ্যায়) ; পৃথক কোন গ্রন্থ নহে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভে বিশাল রণপ্রাঙ্গণে দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত—পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি রথে উপবিষ্ট অর্জুন সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—এই যুদ্ধে বহু গুরুজন ও আত্মীয়বর্গ নিহত হইবে, সুতরাং আমি যুদ্ধ করিব না। তখন কৃষ্ণ যে সমুদয় উপদেশ দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন, তাহাই গীতায় আঠারোটি অধ্যায়ে সাত শত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কৃষ্ণ নিজেকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের এই অংশ শ্রীমদ্-ভগবদ্-গীতা নামে অভিহিত হইয়াছে।

রণোন্মুখ দুই বিরাট সৈন্যদলের মধ্যে রথে বসিয়া সারথি শ্রীকৃষ্ণ যে এই বিরাট গ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াছিলেন—তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহাভারতের অন্যত্র ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, নলদময়ন্তীর ন্যায় বৃহৎ উপাখ্যান এবং মূল কাহিনীর সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ অনেক অবান্তর অংশ যোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই একমত। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে মহাভারত বা ভারত নামক একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত প্রণালীতে ইহা বর্ধিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। খ্রীষ্টের জন্মের চারি বা পাঁচ শত বৎসর পরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে শত সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারতের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই সহস্র বৎসরের মধ্যেই মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান আকারে পৌঁছিয়াছিল এবং তাহার পরে আর ইহার মধ্যে বিশেষ কিছু যোগ করা হয় নাই—এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ববাদিসম্মত। গীতা নামক কোন পৃথক গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা যে উক্ত সহস্র বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়া মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যোগ করা হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু কোন্ সময়ে যে গীতা নামক গ্রন্থ অথবা মহাভারত গ্রন্থের এই অংশ রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে ভাগবত নামক ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপনিষদ হিসাবেই ভগবদ্‌গীতা রচিত হয়। কারণ নিষ্কাম-কর্ম-মূলক যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয় এই সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্ব গীতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একজন যবন (গ্রীক) রাজার দূত নিজে ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'দেবদেব বাসুদেব'-এর একটি গরুড়-ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ধ্বজ বা প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে এবং এই যবন রাজা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং এই সময়ে ভাগবত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই ভগবদ্-গীতা রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গার্বে (Garbe) মনে করেন যে মূল গীতা খ্রীষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হয় এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টের দুইশত বৎসর পরে বর্তমান রূপ ধারণ করে। গীতার ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি বিচার করিয়া ভারতীয় পণ্ডিত তেলাং সিদ্ধান্ত করেন যে ইহা খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত হয়। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে ইহার রচনাকাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী।

খুব প্রাচীন কাল হইতেই গীতা ভারতের সর্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহাকবি কালিদাস, তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস এবং কাদম্বরী-প্রণেতা বানভট্ট যে গীতার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ইঁহাদের পরবর্তী শঙ্করাচার্য (নবম শতাব্দী) গীতার টীকা প্রণয়ন করেন। কহ্লণ পণ্ডিত লিখিত রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর প্রদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা অবন্তিবর্মণের মৃত্যুকালে (৮৮৩ খ্রীঃ) সমগ্র গীতাখানি তাঁহার নিকট পাঠ করা হয় এবং তিনি বিষ্ণুধামের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। বর্তমান কালেও বহু হিন্দুর মৃত্যু আসন্ন হইলে গীতা পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং শ্রাদ্ধ-বাসরে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। এখনও বহু হিন্দু সমগ্র গীতা গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া থাকেন।

গীতার জনপ্রিয়তা ও বৈশিষ্ট্যের আর একটি প্রমাণ ইহার বহুল প্রচার। ইহার শত সহস্র পুঁথি ভারতের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে গীতা প্রথম কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর গীতার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হইবে না।

সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই গীতা হইতে স্বীয় ধর্মের তত্ত্ব সংগ্রহ করেন—কারণ ইহাতে বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে আর কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। গীতার প্রসিদ্ধির ইহাই বিশেষ কারণ। এই কারণেই এত অধিক সংখ্যক সংস্করণ থাকিতেও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন গীতার নূতন এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বহুদিন হইল ইহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র-কন্যাগণ এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করিয়া পিতার প্রতি সম্মান ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

বর্তমানে 'বাংলাদেশ'-এর (ভূতপূর্ব পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের) অন্তর্গত ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে বাহেরক নামক গ্রামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দর্শন ও সংস্কৃতে অনার্স (Honours) সহ তিনি বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও দর্শনশাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে স্বর্ণগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাঁহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব না হওয়ায় তিনি ইহা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানেও ছাত্রদের সহিত শিক্ষকের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন। পরে তিনি পাবনা কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতায় রিপন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষক থাকাকালীন তিনি ছাত্রদিগকে সমাজসেবা কার্যে প্রেরণা দিতেন। তিনি নানাস্থানে শিক্ষক ছিলেন এবং বিদ্যালয় ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে যত্নবান হন। স্বদেশী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

অতুলচন্দ্র ছাত্রদের উপযোগী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষকের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি দুইখানি উপনিষদ ('কঠ' ও 'কেন') ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৩৪৩ সালে (ইং ১৯৩৬) গীতার এই সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন, তিনি নিজেই এই গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিতে তাহার

কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রচলিত সংস্করণসমূহের অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সাধারণ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকদের পক্ষে দুর্বোধ্য। আবার অনেকগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। ইহাতে মূল শ্লোক, অন্বয় ও অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নাই। এই দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াই তিনি গীতার নূতন সংস্করণ প্রণয়নে ব্রতী হন। ইহাতে প্রতি শ্লোকের অন্বয়ের সহিত বাংলা অনুবাদ, বিশদ অর্থ এবং প্রাচীন ভাষ্যগুলিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ এবং সরল বাংলা ভাষায় শ্লোকের মর্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ না হইলেও গীতার প্রকৃত মর্ম কি—সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে।

এই সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হয়; কিন্তু গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় পুনরায় মুদ্রিত হয় নাই। অতুলচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্রকন্যাগণের উদ্যম ও চেষ্টায় ইহা পুনরায় প্রকাশিত হইল। আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে অনেকেই গীতার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

জন্মাষ্টমী
১৩ আগস্ট ১৯৭১

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থকার পরিচিতি

স্বর্গত অতুলচন্দ্র সেনের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সম্পাদিত ভগবদ্‌গীতা ও উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীর পুনঃপ্রকাশ করা হল। অতুলচন্দ্রের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই মনস্বী ব্যক্তি শুধু গীতা ও উপনিষদ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি যে তাঁর নিজের জীবনেও এই দুই মহাগ্রন্থের আদর্শ অনুসরণ করতেন তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে আমরা পাঠকের কাছে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

অতুলচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায়, পদ্মার তীরবর্তী বাহেরক গ্রামে। শৈশব থেকেই পুস্তক ও পত্রিকা পাঠের প্রতি অতুলচন্দ্রের গভীর মনোযোগ ছিল। স্কুলে ও বাহিরে তিনি কঠোর শাসনের ভিতর প্রতিপালিত হন। এ-সম্পর্কে 'আমার ছাত্রজীবন' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "একদিকে যেমন সাংসারিক কুটিলতা আমার চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই, অপর দিকে বাহিরের সহিত সংযোগের অল্পতা হেতু জীবনের সর্বদিক তেমন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। মোট কথা 'সোজা' মানুষ বলিলে যেই শ্রেণীর লোক বুঝায় আমি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলাম। চালাক এবং চতুর বলিয়া আমি এ-জীবনে কখনও খ্যাতি লাভ করিতে পারি নাই।"

অতুলচন্দ্রের পিতা ৺কালীপ্রসন্ন সেন নিজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নি। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে এসে এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও উদারতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তিনি সন্তানের শিক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়াস পেতেন, চরিত্র গঠনের প্রতিও তাঁর তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মাতা উমাসুন্দরী ছিলেন উদার প্রকৃতির রমণী; পরের উপকার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। মাতুল ৺বগলামোহন দাশগুপ্ত তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। পিতার চরিত্রগত উদারতা ও শিক্ষার অনুরাগ এবং মাতার সারল্য ও পরোপকার-প্রবণতা উত্তরাধিকার-সূত্রে অতুলচন্দ্র লাভ করেছিলেন।

অতুলচন্দ্র ১৮৯৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রেন্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। পরে ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃত ও দর্শনে যুগ্ম অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। পরের বছর ঐ কলেজ থেকেই দর্শনে এম-এ পাশ করেন। ১৮৯৯ সালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত স্বর্ণগ্রামে রাধানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানশিক্ষকরূপে তিনি যোগদান করেন। ১৯০৩ সালে সিটি কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরের বছর কুমিল্লা জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অচিরেই তাতে তাঁর যথেষ্ট পসার হয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেখানে ওকালতি ব্যবসা করা বেশি দিন সম্ভব হয় নি। কোন এক ফৌজদারী মামলায় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় তিনি তাতে

সম্মত হলেন না। তৎক্ষণাৎ সেই জমাট পসার অক্লেশে ত্যাগ করে তিনি কুমিল্লা ছেড়ে চলে এলেন।

১৯০৭ সালে অতুলচন্দ্র হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। পরে ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হেতমপুর কলেজের তৎকালীন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকরুণাসিন্ধু মজুমদার মহাশয় তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিম্নলিখিত তথ্য জানিয়েছেন—'হেতমপুরের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে স্বর্গত অতুলচন্দ্র সেনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের স্বর্ণযুগ ছিল বলা চলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এই কলেজে বক্তৃতা দেন এবং ছাত্রগণকে বঙ্গভঙ্গের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। অতুলচন্দ্রেরই উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রগুরুকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। তাঁর অধ্যক্ষতার সময়ে হেতমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন এবং অতুলচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।'

বৃটিশ সরকারের অনুরক্ত হেতমপুরের রাজা ও উক্ত কলেজের কর্ণধার রামরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর বৃটিশ ভক্তির জন্য 'মহারাজা' খেতাব পান। দেশপ্রেমিক অতুলচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মহারাজার বিষদৃষ্টিতে পড়েন এবং পরিণামে তাঁকে হেতমপুর ত্যাগ করতে হয়।

হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়বার পর ১৯১১ সালে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। পরে ১৯১৩ সালে তিনি রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। রিপন কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৯১৯ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর জানকীনাথ ভট্টাচার্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২১ সালে আরম্ভ হয় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন। ছাত্ররা তখন কলেজে পিকেটিং শুরু করে। ক্লাশে কোন ছাত্র না থাকাতে অধ্যাপকগণও ক্লাশে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অতুলচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন অধ্যাপকের এই আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন যে ছাত্র থাকুক বা না থাকুক সকল অধ্যাপককেই ক্লাশে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের নাম ডাকতে হবে। এ কাজের তদারক করার ভার পড়ল কলেজেরই হেডক্লার্কের ওপর। অধ্যাপকগণের অনেকেই এ ব্যাপারে অপমানিত বোধ করলেন। স্বাধীনচেতা অতুলচন্দ্র এবং আরও তিনজন অধ্যাপক এই অপমানকর আদেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন।[১] এই ঘটনার সঙ্গেই তাঁর অধ্যাপক তথা চাকুরী জীবনের অবসান ঘটল।

তাঁর শিক্ষক জীবন ব্যাপ্তিতে বিশাল না হলেও কৃতিত্বে উজ্জ্বল। সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী, কর্মশক্তিতে ভরপুর যে মানুষটির কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে পাওয়া গিয়েছে, এখন তাঁকে একটু কাছের থেকে দেখা যাক। প্রকৃতিতে অতুলচন্দ্র

১ উল্লিখিত ঘটনা বিবৃত করেছেন তাঁরই তদানীন্তন সহকর্মী ৺প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ)। তিনিও একই সঙ্গে পদত্যাগ করেন।

অন্যমনস্ক, আত্মভোলা ছিলেন। বহুদিন আমরা দেখেছি তাঁকে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঘরময় পায়চারি করতে। দীর্ঘ গড়ন, উজ্জ্বল রং, দোহারা চেহারা, বিরল-কেশ মস্তক, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরনে সাদা ধুতি এবং পায়ে কেড্স্—এই প্রশান্তমূর্তি, সদা-কর্মব্যস্ত লোকটিকে শত লোকের মধ্যেও খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ছিল না। তিনি ছিলেন যথার্থই ধর্মপ্রাণ; কিন্তু আচার-সর্বস্ব ধর্মকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর যুক্তিবাদী ও মানব-দরদী মনের পরিচয় তাঁর বহু লেখাতে পাওয়া যায়। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন: '...এক শ্রেণীর লোকের মন হইতে ধর্মের নিবিড় যোগ ছিন্ন হইতেছে, অপরদিকে তেমনি অনেক লোক কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। অনেকে দেখা যায় যাঁহারা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথ পালন করেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রে ধর্মের কোন প্রভাবই পড়ে না। যে আচার-অনুষ্ঠান চিত্তকে নির্মল করে না, তাহা ধর্মজীবনের সহায়ক না হইয়া কেবল বন্ধনেরই কারণ হয়। ধর্ম কতকগুলি আচার-নিষ্ঠার পুঞ্জীভূত কঙ্কাল নহে।'

অতুলচন্দ্রের কর্মদক্ষতা বহুবিস্তৃত ছিল। তিনি যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেইখানে তাঁর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন—কোথাও জনহিতকর সমিতির মধ্য দিয়ে, কোথাও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে, কোথাও বা অন্য কোন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। কলকাতা থাকাকালীন তিনি ১৯১৩ সালে 'উমা প্রেস' নামক একটি ছাপাখানা এবং 'সেনগুপ্ত এন্ড কোং' নামক একটি প্রকাশন-সংস্থার পত্তন করেন। এখান থেকে লোক-শিক্ষামূলক নানা পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। ১৯২৬ সালে তিনি কাশীতে চলে আসেন। সেখানে তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'গরুড়েশ্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' ও 'নারী শিক্ষামন্দির' নামক দুইটি বিদ্যালয়। বহু দুঃস্থ অথচ মেধাবী বালক-বালিকা এই দুই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পাঠ করার সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছে। ছাত্ররা যাতে চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল।

রিপন কলেজের চাকুরী ছাড়ার পর তাঁকে আর্থিক অসচ্ছলতার ভেতর দিন কাটাতে হয়। তৎসত্ত্বেও তিনি ধর্মপুস্তকাদি মুদ্রণের কাজ থেকে বিরত থাকেন নি। ফলে সংসারে অনটন যথেষ্ট থাকত; কিন্তু তাঁর পতিব্রতা সহধর্মিণী কুমুদিনী দেবী অভাব-অনটন সবই হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এই কর্তব্যপরায়ণা সাধ্বী রমণী ১৯২৯ সালের ২৬শে মার্চ (মঙ্গলবার) মাত্র ৪৫ বছর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে কাশীধামে পরলোক গমন করেন।

পত্নীবিয়োগের কয়েক বছর পরে ১৯৩৫ সালে অতুলচন্দ্র মুন্সীগঞ্জে (ঢাকা) চলে আসেন এবং পরে কিছুকাল ঢাকা শহরে বসবাস করেন। মুন্সীগঞ্জে থাকাকালীন ১৯৩৬ সালে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত গীতার মুদ্রণকার্য সম্পূর্ণ হয়। এখানে 'কল্যাণ সমিতি' নামক একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি গোড়াপত্তন করেন। এই সমিতি দুঃস্থ ও পীড়িত লোকের সেবা, অস্পৃশ্যতানিবারণ, দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার সাহায্য প্রভৃতি কাজে ব্রতী হয়।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি বিহারের অন্তর্গত আরা ও মধুপুরে বিভিন্ন সমাজহিতকর ও শিক্ষামূলক কাজে ব্রতী থাকেন। পরে কলকাতায় ফিরে

এসে উপনিষদ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে 'কঠ' ও 'কেন' উপনিষদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া আরো সাতখানি উপনিষদের পাণ্ডুলিপি তিনি রচনা করেন। এ-সময় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বাকী উপনিষদের পাণ্ডুলিপি আর ছাপান সম্ভব হয় নি। তার পূর্বেই ১৯৪৮ সালের ১০ই জুন (বুধবার) ৭৩ বছর বয়সে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

পূর্ববর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা অতুলচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনের একটি আলেখ্য চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। যাঁরা নিকট হতে তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে অসংখ্য বন্ধনময় এ-সংসারে বাস করেও কর্মের মাধ্যমে তিনি জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তবে সে কর্ম নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। শিক্ষক, সমাজসেবী ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক অতুলচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন অনুধাবন করলে আমরা তাঁর চরিত্রের এমন কতকগুলি উপাদান দেখতে পাই যা বর্তমান তামসিকতার যুগে একান্ত বিরল।

গীতা ও নয়খানি উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা ছাড়া অতুলচন্দ্র আরও প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সমধিক খ্যাত 'School Essays & Letters' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়ে এখনও চলছে। পরে তাঁর রচিত 'স্বামীর পত্র', 'চরিতমালা', 'জ্ঞানের পথে' এবং শিশু-পুস্তক 'বাল্যসখা' ও 'ফুলের মালা' প্রকাশিত হয়। তিনি 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'কল্যাণী' নামক শিক্ষা ও সেবামূলক দুখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর প্রণীত সমগ্র বাংলা রচনাবলী 'অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি' কর্তৃক শীঘ্রই একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে আর একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের যবনিকা টানব। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে অতুলচন্দ্রের মত ছিল উদার ও বাস্তবধর্মী। এর মূল্যায়ন করিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ '...ইংরাজী সাহিত্য এবং সভ্যতা আমাদের মধ্যে যে কেবল নূতন একটা ভাবের উন্মাদনা উপস্থিত করিয়াছিল তাহা নহে, আমাদের সম্মুখে কর্মের আদর্শও ধরিয়া দিয়াছিল। নানা কর্মবীর পুরুষের চিত্র, কর্মক্ষেত্রের নানাবিধ বৈচিত্র্য, কর্তব্যের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা—ইহারা কিছুতেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না। এরূপ হওয়ারই কথা। মানুষের হৃদয় যখন নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞানের গভীর বৈরাগ্য কি কর্মের কঠোর সাধনা এসব সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চায় না। কোথায় ভাবের একটু উন্মাদনা আছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।'

'জ্ঞানের গভীর বৈরাগ্য ও কর্মের কঠোর সাধনা' অতুলচন্দ্র নিজ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আজ দিশাহারা বাঙ্গালীর জীবনে তাঁর চরিত্রের দীপশিখা কি কিছুমাত্র আলোকদানে সমর্থ হবে?

গীতার দার্শনিক চিন্তা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাট মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গীতার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের সৈন্যদল মুখোমুখি ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে এমন সময় অর্জুন তাঁর সখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন দুই দলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে। রথ স্থাপিত হলে অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা নিকট আত্মীয়। তাই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলে বসলেন, আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্যে প্রণোদিত করতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। যিনি স্বেচ্ছায় হয়েছিলেন পার্থসারথি তিনি ঘটনাচক্রে হলেন পার্থের গুরু। তাঁর উপদেশাবলী নিয়েই গীতা।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গে অর্জুনের সহিত কথোপকথন ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হতে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিবেশ নাটকীয়, কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে খুব সম্ভাব্য বলে মনে হয় না। এই আঠারোটি অধ্যায় যদি মূল মহাভারত হতে সরিয়ে নেওয়া হত তাহলে কাহিনীর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হত না। তাই কেহ কেহ বলেন গীতার মহাভারতে অনুপ্রবেশ পরে ঘটেছে। এই নিয়ে বিতর্ক আছে। সে যাই হোক, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তা প্রাসঙ্গিক হবে না। কাজেই তা নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় গীতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তার মর্যাদা ও খ্যাতি অনন্যসাধারণ। এ বিষয়ে তা বোধ হয় একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গেই তুলনীয়। কারণ, দেখি উভয়কেই অবলম্বন করে পরবর্তীকালে নানা বিশিষ্ট দার্শনিক ভাষ্য লিখে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতের প্রচারের প্রয়াসী হয়েছেন। অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য এবং নানাশ্রেণীর ভক্তিবাদী দার্শনিক, যেমন রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি উভয় গ্রন্থের উপর ভাষ্য লিখেছেন। একদিক হতে দেখতে গেলে ব্রহ্মসূত্র হতে গীতার একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রহ্মসূত্র মূলত বিশ্বতত্ত্বের চিন্তায় সীমাবদ্ধ, তা বিশুদ্ধভাবে দর্শন। গীতায় বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা ত' আছেই, অতিরিক্তভাবে নীতি এবং ধর্মসম্পর্কিত সমস্যারও আলোচনা আছে। অবশ্য ব্যাপক অর্থে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; তবু এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। ঠিক বলতে কি ধর্মতত্ত্বই যেন গীতার মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য আলোচনা আনুষঙ্গিক।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গীতায় দুটি মূল সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। একটি হল নৈতিক সমস্যা। এই প্রসঙ্গে যে বিশেষ সমস্যাটি গীতায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, তা হল, ইচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম কোন্ আদর্শ অনুসারে নিষ্পন্ন হবে। দ্বিতীয়টি হল, ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীর ধর্ম আদর্শস্থানীয়।

যে পরিবেশে গীতার উদ্ভব সেই পরিবেশের সঙ্গে প্রথম প্রশ্নটি সঙ্গতি রক্ষা করে। ধর্মযুদ্ধ হলেও অর্জুন তার পরিণতিতে আত্মীয়-নিধনের সম্ভাবনা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁকে নিজস্ব কর্তব্যে প্রণোদিত করতে এই নৈতিক প্রশ্নটি স্বভাবতই এসে পড়ে। দ্বিতীয় সমস্যাটি ততখানি প্রাসঙ্গিক নয়। তবু উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তার আলোচনা করা হয়েছে এবং কার্যত গীতার বেশীর ভাগ অংশ এই প্রশ্ন নিয়েই জড়িত হয়ে পড়েছে। পরিবেশের বর্ণনা পাই প্রথম অধ্যায়ে। নৈতিক সমস্যার মীমাংসা পাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আর বাকি অধ্যায়গুলি জড়িয়ে মোটামুটি ধর্মসম্পর্কিত সমস্যাটিই আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাও এসে পড়েছে। বিশ্বসৃষ্টি হয় কিরূপে, বিশ্বসত্তার সহিত ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ কি, বিশ্বসত্তা কি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা—এই সব দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনাও এসে পড়েছে। কাজেই গীতা শুধু নীতি বা ধর্মের গ্রন্থ নয়, দার্শনিক গ্রন্থও বটে।

॥ ২ ॥

আমরা এবার গীতা যে দুটি মৌলিক সমস্যার আলোচনা করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব স্থাপন করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

আমরা প্রথমে নৈতিক সমস্যার আলোচনা করব। প্রথম অধ্যায়ে দেখি আত্মীয়ের সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতি কতখানি বেদনাদায়ক তা অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, এযুদ্ধে তাঁর আগ্রহ নেই। এই বর্ণনা সাহিত্যিক গুণ-মন্ডিত এবং হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ, ন চ রাজ্যং সুখানি চ' ('১৷৩১)। তিনি আরও বলেছেন, এমন কি প্রতিপক্ষ তাঁকে আক্রমণ করলেও তাঁর যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নেই ঃ

এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥ ১৷৩৪-৩৫

অর্জুনের এই আচরণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি হৃদয়বান ; তাঁর মমতাবোধ সুন্দর পরিস্ফুট।

কিন্তু ব্যাপারটির অন্য দিকও একটি আছে। মমত্ববোধ হেতু কর্তব্য ত্যাগ করলে ত নীতির আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। সমস্যাটি হল কর্তব্য অপ্রিয় হলে ত্যাগ করা উচিত কি না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই মূল নৈতিক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাঁর প্রতিপাদ্য হল এই ঃ কর্ম না করে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, কিন্তু তা আদর্শনীতির অনুমোদিত নয়। নিজের ধর্মের অনুমোদিত কর্ম করা কর্তব্য। তা হতে বিরত থাকা উচিত নয়। কর্ম নয়, কর্মফল ত্যাগ করাই আদর্শ সন্ন্যাস। তাতে কর্তব্যচ্যুতি ঘটে না, অপরপক্ষে কর্মফলে উদাসীন থাকলে, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সুখ-দুঃখ বোধ দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয় না। তাই মূল বাণী হল ঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২৷৪৭

এখন তাঁর এই প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ দুই ভাবে বুঝিয়েছেন। একটি যুক্তির ভিত্তিতে, অন্যটি কর্মের ভিত্তিতে। প্রথমটিকে সাংখ্যরীতি এবং দ্বিতীয়টিকে যোগরীতি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকটি দেখা যেতে পারে ঃ

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২৷৩৯

এই কথা দুটি সাংখ্য ও যোগদর্শনের সমার্থবোধক শব্দ নয়। সাংখ্যরীতির অর্থ হ'ল বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে যে আদর্শ পাই তাই ; আর যোগরীতির অর্থ হল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হবে তাই। দুই রীতি অনুসারেই তাঁর ধর্মযুদ্ধ হতে বিরত হওয়া উচিত নয়।

সাংখ্যরীতির অনুসারে তাঁর যুক্তি এই ঃ আত্মা অবিনাশী (২৷২০)। যে জন্মায় সে ত মরবেই ; যা অনিবার্য তার জন্য শোক করা উচিত নয় (২৷২৭)। ধর্মের অনুমোদিত যুদ্ধ হতে ক্ষত্রিয়ের মহত্তর কর্তব্য কিছু নেই (২৷৩১)। ধর্মযুদ্ধ করলে কীর্তি, না করলে পাপ হবে (২৷৩৩)।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ যোগরীতিতে এই নৈতিক সমস্যাটির সমাধান করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশে তা মূলত পাই ; অন্য অধ্যায়েও তার সমর্থক উক্তি আছে। যোগরীতির আলোচনা শুরু হয়েছে একটি উদার ত্যাগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সংক্ষেপে তার বর্ণনা হল এই ঃ এই আদর্শে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মের স্থান নেই। অবশ্য বেদে অর্থার্থী হয়ে ধর্ম আচরণের কথা বলা হয়েছে ; বর্তমান আদর্শে এই 'অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'র স্থান নেই ঃ

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২৷৪৪

আদর্শরীতি হল কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, কর্মের ফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা। যিনি সকল কামনা ত্যাগ করেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ২৷৫৫)। আর যিনি সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধে সমান উদাসীন তিনি স্থিতধী (২৷৫৬)। আর কর্মফলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি যাঁর কাছে সমান তিনি যোগী, 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (২৷৪৮)। এই আদর্শকেই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বলা হয়েছে। সুতরাং এই যোগরীতির আদর্শ হবে, নিজ বিহিত ধর্ম অনুসারে যা কর্তব্য তাই করা ; এবং ফল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা ; কর্মত্যাগ নয়। এই হল সংক্ষেপে প্রথম সমস্যার উত্তর।

॥ ৩ ॥

গীতায় দ্বিতীয় যে সমস্যাটির সমাধান দেওয়া হয়েছে তা মূলত ধর্মসম্পর্কিত সমস্যা, অবশ্য প্রসঙ্গত বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা (Ontology) তাতে এসে পড়েছে।

এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। যে বিশেষ সমস্যাটি এখানে আলোচিত হয়েছে তা হল, কোন্ উপাসনারীতি আদর্শস্থানীয়। এখানে একটি উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। সকল রীতিই স্বীকৃত হয়েছে, কোনটি প্রত্যাখ্যাত হয় নি; তবে পারস্পরিক উৎকর্ষ নির্ণয় করে কোনটি মহত্তর সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপাসনারীতির যে শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হয়েছে তারও একটি যুক্তিসম্মত নীতি লক্ষিত হয়। সকল শ্রেণীর উপাসককেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বলেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের নীতি হল ভক্তের মতিগতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ নানা উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে মতি-গতির পথে বিশ্বসত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেহ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আকৃষ্ট হয়, কেহ কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আকৃষ্ট হয়, কেহ শুধু ভক্তি নিবেদনের জন্য আকৃষ্ট হয়। গীতা এঁদের সকলকেই ভক্ত বলেছেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬

যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তিনি আর্তশ্রেণীর ভক্ত, যিনি বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁর শরণ গ্রহণ করেন তিনি অর্থার্থী। যিনি বিশ্বসত্তাকে জ্ঞানমার্গে জানতে চেষ্টা করেন তিনি জিজ্ঞাসু। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই শ্রেণীতে পড়েন। গীতার বিবেচনায় তাঁরাও ভক্ত। আর যিনি শুধু ভক্তির জন্যই ঈশ্বরকে ভক্তি করেন তিনি জ্ঞানী। পরের শ্লোকে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে জ্ঞানী হলেন তিনি যিনি একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তি করেন।

গীতায় এই চার শ্রেণীর ভক্তের সকলকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু উৎকর্ষের দিক হতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে একনিষ্ঠ ভক্তকে! এই প্রসঙ্গে পরের শ্লোকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭।১৭

এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়। এই উক্তির সমর্থন দ্বাদশ অধ্যায়েও পাই। সেখানে বলা হয়েছে, যে ভক্ত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উপর মন নিবিষ্ট করে নিত্য তাঁর উপাসনা করে সেই হল শ্রেষ্ঠ ভক্ত ঃ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২।২

তবে এও স্বীকৃত যে অন্যরীতি যাঁরা অবলম্বন করেন তাঁরা বঞ্চিত হন না। বেদের কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী হয়ে যাঁরা আর্ত ও অর্থার্থীর মনোভাব নিয়ে উপাসনা করেন, তাঁদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিন্দা করা হয়েছে; কারণ তাঁরা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে বা 'অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবু গীতায় বলা হয়েছে তাঁদের উপাসনা

ব্যর্থ হয় না। বলা হয়েছে তার ফলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয় তার জোরে তাঁরা সুরেন্দ্রলোকে যান ঃ

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টবা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ৯।২০

অন্যভাবে উপাসনারীতিও গীতায় স্বীকৃত। যেমন বহুদেবতারূপে বিষ্ণু আদিত্য প্রভৃতি এবং জ্ঞানের পথে সর্বব্যাপী একক সত্তারূপে। সম্পর্কিত শ্লোকটি এই ঃ

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯।১৫

সুতরাং এখানে জ্ঞানমার্গে জিজ্ঞাসুর উপাসনারীতি যেমন স্বীকৃত, তেমন বিভিন্ন দেবতারূপে পূজাও স্বীকৃত।

এই ভাবেই গীতায় উপাসনারীতি সম্বন্ধে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। রুচিভেদে, মতিগতিভেদে মানুষ বিভিন্ন পথে ভক্তি নিবেদন করে। তাদের সকলকেই গীতায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে যেমন পথে আসে তেমনভাবেই তাকে আমি গ্রহণ করি এবং সকলেরই লক্ষ্যবস্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪।১১

তা হলেও এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে গীতার পক্ষপাত একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদে। গীতাকারের বরমাল্য এই তত্ত্বের গলায়ই অর্পিত হয়েছে। আমরা ধর্মতত্ত্বের এই আলোচনায় প্রসঙ্গত বিশ্বতত্ত্বে এসে পড়ি। আমরা উপাসনা করি বিশ্বের মৌলিক সত্তাকে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, তাঁর প্রকৃতি কি? কাজেই বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাও সেই সূত্রে এসে পড়ে। বহু ঈশ্বরবাদ যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হয় না। ভক্তিদ্বারাও হয় না, কারণ একনিষ্ঠ পরমভক্তি তাঁর জন্যই মনে উদিত হয় যিনি সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা; তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে না। এখন যুক্তির পথে গেলে আমরা পাই সর্বেশ্বরবাদ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে বিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তা। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ তার সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভক্তিবাদের অনুকূল নয়, কারণ এই সত্তা নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল। হৃদয়বৃত্তি বলে এমন দেবতা চাই যিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হবেন। তা না হলে তাঁকে ভক্তি করব কি করে? ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হতে হলেই ভক্ত হতে তাঁকে পৃথক হতে হয়, সৃষ্টি হতেও তাঁকে পৃথক হতে হয়। এইভাবে হৃদয়বৃত্তির দাবি পূরণ করতে একেশ্বরবাদের জন্ম হয়। তা বলে, ঈশ্বর সমগ্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তা হতে পৃথকভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা আছে। খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর তার সুন্দর উদাহরণ। এটা সহজে বোঝা যায় যে অহৈতুকী

ভক্তির বিকাশের জন্য গীতায় একেশ্বরবাদকে বিশেষ সম্মান দেখানোর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

॥ ৪ ॥

গীতাকার কিন্তু এখানেই থামেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য মানবরূপী ঐতিহাসিক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তার মূল মন্ত্র হল 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। সেইজন্যেই অবতারবাদের পরিকল্পনা। যে ভক্তির আদর্শ গীতায় স্থাপিত হয়েছে তাতে শুধু ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ প্রতিষ্ঠিত হলে, তার অনুকূল পরিবেশ রচিত হয় না; অতিরিক্তভাবে ভক্তির পাত্র হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকেই গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণরূপে ঈশ্বরের ভক্তির প্রচার তার লক্ষ্য। তাই মহাভারতের ঘটনা যে সময় ঘটেছিল সেই যুগের বিশিষ্ট নায়ক মানবরূপী ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়েই তাই বলা হয়েছে যে ধর্মস্থাপনের জন্য ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্যেই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভাব ঃ

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

গীতা কিন্তু কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই অবতারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি। তাকে একটি যুক্তিসম্মত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হয়েছে। এখানেই ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য। তাই তা অতিরিক্তভাবে একটি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ। এই চেষ্টার মধ্যেও একটি উদার মনোভাব ক্রিয়াশীল। তা সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এমন একটি দর্শন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে যা সর্বেশ্বরবাদ এবং একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদের একটি সহাবস্থিতি সম্ভব করে। এই দিক হতে গীতা একটি অনন্যসাধারণ দার্শনিক গ্রন্থ। আমরা দেখব এই দর্শনে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব এবং তিনটি গুণের প্রভাবে ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত দৃশ্যমান বিশ্বরূপে তাদের প্রকাশ উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মতত্ত্বও এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। অতিরিক্তভাবে অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ ও একেশ্বরবাদের ঈশ্বর একীভূত হয়ে এই দার্শনিক ব্যাখ্যার মূল প্রতিপাদ্যরূপে স্থাপিত হয়েছেন। সুতরাং সমন্বয় ও সহাবস্থিতির পথে এই দর্শন গড়ে উঠেছে।

॥ ৫ ॥

এই দর্শনটি গড়ে উঠেছে দুটি পর্যায়ে। প্রথমত আমরা দেখব বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য মোটামুটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ওপর উপনিষদের ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক সর্বব্যাপী সত্তার আশ্রয়ে যেন প্রকৃতি ও পুরুষের যুক্ত প্রভাবে, এই বিশ্ব গড়ে উঠেছে, এই তার ইঙ্গিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি বিভিন্ন শ্রেণীর সত্তার বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে এই বিশ্বের মধ্যে যেমন নানা জীব আছে, তেমন দেহাশ্রয়ী বহুপুরুষ (সাংখ্যের অর্থে) আছেন ; অতিরিক্ত

ভাবে তাদের ব্যাপ্ত করে এক সর্বব্যাপী সত্তা (উপনিষদের ব্রহ্ম) আছেন এবং অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। আমরা এইবার কিভাবে গীতার অন্তর্নিহিত দর্শনটি এই দুই পর্যায়ে বিকাশলাভ করেছে তা দেখাতে চেষ্টা করব।

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা আমরা পাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এখানে বিশ্বকে ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে, তার উৎপাদনের কারণ হিসাবে পুরুষ ও প্রকৃতিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ধারক হিসাবে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁকে তাই ক্ষেত্রী বলা হয়েছে। এখানে নীচে উদ্ধৃত দুটি শ্লোকে ক্ষেত্রের বিস্তারিত বর্ণনা পাই ঃ

মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩।৫-৬

উপরের তালিকায় প্রথম শ্লোকে দেখা যাবে পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ তন্মাত্র এবং অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এখানে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি। এগুলি মানুষের আত্মার অনুভূতিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে যে ক্রিয়া বা গুণগুলি প্রকট হয় তাই সূচিত করে। সুতরাং আমার ধারণায় এটি সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব পুরুষকে সূচিত করে। তা না হলে ক্ষেত্রের তালিকা সম্পূর্ণ হয় না। সাংখ্যের পরিকল্পনায় পুরুষ বহু, তারা দেহাশ্রয়ী। অবশ্য পুরুষের বহুত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু প্রাচীন কারিকায় তা স্বীকৃত ; এমন কি যোগদর্শনেও তা স্বীকৃত। সাংখ্য কারিকায় আছে, 'পুরুষবহুত্বং সিদ্ধম্'। যোগদর্শনে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত ; অতিরিক্তভাবে ঈশ্বরকে একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় পাতঞ্জলদর্শন বলে, তিনি হলেন 'ক্লেশকর্মবিপাকাশৈরপরামৃষ্টঃ (ঈশ্বরঃ)'। অর্থাৎ তিনি হলেন বহু পুরুষের অতিরিক্ত একটি বিশেষ গুণমণ্ডিত পুরুষ। সুতরাং বলতে পারি গীতার দর্শনে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংখ্যের এই তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষই মূল তত্ত্ব। অন্যগুলি গৌণ তত্ত্ব। তারা সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের প্রভাবে প্রকৃতির মধ্যেই উদ্ভূত হয়, তারা বিনাশশীল। এই তত্ত্বও গীতায় স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে গীতার এই শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৩।১৯

সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষই অনাদি তত্ত্ব। ত্রিগুণের প্রভাবে প্রকৃতির মধ্যে যে বিকার ঘটে তা হতেই গৌণ তত্ত্বগুলির উদ্ভব। এবিষয়ও সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্যকে গ্রহণ করা হয়েছে।

॥ ৬ ॥

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনে যা পাই তা দর্শনের ভাষায় বহুবাদ। বহুতত্ত্বকে নিয়ে তা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছে। গীতা কিন্তু এখানেই থামে নি। তার ওপর একবাদ আরোপ করেছে, উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের পরিকল্পিত ব্রহ্মকে তার সঙ্গে যুক্ত করে। উপনিষদের পরিকল্পনায় ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সকল কিছু নিয়ে, সকল কিছু ব্যাপ্ত করে তিনি বিশ্বে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই হল তার মর্মকথা! সে তত্ত্বকে গীতা গ্রহণ করে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে এই ভাবে।

তা সাংখ্যের অনুসরণে স্বীকার করে, পুরুষের সংস্পর্শে এসে প্রকৃতির ওপর ত্রিগুণের প্রভাবে এই বহুদ্বারা বিখণ্ডিত বিচিত্র বিশ্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু তাই শেষ কথা নয়। বিশ্বের খণ্ডিত ভাবকে অতিক্রম করে যদি একটি বিরাট সত্তার অঙ্গ হিসাবে তাদের একত্ব চিন্তা করা যায় তা হলে গীতার মতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩।৩০

আরও বলা হয়েছে তিনি সমগ্র বিশ্বের ঐক্যবিধায়ক এবং প্রকাশক শক্তি। সূর্য যেমন সমগ্র সৌরমণ্ডল প্রকাশ করে, তেমন তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ করেন। এ উপনিষদের প্রতিধ্বনি 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। আবার তিনি সব কিছুই ধারণ করেন বলেই ক্ষেত্রী। সাংখ্যদর্শনের অবলম্বনে ব্যাখ্যায় যাকে পাই তা হল ক্ষেত্র এবং তাকে যিনি ধারণ করেন তিনি হলেন ক্ষেত্রী। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩।৩৩

এই ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা আছে। সেখানে যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতেও উপনিষদের বাণীর প্রতিধ্বনি পাই। তিনি সর্বত্র বিস্তৃত, তিনি সব কিছু শুনেন, তিনি সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত :

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।১৩

আরও বলা হয়েছে তিনি একাধারে সৎও বটে অসৎও বটে। তিনি অনাদি, তিনি অব্যয়; তাই সৎ। আবার বিনাশধর্মী দৃশ্যমান জগৎও তাঁর আশ্রয়ে প্রকাশিত, তাই তিনি অসৎ।

॥ ৭ ॥

গীতার দর্শন এখানেও শেষ হয়নি। এর পরে একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের একটি বিরোধ এসে পড়ে। সর্বেশ্বরবাদের পরিকল্পনায় সমগ্র বিশ্বকে জড়িয়ে এক প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা তাকে ঐক্যমণ্ডিত করেছে। একেশ্বরবাদে ঈশ্বর বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি বিশ্ব হতে পৃথক এবং ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা; তাই তাঁকে ভক্তির পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

গীতায় দুয়ের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের (যিনি শ্রীকৃষ্ণ হতে অভিন্ন) ওপর একটি বিশেষ কর্তব্য আরোপ করে। তিনি ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন, তাঁকে আশ্রয় দেন এবং পুরস্কৃত করেন। এই প্রতিপাদ্যটি দুই ভাবে আমাদের কাছে স্থাপিত হয়েছে। তাদের একটি পাই অধিযজ্ঞ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে, অন্যটি পাই পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্য দিয়ে।

প্রথমে অধিযজ্ঞ তত্ত্বটির আলোচনা করা যাক। এখানে বিশ্বের তিনটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে : অধিভূত, অধিদৈবত ও অধিযজ্ঞ। অধিভূত হল বিশ্বের যে অংশ ক্ষয়শীল, যা প্রবহমান, যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা দেখি, জানি। তাই তাকে ক্ষর বলা হয়েছে। অধিদৈবত হল তার যা অক্ষর অংশ, যা অব্যয়। অর্থাৎ তাকে ব্রহ্মের সমার্থবোধক ধরতে পারি। আর অধিযজ্ঞ হলেন ভগবানের অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ; কারণ তিনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ফলদাতা। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এখন উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮।৪

তিনি যজ্ঞের অর্থাৎ সকল রীতির পূজার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

গীতার চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের কার্যক্ষেত্র কেবল ভক্তির পাত্র হিসাবে পূজা-গ্রহণ এবং তার পুরস্কার বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকে নি। কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের যে রূপ ভূমিকা কল্পিত হয় তাও তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে। যেমন, তিনি বিশ্ব বা সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন থেকেও তা নিয়ন্ত্রণ করেন। নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, সকল জীব তাঁরই আশ্রয়ে আছে, অথচ তিনি তাদের মধ্যে অবস্থিত নন। আরও বলা হয়েছে, তিনি জীবকে পোষণ করেন, কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নন, জীবের বাইরে থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টি করেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯।৫

তা সত্ত্বেও মূল সুরটি মনে হয় সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের তথা অবতার-বাদের সামঞ্জস্য সাধন। তা দ্বিতীয় তত্ত্বটি হতে প্রকট হয়ে যাবে।

॥ ৮ ॥

সুতরাং এখন পুরুষোত্তম তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে সমগ্র বিশ্বকেই পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ পুরুষ সাংখ্যদর্শন-কল্পিত পুরুষ নয়, সম্ভবত বেদের পুরুষ সূক্তের অনুসরণে এই পুরুষের পরিকল্পনা। সেই পুরুষকে চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছেঃ ক্ষরপুরুষ, অক্ষরপুরুষ, উত্তমপুরুষ ও পুরুষোত্তম। প্রথম দুটির ব্যাখ্যা একটি শ্লোকের মধ্যেই পাই। তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়বে, কাজেই প্রথমে তাকে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫।১৬

এখানে ক্ষরপুরুষের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তা যে সকল ইতর প্রাণীকে সূচিত করে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু অক্ষরপুরুষ কে, তাই নিয়ে বিতর্ক আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আমার মনে হয় এখানে সরল অর্থ গ্রহণ করে এবং গীতার দার্শনিক প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তার ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। অমর বলেন, কূটস্থ অর্থে বুঝি 'একরূপতয়া যঃ কালব্যাপী সঃ'। অর্থাৎ যিনি কালকে ব্যাপ্ত করে আছেন অথচ যাঁর রূপের পরিবর্তন হয় না, তিনি। আমার মনে হয় এই অক্ষর পুরুষ হল সাংখ্যদর্শন-পরিকল্পিত পুরুষ, অর্থাৎ মানুষের আত্মা। তা অনাদি, স্থায়ী সত্তা এবং সংখ্যায় বহু।

তারপর আসেন উত্তম পুরুষ। তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলেঃ

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৭

ব্যাখ্যা হতেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি সকল লোককে ব্যাপ্ত করে আছেন এবং সব কিছু ধারণ করে আছেন। কাজেই তিনি উপনিষদ পরিকল্পিত ব্রহ্মের সমস্থানীয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

চতুর্থ পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম। তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলেঃ

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮

বেদে পুরুষোত্তমের উল্লেখ আছে বলে আমার জানা নেই, তবে শ্রীকৃষ্ণ যে পুরুষোত্তম বলে খ্যাত তা আমাদের জানা আছে। তিনি ক্ষরকে অতিক্রম করেন, তিনি অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ মানুষের আত্মা হতে উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ ব্যক্তি পুরুষ হতে উৎকৃষ্ট। কাজেই তিনি পুরুষোত্তম। এখানে সর্বেশ্বরবাদের ব্রহ্ম এবং একেশ্বরবাদভিত্তিক অবতারবাদ একসাথে স্থান পেয়েছে।

মনে হয় গীতার মূল প্রতিপাদ্য হল অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। সেটা বিশেষ প্রকট হয় দশম ও একাদশ অধ্যায়ে। উপরে দেখা গেছে তিনটি অক্ষর পুরুষের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছেঃ মানুষের আত্মা বা ব্যক্তি-মানুষ (যা হল সাংখ্যের পুরুষ); সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন ব্রহ্ম যাকে বলা হয়েছে উত্তম পুরুষ; এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষোত্তমরূপে। এখানে কাজেই ঈশ্বর সম্পর্কে তিনটি মূলতত্ত্ব এসে পড়েঃ অক্ষর ব্রহ্ম, বিশ্বের এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বর (এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে পরিকল্পিত) এবং শেষে তাঁর অবতাররূপী পুরুষোত্তমবেশী মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ। এই অবতাররূপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে দেখানো হয়েছে শ্রীকৃষ্ণই একাধারে তিনটি তত্ত্ব। বিশ্বের অন্তর্নিহিত ধারক তত্ত্ব হিসাবে তিনি ব্রহ্ম, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা ঈশ্বর এবং মানব দেহধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি পুরুষোত্তম। আমরা এইবার গীতার বচন উদ্ধৃত করে উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থন খুঁজব।

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যা কিছু বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর চূড়ান্ত প্রকাশ তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। সকল শক্তির মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত। এই ভাবে তাঁর সর্বব্যাপিত্ব অর্থাৎ উত্তমপুরুষের রূপ সূচিত হয়েছে। তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন তাঁকে নিজ বিভূতির বিষয় বলতে অনুরোধ করে যা বলেছেন তা হতে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এইঃ

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০।১৬

সুতরাং প্রতিপাদ্য হল এই বিভূতির মধ্য দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের সর্বত্র ব্যাপ্তি সূচিত হচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে তিন তত্ত্বেই প্রকট তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। অর্জুনকে যখন তিনি বিশ্বরূপ দেখান তার মধ্যে অর্জুন দুটি তত্ত্ব এক সঙ্গে আবিষ্কার করলেন। প্রথম তার সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপ বা বিশ্বরূপঃ

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১১।১৬

একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে চক্রগদাধর কিরীটিরূপ অর্থাৎ ঈশ্বররূপী বিষ্ণুকে আবিষ্কার করলেনঃ

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১।১৭

এই অধ্যায়ের শেষে অর্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ নিজের চতুর্ভুজ রূপ পৃথক্‌ভাবে আবার দেখালেন (১১।৪৫)। শেষে আবার পার্থসারথি রূপ গ্রহণ করলেন।

সুতরাং যিনি মানবদেহধারী পুরুষোত্তম, তিনিই পৌরাণিক ঈশ্বর বিষ্ণু এবং সর্বব্যাপী বিশ্বের ধারক সত্তারূপে বিশ্বরূপ। এই ভাবে গীতায় বিষ্ণুর অবতার-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

॥ ৯ ॥

গীতায় একটি পুরুষার্থের আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে যা অনন্যসাধারণ। সাধারণত ধরা হয় পুরুষার্থ হওয়া উচিত জন্মান্তর-বন্ধনের খণ্ডন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিসত্তার বা জীবাত্মার বিলোপ ঘটে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মান্তর বন্ধন হতে মুক্তির পর যে অবস্থা কল্পনা করা হয় তাতে জীবাত্মার মুক্তি-উত্তর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন দর্শনে সেই অবস্থার প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাংখ্য-যোগ দর্শন অনুসারে পুরুষ প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বরূপে ফিরে যায়। তখন তার নিঃসঙ্গ কৈবল্যরূপ পরিস্ফুট হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুসারে জীবাত্মা নিত্য, কাজেই মুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ না করে অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। তখন তার 'দুঃখের 'প্রাত্যন্তিক নিবৃত্তি' ঘটে। অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ঘটে না, তা মুক্তির বিদেহ অবস্থা ভোগ করে। জৈনদর্শন অনুসারেও জীবাত্মা এই অবস্থায় কৈবল্য রূপ পায়। কেবল বৌদ্ধ-দর্শনে বলা হয় জন্মবন্ধন হতে মুক্তি ঘটলে নির্বাণ হয়। উপনিষদে মুক্তির প্রশ্নটা তত বড় করে ওঠে নি; ব্রহ্মসম্পর্কিত জ্ঞানই তখন পুরুষার্থ। কাজেই তার কথা বাদ রাখা যেতে পারে। পৌরাণিক আদর্শে ভক্তির পথে জন্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে ঈশ্বরের সাথে সালোক্য বা সামীপ্য প্রাপ্তি ঘটে।

গীতায় এই মনোভাবের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তা বলে জন্মবন্ধন হতে মুক্তি ঘটলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের মত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল গীতার কামনাহীন সাধনার দৃষ্টিভঙ্গি হতে। ধর্মসাধনায়:আর্ত বা অর্থার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে তা সকল কামনা বর্জন করতে চেয়েছে বলেই পরিণতিতে ব্রহ্মে বিলয়-প্রাপ্তিকেই পুরুষার্থ হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি। এই বিশেষ পুরুষার্থ লাভের মার্গও সেখানে সূচিত হয়েছে। তা কামনা ত্যাগ করে কর্মফলে উদাসীন হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন দিয়ে শুরু। কর্মসন্ন্যাস নয় কর্মফল-সন্ন্যাস। এই হল সাধনমার্গের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হল শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ অহৈতুকী ভক্তি। কর্মফল শ্রীকৃষ্ণকেই ত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা নিষ্কাম কর্মসাধনার সহায়ক। তৃতীয় অবস্থায় ভক্তির পথে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অর্জন করতে পারলে তিনিই ভক্তের মনে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে চতুর্থ অবস্থায় মুক্তি অর্জিত হয় এবং মৃত্যুর পর জন্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়। এই হল গীতার প্রতিপাদিত মুক্তির প্রকৃতি এবং মার্গ।

এবার আমাদের এই প্রতিপাদ্য গীতা হতে সমর্থক বাণী উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করব। প্রথমেই বলা হয়েছে সকল কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ না

করার চেয়ে কর্মফল-সন্ন্যাসের উৎকর্ষ বেশী। এর সমর্থনে এই শ্লোকটি স্থাপন করা যেতে পারে :

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫।২

কর্তব্য কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলে নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনা সহজসাধ্য হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন তাঁর ওপর সকল কর্মফল অর্পণ করে ফলে উদাসীন থেকে কর্ম করতে :

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০

শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তের মনের অজ্ঞান-তিমির অনুকম্পা হেতু দূর করে দেন এবং তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার করেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১১

সুতরাং ভক্তির পথেই ঈশ্বরকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এই হল গীতার প্রতিপাদ্য। তত্ত্বজ্ঞান হতে ভক্ত বুঝতে পারে তাঁর প্রকৃতি কি। তিনি যে একাধারে পুরুষোত্তম, বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর এবং সর্বব্যাপী মহাসত্তা ব্রহ্ম তা হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলে মুক্তিলাভ করে ভক্ত তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করে। এর সমর্থনে নীচের শ্লোকটি স্থাপিত করা যেতে পারে :

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫

শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করার অর্থ যে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তির সমস্থানীয় তা গীতায় অন্যস্থানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। প্রামাণিক শ্লোকটি হল এই :

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪।২৬

সুতরাং ভক্ত পরিণতিতে নিষ্কাম কর্মসাধনা ও অহৈতুকী ভক্তির পথে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হন—এ কথা প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল তিনি ত তিন তত্ত্বকেই ব্যাপ্ত করে আছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও অবতাররূপে পুরুষোত্তমতত্ত্ব। এদের কোনটিতে তিনি বিলীন হন? প্রথম শ্লোক হতে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তবে যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় অবতারতত্ত্বে নয়, কারণ তা ঐতিহাসিক রূপ; ঈশ্বরতত্ত্বে নয়, কারণ ঈশ্বর ভক্ত হতে পৃথক, কাজেই তা ব্রহ্মতত্ত্ব হতে বাধ্য। এই কথা দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

গীতাভাষ্য-পরিক্রমা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার পূর্বে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি, যাঁর মুখপদ্ম থেকে এই অমৃতধারা উৎসারিত হয়ে শুধু অর্জুনকেই মোহ-প্রবুদ্ধ করে নি, যুগ যুগ ধরে তাপদগ্ধ নরনারীর প্রাণকে শীতল করেছে। প্রাচীন ভারতে এক শ্রেণীর গ্রন্থ 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, যেমন—গণেশগীতা, শিবগীতা প্রভৃতি। আবার পৃথিবীর বৃহত্তম ও মহত্তম মহাকাব্য মহাভারতে অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে 'গীতা ষোড়শী' অর্থাৎ ষোলখানি 'গীতা', তথাপি যেখানে আমরা 'গীতা' কথাটির প্রয়োগ করি, সেখানে ভগবদ্গীতাকেই বুঝে থাকি। যেমন 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা' অথবা 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা', অথবা ঃ

> গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
> চতুর্গকার সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—এই চারটি গ-কার যাঁর হৃদয়ে অবস্থিত, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

ভারতীয় দর্শনের মুকুটমণি হচ্ছে বেদান্তদর্শন, আর এই দর্শনের তিনটি মূল আকরগ্রন্থ হচ্ছে উপনিষদ্‌সমূহ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদসমূহকে বলা হয়েছে 'শ্রুতিপ্রস্থান', ভগবদ্গীতাকে বলা হয়েছে 'স্মৃতিপ্রস্থান' ও ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয়েছে 'ন্যায়প্রস্থান'। এখানেও দেখা যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে মর্যাদা লাভ করেছে, অন্য কোনো গীতা তা করে নি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের সারভূতা এবং স্বয়ং একখানি উপনিষদ। গীতা কামধেনু আবার গীতা হেমকল্পতরু। গীতা আমাদের সবার কাছে স্নেহময়ী জননীর মতো হিতকারিণী, গীতার বাণী নিখিল মানবের কর্ণে নিত্যকাল অমৃতবর্ষিণী। গীতার ধ্যানেও বলা হয়েছে, 'হে মাতঃ, আপনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃতা, প্রাচীন মুনি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে গ্রথিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্তা, অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃত আপনি বর্ষণ করেন, আপনি মুক্তিদায়িনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি।'

ভগবদ্গীতার বাণী সনাতনী, সর্ব দেশের সর্ব কালের মানুষের হৃদয়গ্রাহিণী, তাই এই গ্রন্থখানির গৌরব আজও অম্লান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আচার্যগণ এবং আধুনিক কালের ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ গীতার ওপর কত নব-নব আলোকপাত করেছেন, তবু গীতার ব্যাখ্যা আজও শেষ হয় নি, কোনো দিন শেষ হবে বলেও মনে হয় না।

গীতার আধুনিক ভাষ্যকারদের সঙ্গে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এ-কালের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতাগণ নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি বা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে গীতার মর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন; কিন্তু ভারতের

প্রাচীন আচার্যগণ গুরুপরম্পরাক্রমে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সাধন-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। গীতার প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য শংকর অদ্বৈতবাদী, রামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, নিম্বার্কাচার্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আর বলদেব ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। এই প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর গীতা-ভাষ্য স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আচার্য শংকরের পূর্বেও যে বহু ভাষ্যকার গীতাব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন শংকরভাষ্য থেকেই সে কথা জানা যায়। আচার্য শংকরের পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য 'মাণ্ডুক্য কারিকা' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র হল—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগৎ মিথ্যা; অর্থাৎ জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক সত্যতা নেই, আর জীব ও ব্রহ্ম হচ্ছেন অভিন্ন। কর্ম মুক্তিলাভের উপায় নয়, কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় বলে কর্ম জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞান, আর এই জ্ঞানের উদয়েই কর্মসন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ হয়ে থাকে। যতক্ষণ আমরা অবিদ্যার অধীন থাকি, ততক্ষণ নামরূপাত্মক জগৎ আমাদের নিকট সত্য বলে মনে হয়। যেমন আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজতভ্রম হয় অথবা মরুভূমিতে বিচরণকালে দূরস্থিত সৌরকর-দীপ্ত বালুকা-রাশিতে জলভ্রম হয়, তেমনি অজ্ঞানবশত আমাদের ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয়ে থাকে। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। মুক্ত পুরুষ উপলব্ধি করেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমিই ব্রহ্ম। যিনি শান্ত, দান্ত, সমাহিত ও শ্রদ্ধাবান, গুরু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেন। তারপর শ্রবণ, মনন বা চিন্তন এবং নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা শিষ্য উপলব্ধি করেন—আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। শংকরের মতে গীতার শিক্ষা হচ্ছে—নিষ্কাম কর্ম বা ভক্তি এই জ্ঞানলাভের উপায়মাত্র। আচার্য শংকর বলেন—আমরা যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা করি, তিনিও মায়া-কল্পিত।

আচার্য শংকরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—জ্ঞানের উদয়ে কর্মসন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ হয়ে থাকে, এটাই গীতার প্রতিপাদ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় গীতার পতিপাদ্য নয়। ভগবান বলেছেন, আমরা জগতে যে বৈচিত্র্য দর্শন করি, তা হচ্ছে একেরই বিচিত্র প্রকাশ। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এটাই হচ্ছে চরম উপলব্ধি। এই জ্ঞানের আবির্ভাবে যে মানুষের সকল কর্ম ত্যাগ হয়, যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর যে কোন কর্ম থাকে না, ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ অগ্নি যে মানুষের শুভাশুভ সকল কর্মকেই ভস্মীভূত করে—এ সকল কথা শ্রীভগবান গীতায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই জ্ঞানলাভের উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছেন ঃ

> শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪।৩৯

যিনি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

আচার্য আনন্দগিরি তাঁর গীতাভাষ্যে প্রধানত শংকরাচার্যের মতেরই অনুসরণ

করেছেন। আচার্য **নীলকণ্ঠ সূরী** মহাভারতের টীকাকার হিসাবে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি শৈবমতে গীতাভাষ্য রচনা করেছেন।

আচার্য শংকরের মতে যেমন গীতায় জ্ঞানযোগের প্রাধান্য, তেমনি রামানুজাচার্যের মতে গীতায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য। বেদান্তে তিন প্রকার ভেদের কথা বলা হয়েছে—স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়। আমাদের দেহে হাতের সঙ্গে পায়ের যে ভেদ, অথবা কোনো একটি বৃক্ষের শাখার সঙ্গে পত্রের যে ভেদ, তা হচ্ছে স্বগত ভেদ। একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের বা একটি গোরুর সঙ্গে আর একটি গোরুর যে ভেদ, তা হচ্ছে সজাতীয় ভেদ। মানুষের সঙ্গে গোরুর বা ঘটের সঙ্গে পটের যে ভেদ, তা হচ্ছে বিজাতীয় ভেদ। আচার্য শংকর বলেন—ব্রহ্মে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় কোনো প্রকারের ভেদ নেই। কিন্তু রামানুজাচার্য বলেন—ব্রহ্মে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হলেও সংসারে যা কিছু অচিৎ (জড়) ও চিৎ (চেতন পদার্থ) আছে, সবই তাঁর শরীর। শংকরাচার্য যেখানে বলেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', রামানুজ সেখানে বলেন, জীব-জগদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। এই জন্যে আচার্য শংকর হচ্ছেন অদ্বৈতবাদী আর রামানুজ হচ্ছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শংকরের মতে মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞান ও কর্মসন্ন্যাস, আর রামানুজের মতে মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে, ভক্তিযোগ আশ্রয় করে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। রামানুজ সম্প্রদায়ের উপাস্য হচ্ছেন চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও শেষ অনন্তদেব। ভগবদ্‌ভজনের দ্বারা যে জীবের উদ্ধার হয়, আর নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মে যাদের চিত্ত আসক্ত, তাদের যে সিদ্ধিলাভের জন্যে অধিকতর ক্লেশ পেতে হয়, গীতায় ভগবান তা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। শংকরের মতে মুক্তির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা ব্রহ্মে লয় হয়ে যাওয়া, কিন্তু রামানুজের মতে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মে লয় হন না, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পার্থক্য বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

বেলের তিনটি জিনিস—শাঁস, বিচি ও খোসা। যখন বেল খেতে হয় তখন বিচি ও খোসা ফেলে দিয়ে শাঁসটুকু খেতে হয়। কিন্তু যখন বেলের ওজন করতে হয়, তখন শাঁসের সঙ্গে বিচি ও খোসা গ্রহণ করতে হয়, নইলে ওজনে কম পড়ে। তেমনি অদ্বৈতবাদী 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে একমাত্র ব্রহ্মকেই অবশিষ্ট রাখেন। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—ব্রহ্মকে গ্রহণ করলে তো জীব ও জগৎকেও গ্রহণ করতে হয়, নইলে ওজনে কম পড়ে।

রামানুজের মতে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেমন ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য, তেমনি গীতারও প্রতিপাদ্য।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ছিলেন অদ্বৈতবাদী ; কিন্তু তিনি মানবজীবনে কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তি-নিষ্ঠারও উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। এই ভক্তিই কর্ম ও জ্ঞানের ভেতর সেতু রচনা করেন। তাঁর কৃত গীতাভাষ্য 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা'য় তিনি এ কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে অদ্বৈত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি-লাভই গীতার প্রতিপাদ্য। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আছে কর্মনিষ্ঠার কথা, সপ্তম থেকে দ্বাদশ-অধ্যায়ে আছে ভক্তিনিষ্ঠার কথা আর শেষ ছয়টি অধ্যায়ে আছে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা। আচার্য শ্রীমধুসূদন স্বয়ং পরম জ্ঞানী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে

ভক্তিমান ছিলেন। তাঁর মতে ভগবদ্‌ভক্তি জীবের পরম কল্যাণ বিধান করে। তিনি অবশ্য কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও শুদ্ধা ভক্তির পার্থক্য করেছেন।

আমরা বলেছি, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের ভক্তিবাদী ভাষ্যকারগণের ভেতর রামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, শ্রীনিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী আর বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। এঁরা সবাই নিজ নিজ মতবাদের আলোকে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু **শ্রীধর স্বামিপাদের** গীতাভাষ্য 'সুবোধিনী'র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।[1]

শ্রীধর স্বামী 'সুবোধিনী' নামে ভগবদ্‌গীতার যে সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করেছেন, তা ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপরিসীম মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর টীকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আঠারোটি অধ্যায়ের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। এক একটি শ্লোকে এক একটি অধ্যায়ের ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন। তাঁর ভাষ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও তিনি ভগবদ্‌গীতায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, তথাপি তাঁর মধ্যে একটি সমন্বয়ী দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মবিদ্যাই মানুষকে বিষাদের ভেতর সান্ত্বনা প্রদান করতে পারে। তিনি কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন ; আবার ধ্যানযোগ ভিন্ন যে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না, সে কথাও স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে পরমেশ্বর একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ও শরণাগতির দ্বারা লভ্য, আর এই পরমেশ্বরের বিভূতি অনন্ত। ভক্ত এই বিভূতির কথা চিন্তা করে সর্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টি লাভ করেন। ভগবান কৃপাময়, কৃপাবশতই তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। সগুণ উপাসনা ও নির্গুণ উপাসনার ভেতর ভক্ত সগুণ উপাসনারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এই তত্ত্বজ্ঞানই ভক্তকে সংসার থেকে উদ্ধার করে। আবার এই জ্ঞানের ফলে বৈরাগ্য জন্মে, আর বৈরাগ্য ভিন্ন জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হতে পারে পারে না। দৈবী সম্পদই মানুষের মুক্তির কারণ ; আর আসুরী সম্পদ বন্ধের কারণ। আবার ভগবদ্ভক্তি ও শ্রীভগবানে শরণাগতির ফলেই মোক্ষলাভ হয়।

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বামিপাদের টীকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা বলতে পারি, তাঁর টীকার নামকরণ সার্থক হয়েছে। তাঁর টীকা অবলম্বন করে যে কোনো জিজ্ঞাসু পাঠকই সহজে গীতার মর্মার্থে প্রবেশ করতে পারেন।

মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রবর্তক। মধ্বাচার্য বলেন জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অধীন হলেও ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মের সাথে জীব বা জগতের কখনো অভেদ সম্পর্ক হতে পারে না। এঁদের উপাস্য লক্ষ্মী-নারায়ণ। গীতা-ব্যাখ্যানে মধ্বাচার্য বলেন, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে মানুষ ভক্তিলাভ করতে পারে। গীতায় ভক্তিরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। ভক্তির দ্বারাই মানুষ ভগবৎ-সামীপ্য নামক মুক্তি লাভ করতে পারে।

বল্লভাচার্য বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণু স্বামীর অনুগামী। এই

১ শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও টীকা রচনা করেছেন।

সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ আবার ব্রহ্মের সঙ্গে এদের অভেদ-সম্পর্কও রয়েছে। এঁরা ব্রহ্মসাযুজ্যের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মুক্তি এঁদের অভীষ্ট নয়। কারণ, এঁরা শ্রীশ্রীবালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন। এঁদের মতে গীতার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে—যাঁরা ভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবানের শরণাগত, তাঁরাই ভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারেন।

নিম্বার্কাচার্য রচিত 'গীতাবাক্যার্থ' অধুনা দুষ্প্রাপ্য। তবে তিনি 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন, তার আলোকে আমরা 'গীতাবাক্যার্থের' সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুমান করিতে পারি। আচার্য নিম্বার্কের মতে গীতায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়েছে। গীতার মতে জীব ও ভগবান ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। জীব ও জগৎ মিথ্যা বা মায়া নয়। ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, তিনি অনন্ত কল্যাণ-গুণোপেত, তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, জীব ব্রহ্ম বা ভগবানের শক্তিরূপ অংশ, জগতের সঙ্গেও তাঁর ভেদাভেদ-সম্পর্ক রয়েছে। মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মে লীন হন না, মুক্ত জীবের সঙ্গেও ব্রহ্মের ভেদ-সম্পর্ক থাকে। ধ্যানসমাহিত শুদ্ধ মনে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মুক্তিলাভের জন্যে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও মননের প্রয়োজন আছে; কিন্তু ভক্তি, প্রপত্তি (শরণাগতি) ও আত্মসমর্পণ ভিন্ন মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না—এই হল গীতার সংক্ষিপ্ত সার।

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর 'গীতাভূষণ' নামক প্রসিদ্ধ টীকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুবর্তী **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী**ও গীতার অন্যতম ভাষ্যকার। এঁরা দুজনেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, জীব ও ভগবান ভিন্নও বটেন, আবার অভিন্নও বটেন। সূর্যের সঙ্গে অংশুর যে সম্পর্ক, অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের যে সম্পর্ক, ভগবানের সঙ্গে জীবেরও সেই সম্পর্ক। ভগবান বিভুচৈতন্য (all pervading consciousness), আর জীব হচ্ছে অণুচৈতন্য; তাই চৈতন্য হিসাবে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু সসীম সান্ত জীব কখনো অসীম অনন্ত ভগবান হতে পারে না, তাই জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। এই যে জীব ও ব্রহ্মের সঙ্গে যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক তা মানববুদ্ধির অগম্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, আর 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। জগৎ মিথ্যা নয়। দেহে আত্মবুদ্ধিই মায়া, আর এই মায়ার প্রভাবে আমাদের ঘটে কৃষ্ণ-বিস্মরণ, তাই আমরা ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হই। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভু সনাতনকে বলেছেন ঃ

কৃষ্ণ ভুলি জীব সব অনাদি বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। রাগানুগা প্রেমভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীভগবান

রসস্বরূপ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রস আশ্রয় করেই ভক্তগণ শ্রীভগবানের ভজনা করেন। অবশ্য এই কয়টি রসের ভেতর মধুর রসই শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের গোপিকাগণ এই মধুর রস আশ্রয় করেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন। এই গোপিকাগণের মধ্যে আবার মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধাই শ্রেষ্ঠ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের উপাসনা করে থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে গীতায় অব্যভিচারিণী ভক্তি ও শরণাগতির মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে। ভগবান বাসুদেবই একমাত্র উপাস্য। জীব শ্রীভগবানেরই অংশ; যাকে আমরা মায়া বলি, তা হচ্ছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আর যাঁরা শ্রীভগবানের শরণাগত, তাঁরাই মায়া-সাগর থেকে উত্তীর্ণ হন। সগুণ, সবিশেষ, অনন্ত কল্যাণ-গুণোপেত শ্রীভগবানের স্মরণ-মননই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধন।

ভারতের প্রাচীন আচার্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু সত্যদ্রষ্টা। ভারতবাসী বিশ্বাস করেন, এই সব আচার্যের সাধনপন্থা ভিন্ন হলেও গম্যস্থান এক। আমরা বলেছি শুধু প্রাচীন আচার্যগণ নন, আধুনিক ভারতের কয়েকজন স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষও গীতার ওপর নব-নব আলোকপাত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখতে পাই, সিদ্ধ পুরুষ **শ্রীরামকৃষ্ণ** দিব্যদৃষ্টির বলে ভগবদ্গীতার মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে—বিষয়ে অনাসক্তি ও ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে গীতার প্রধান শিক্ষা।

আমরা বিশ্বাস করি, গীতা সব দেশের সর্বকালের মানবধর্ম-শাস্ত্র। গীতায় অধিকারবাদ ও সাম্যবাদের, কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের, জ্ঞান ও ভক্তির আপাতবিরুদ্ধ আদর্শ মিলিত হয়েছে। বস্তুত, গীতার ভেতর ভারতবর্ষের নানা যুগের বিচিত্র চিন্তাধারা সংহত বা সমন্বিত হয়েছে।

এ-যুগের যে সকল ভারতীয় মনীষী তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধ্যান-ধারণা অনুসারে গীতা-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের ভেতর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, সত্যদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ, মনস্বী তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে **ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু** গীতার বিশ্লেষণ করেছেন। মনস্বী **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের** 'গীতাপাঠের ভূমিকা'য় লেখকের গভীর মননশীলতা ও দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিব্রাজক **শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন** ও **শ্রীরামদয়াল মজুমদার** প্রাচীন ভাষ্যকারদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে গীতার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। **সোহহং স্বামী** 'ভগবদ্গীতার সমালোচনা'য় গীতার দুটি মূল তত্ত্বের—নিষ্কাম কর্ম ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে গীতার প্রাচীন ভাষ্যসমূহ যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক, সেগুলি আধুনিক মনের সকল সংশয়ের নিরসন করতে পারে না। তাই তিনি বাংলা ভাষায় গীতার ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ ভাষ্য অসম্পূর্ণ বটে, কিন্তু গীতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে হলে তাঁর 'অনুশীলন বা ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ-চরিত্র' এবং উপন্যাসত্রয়ী ('আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম') গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন, 'সীতারাম' উপন্যাসে নায়কের চরিত্রের অধঃপতনের কারণ বুঝতে হলে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি শ্লোক (৬২, ৬৩) মনে রাখতে হবে ঃ

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্ম ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অভিন্ন। তিনি বলেন, সকল বৃত্তির (শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী) অনুশীলন ও সামঞ্জস্যই ধর্ম। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। আমাদের বুদ্ধি বা intellect যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখন তার নাম জ্ঞান, আমাদের হৃদয়াবেগ বা emotion যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখন তার নাম ভক্তি আর আমাদের সংকল্প বা will যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখন তার নাম কর্ম। প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ হীরেন্দ্রনাথকে একদিন বলেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কাম কর্ম, আত্মজ্ঞান ও ভক্তির আদর্শের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করেছেন। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-প্রণেতা দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভক্ত হলেও প্রধানত ছিলেন যুক্তিবাদী। তাই তিনি ভগবদুক্তিরও সমালোচনা করেছেন। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—ভগবানের এই উক্তির মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত রয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রমাণ করেছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর অন্তর্গত 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে গীতার প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ভগবদ্গীতার প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদও করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন—গীতার মূল শিক্ষা রয়েছে পুরুষোত্তম যোগে; পুরুষোত্তমের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করলেই আমাদের জীবন ও চেতনা দিব্য জীবন ও দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত হয়। ফলাসক্তিহীন নিষ্কাম কর্ম আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। শ্রীঅরবিন্দ যে পূর্ণ যোগের কথা বলেছেন, তা শুধু একটা তত্ত্বমাত্র নয়, তা এমন একটি লক্ষ্য যা আমাদের জীবনে রূপায়িত করতে হবে। এই পূর্ণযোগের ভেতরেই অপর সকল 'যোগ' সমন্বিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ কারাগারেই ভগবান বাসুদেবের দর্শনলাভ করেছিলেন। দিব্য দৃষ্টির বলে তিনি ভগবান বাসুদেবের মুখপদ্ম-নিঃসৃত গীতার মর্মবাণীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। এক কালে বাংলার বিপ্লবিগণও ভগবদ্গীতা থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের ও স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শ্রীভগবানের বাণী—মামনুস্মর যুধ্য চ—তাঁদের দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল। আজন্ম-বিপ্লবী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (মহারাজ) 'গীতায় স্বরাজ' এ-বিষয়ে আলোকপাত করবে।

গীতার আধুনিক ভাষ্যকারদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব-বিচারে (comparative theology) তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল, তাঁর কৃত গীতাব্যাখ্যানে (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য বা কর্মযোগশাস্ত্র) তার পরিচয় আছে। তিলকের মতে গীতায় কর্মযোগের প্রাধান্য স্থাপিত হলেও সে কর্ম জ্ঞানভক্তি-বিবর্জিত নয়। প্রবৃত্তিমূলক ভাগবত ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্য। এ-দিক দিয়ে বিচার করলে তিলককে আমরা সমন্বয়ের অন্যতম আচার্য বলতে পারি।

'গীতারহস্যের' অনুবাদক মনস্বী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ঃ

"কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও সেইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়-সাধনের মুখ্য তাৎপর্যটা কি, তিলক তাঁহার গীতারহস্যে তাহারই আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্মই গীতার মধ্যবিন্দু—মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জুনকে সর্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি কর্মের পরিপন্থী নহে, পরন্তু কর্মের পরিপোষক ও সহায়; জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে। এই ভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। কর্মই যে গীতার প্রধান কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা, অর্জুনকে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শুধু 'কর্ম করিবে' বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান বলিয়াছেন যাহা স্বধর্ম-অনুমোদিত, সেই কাজই অবশ্য-কর্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে কর্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মই শ্রেয়। এইরূপ কথা বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় সম্যকরূপে সাধিত হইয়াছে।"

লোকমান্য তিলকের ব্যক্তিগত জীবনেও এই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর মতে গীতার প্রধান শিক্ষা অনাসক্তি-যোগ। গীতায় মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যিনি অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী বা সত্যাগ্রহী, একমাত্র তিনিই অনাসক্ত হতে পারেন। গীতার অর্জুন ঐতিহাসিক অর্জুন নন, গীতার যুদ্ধও ঐতিহাসিক যুদ্ধ নয়. গীতার কুরুক্ষেত্র আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্র, এখানে দৈবী ও আসুরী বৃত্তিসমূহ রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে। গান্ধীজি বলেছেন—'যিনি মানুষের উপরে উঠিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে নির্বৈর হইয়াছেন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত।'

কিন্তু গান্ধীজির এই উক্তির সঙ্গে আমাদের ঐকামত নেই। ভারতে ক্ষত্রিয়-

ধর্মের যে আদর্শ ছিল, ভারতের রাজর্ষিগণ যে আদর্শের অনুসরণ করেছেন, সে আদর্শ হচ্ছে—লোকসংগ্রহের জন্যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্যে, ক্ষত্রিয়কে অনাসক্ত হয়ে, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, তা হলেই পাপ-পুণ্য তাকে স্পর্শ করবে না ঃ

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।। ৫।১০

আচার্য **বিনোবা ভাবে** 'গীতা-প্রবচন' গ্রন্থে আঠারোটি অধ্যায়ে গীতার মর্মবাণী উন্ঘাটন করেছেন। অত্যন্ত সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি গীতার বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করেছেন। গীতার মূল বক্তব্য সম্পর্কে তিনি গান্ধীজির অনুবর্তী; কিন্তু কোথাও কোথাও তিনি গীতা-ব্যাখ্যানে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভাষ্যকারদের মতে 'কর্ম' অর্থে শাস্ত্রবিহিত কর্ম, 'বিকর্ম' অর্থে নিষিদ্ধ কর্ম আর 'অকর্ম' অর্থে কর্মের অভাব। কিন্তু বিনোবাজীর মতে বিকর্ম বলতে বোঝায় বিশিষ্ট কর্ম, যে কর্মের সঙ্গে মনের মিলন ঘটে। আর কর্ম হচ্ছে স্বধর্মাচরণের বাহ্য, স্থূল ক্রিয়া। তিনি বলেন—কর্মে বিকর্ম জুড়ে দিলেই অকর্ম হয়, আর কর্ম যে করেছি, তা মনেই হয় না।

এ ব্যাখ্যা গীতার মূল বক্তব্যের সঙ্গে কতদূর সঙ্গত, তা অবশ্য সুধীজনের বিবেচ্য।

ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু গীতার বহু শ্লোকের ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। 'মনোবিকলনের' (psycho-analysis) আবিষ্কর্তা ফ্রয়েড বলেছেন—ইন্দ্রিয়-নিরোধ (repression) কল্যাণের পথ নয়, যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে হলে জৈব প্রবৃত্তিকে ঊর্ধ্বগামিনী করতে হবে। গিরীন্দ্রশেখর দেখিয়েছেন, গীতায়ও এ কথার সমর্থন আছে। শ্রীভগবান মানুষের প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন নি। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয়, সংযমই যে শ্রেয়ের পথ, এ কথা শ্রীভগবান সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। গীতা-ব্যাখ্যানে গিরীন্দ্রশেখর ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, গীতায় যে ত্রিবিধ আহারের কথা এবং মানুষের মনের ওপর আহারের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের (observation) অবকাশ আছে। **শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের** গীতা-ব্যাখ্যা প্রধানত পাশ্চাত্য পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁর ইংরাজী ব্যাখ্যা মূলানুগত এবং শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ। তাছাড়া **মহামতি তেলাং, মাধব শাস্ত্রী, এ্যানি বেসান্ত, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, আর. ডি. রানাডে** প্রভৃতি মনীষিগণ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।[১]

ভূতলে অতুলনীয়া, সর্বশাস্ত্রের সারভূতা এই ভগবদ্গীতা যুগ যুগ ধরে

[১] ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষীদের অনূদিত ও ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতার একটি বিস্তৃত তালিকা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে ঃ পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, বিপদে অভয়ের বাণী শুনিয়েছে, এমন কি, মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে শিক্ষা দিয়েছে। নানা বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যে গীতা সামঞ্জস্য বিধান করেছে। যাঁরা গীতার মর্মে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারায় অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন, শ্রীভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁরা দিব্যজীবন লাভ করেছেন, জীবনের প্রতি কর্মে অন্তর্যামী পুরুষের সুস্পষ্ট নির্দেশ শুনতে পেয়ে তাঁরা অনুগত শিষ্যের মতো বলেছেন—'করিষ্যে বচনং তব'।

ভগবান পার্থসারথি আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন আজকের সর্বব্যাপী বিপর্যয়, প্রমত্ততা ও স্বার্থান্ধতার দিনে তাঁর কল্যাণী বাণীর অনুসরণ করে যুগসংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। আমরা যেন ঈশ্বরজ্ঞানে সকল জীবকে আপন করে নিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ মানবসমাজের উদ্দেশ্যে সাম্য ও মৈত্রীর কল্যাণবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।। ৬।২৯

তারই অনুরূপ প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পাই ঃ

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

ভগবদ্‌গীতা ও কোরান শরীফ

আবদুল আজীজ আল্‌-আমান

ছোটবেলার একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন আমি চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ীতে মিলাদের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যায় মৌলবী সাহেব এলেন, তাঁর সঙ্গে আরো কিছু সম্মানীয় আলেম—জ্ঞানীব্যক্তি। মগরিবের নামাজের পর (সন্ধ্যায় যে নামাজ পড়া হয়) বৈঠকী আলোচনায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথা উঠল। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুরু হল—তার অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। সম্ভবতঃ সে সময় ইতিহাস বা বাংলা পাঠ্য পুস্তকে সবেমাত্র রামচন্দ্রের কথা পড়েছিলাম। তাঁর পিতৃভক্তি আমার শিশু মনের উপর গভীর দাগ কেটেছিল। আমি হঠাৎ সেই আলেম-সমাজের নিকট রামচন্দ্রের কথা পেশ করলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সমস্ত পরিবেশটা হঠাৎ যেন অত্যন্ত অপবিত্র হয়ে গেছে, তাঁরা যেন অবাঞ্ছিত ভীষণ একটা কটু কথা শুনে ফেলেছেন এবং পরিবেশটা পবিত্র করার জন্যে তাঁরা বার বার 'তওবা, তওবা—আস্তাগ্‌ফেরুল্লা' পাঠ করলেন। চার পাশে তাকিয়ে দেখলাম, অনেকগুলি রক্তচক্ষু বুঝি তখনই আমাকে ভস্ম করে ফেলার জন্য অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। আমি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম।...

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে।

আজো দেখছি সেই অসহিষ্ণু মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এখনো বহু মুসলমান গীতা-উপনিষদ পাঠকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, অনেক হিন্দু কোরান এবং হাদিস শরীফকে সযত্নে এড়িয়ে চলেন। কোন দিক দিয়েই এটা শুভ লক্ষণ নয়। এই অশ্রদ্ধা থেকেই অশান্তির উৎপত্তি, কলহের বিস্তার। ঘৃণা থেকেই অবিশ্বাসের জন্ম, অবিশ্বাস থেকেই বিদ্বেষ ও হনন-প্রবৃত্তির প্রসার। এ মনোভাবের আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফ, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভগবদ্‌গীতা। কোরান শরীফকে কন্ঠস্থ করে অনেকেই 'হাফিজ' হন, অনেক হিন্দুও সম্পূর্ণ গীততকে মুখস্থ করে রাখেন। প্রতিদিন পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যে অনেক পরহেজগার ব্যক্তি কোরান শরীফ পাঠ করেন, অনেক হিন্দুও প্রতিদিন প্রাতে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। শ্রাদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য সম্পূর্ণ গীতা পাঠ হিন্দুর নিকট করণীয় কর্ম, ঠিক একই উদ্দেশ্যে মুসলিম সম্প্রদায় 'খতম' (সম্পূর্ণ কোরান শরীফ পাঠ) করান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই দুই মহান গ্রন্থ, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত। গীতাকে অসম্মান করা একজন হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব, কোরানের অসম্মানের কথা একজন মুসলমান তো কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের ধর্মগ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন, অনেক ক্ষেত্রে অসম্মান করাকেই পুণ্য কাজ মনে করেন। এই অমার্জিত অসংস্কৃত মনোভাবের কল্পনা করতেও

আমার কষ্ট হয়। হিন্দু মনে করেন গীতা কোরান শরীফ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবার মুসলমান মনে করেন কোরান শরীফের কাছে গীতা অতি নগণ্য। অথচ মজার ব্যাপার এই, এঁরা কেউই সম্পূর্ণ গীতা ও কোরান পাঠ করেন নি। মনে রাখা দরকার, গীতা পড়লেই একজন মুসলমান হিন্দু হয়ে যান না, কোরান শরীফ পাঠ করলেও একজন হিন্দু মুসলমানে রূপান্তরিত হন না—অথচ একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা বাড়ে, জ্ঞানের আলোকে মনের অনেকখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ভগবদ্‌গীতা ও কোরান শরীফের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মিলটাও বড় কম নয়। আমার চোখে তো মিলটাই বেশী করে ধরা পড়েছে। উদ্ধৃতি সহযোগে এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি :

কর্মবাদ : গীতার একটি বড় অংশ কর্মযোগ সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে। কর্মের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল ও আকৃষ্ট করাই তার লক্ষ্য। পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটি পাঠ করুন :

> সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
> তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

'কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ মোক্ষ প্রদান করে; কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীভগবানের কাছে কর্মযোগই শ্রেয়। মানুষকে জীবন-সংগ্রামে কর্মযজ্ঞে নামতে হবে। মানুষ কর্ম করবে কিন্তু ফল-লাভের আশা করবে না। ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে। গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোকটির (২।৪৭) প্রতি লক্ষ্য করুন :

> কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

'হে অর্জুন, কর্মতেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে যেন অধিকার না হয়। ফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয়, কিন্তু তা বলে কর্ম না করার প্রবৃত্তিও যেন তোমার না জন্মে।'

কোরান শরীফের বহু জায়গায় আল্লাহ্‌ মানুষকে কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলেছেন, কর্মনিরত মানুষই শ্রেষ্ঠ। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' যেন মানুষ কখনই কামনা না করে। মানুষ সকল সময় কাজ করবে, কিন্তু ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে : 'লিল্লাজিনা আহ্‌সানো ফি হাজেহিদ্‌ দুনিয়া হাসানাতোন' (৩৯ সুরা : ১০ আয়াত) অর্থাৎ 'যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ'। অন্যত্র : 'অমাই ইয়ামাল মিসকালা যার্‌রাতিন খাই রাঁই ইয়ারা, অমাই ইয়ামাল মিসকালা যার্‌রাতিন সার্‌ রাঁই ইয়ারা' (৯৯ সুরা : ৭-৮ আয়াত) অর্থাৎ 'কেউ অণুপরিমাণ সৎকাজ করলে তা দেখবে (ভাল ফল পাবে) ও কেউ অণুপরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখবে (সাজা পাবে)।' সৎ অসৎ যে যেমন কাজ করবে আল্লাহ্‌ তাকে সেরূপ পুরস্কার বা সাজা দেবেন—অর্থাৎ ফল আল্লাহ্‌র হাতে।

অন্যত্র : 'বালা মান আসলামা অজ হাহু লিল্লাহে অহুয়া মোহ্‌ছেনুন, ফালাহু

আজ রুহুদ ইন্দা রাব্বিহি অলা খাওফোন আলায় হেম অলাহুম ইহ্‌জানুন' (২ সূরা ঃ ১১২ আয়াত) অর্থাৎ 'হাঁ, যে সৎকাজ করে আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।' কোরান শরীফ কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করে, কিন্তু অকল্যাণকর কাজ থেকে মানুষকে বিরত হতে নির্দেশ দেয় ঃ

'তা মারুনা বেল মারুফ, ও তান হাওনা আনেল মুনকার' অর্থাৎ 'তোমরা কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গীতা এবং কোরান উভয় গ্রন্থই মানবসমাজকে কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সেই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছে ফললাভের আশায় যেন মানুষ কর্ম না করে—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতেই রয়েছে ফলাফলের ভাণ্ডার।

আত্মা ঃ গীতায় (২।১৭ শ্লোকে) বলা হয়েছে আত্মার মৃত্যু নেই ঃ

অবিনাশি ত তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥

'যে সৎস্বরূপ আত্মা এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে সে আত্মাকে বিনাশহীন বলে জেন। যা অব্যয়স্বরূপ অর্থাৎ যার স্বরূপের বিকার বা বিচ্যুতি হয় না তাকে কেউ বিনাশ করতে পারে না।' 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ'। অর্থাৎ 'এ আত্মা কখনও নতুন উৎপন্ন হয় না, কখনও বিনষ্ট হয় না।'

কোরান শরীফেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে—মানুষের মৃত্যু হয়, তার দেহের অবলুপ্তি ঘটে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। শেষ বিচারের দিন মানুষকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে ঃ আলা ইজুন্নু উলাএকা আন্নাহুম মাবওছুন লেইয়াওমিন আজিম। ইয়াওমা ইকুমুন্নাছো লেরাব্বিল আলামীন' (৮৩ সূরা ঃ ৪-৫-৬ আয়াত) অর্থাৎ 'ওরা কি চিন্তা করে না যে ওরা পুনরুত্থিত হবে মহাদিনে, যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।' মৃত্যুর পর সৎ-আত্মা 'ইল্লীন' নামক স্থানে থাকে এবং অসৎ-আত্মা 'সিজ্জিন' নামক স্থানে অবস্থান করে। মহাবিচারের দিন (At the Day of the Judgement) তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। সুতরাং মানুষের দৈহিক মৃত্যুর পরও আত্মা জীবিত থাকে—আত্মা অবিনশ্বর।

পরমাত্মা ঃ বিশ্বনিখিলে ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। কেবল বাহ্য প্রকৃতিতেই নয়, মানুষের হৃদয়েও এই পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত ঃ সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। (১৫।১৫) অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামিরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি।' কোরান শরীফেও আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ 'নাহানু আকরাবো মিন হাবলিল ওয়ারিদ' (৫০ সূরা ঃ ১৬ আয়াত) অর্থাৎ 'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।'

সুতরাং সর্বজীবে, বিশ্বচরাচরের সর্বত্র এই পরমাত্মা বিরাজমান। এই পরমাত্মাই নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে সমগ্র জগৎকে ধারণ, পালন ও রক্ষা করছেন।

পরমাত্মার স্বরূপ ঃ আপনার স্বরূপ সম্পর্কে গীতার নবম অধ্যায়ে আঠারো শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন ঃ

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥

অর্থাৎ 'আমি জগতের গম্যস্থান, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠান। আমিই জীবগণের আশ্রয় এবং সর্বজীবের সুহৃৎ। আমিই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের আধার এবং আমিই জগতের অবিনাশী বীজস্বরূপ।' ঠিকই একই কথার প্রতিধ্বনি পাই কোরান শরীফে। নিজের স্বরূপ সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ কোরান শরীফে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ 'সাব্বাহা লিল্লাহে মা ফিস্‌ সামাওতাতে অল আরদে অহুয়াল আজীজুল হাকিম। লাহু মুলকুস্‌ সামাওঅতে অল আরদে ইহ্‌য়ি অ ইয়ামিতো অহুয়া আলা কুল্লে সাঁইয়েন কাদির। হুয়াল আউয়ালো অল আখেরো অজ্‌জাহেরো অল বাতেনো অহুয়া বে কুল্লে সাইয়েন আলীম।' (৫৭ সূরা ঃ ১-২-৩ আয়াত) অর্থাৎ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আদি, তিনি অন্ত—তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

আমরা গোঁড়ামি, অজ্ঞানতা ও বিদ্বেষবশতঃ পরস্পরের ধর্মগ্রন্থ ছুঁই না, পড়ি না। পড়লে অনেক কলহ ও অশান্তি হতে দূরে থাকতে পারতাম। নিম্নোদ্ধৃত ভগবদ্‌গীতার শ্লোক (৯।১৯) ও কোরান শরীফের আয়াতগুলি লক্ষ্য করুন—কি অপূর্বভাবে একই কথা উভয় গ্রন্থে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ঃ

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥

অর্থাৎ 'আমি আদিত্যরূপে উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি হতে জল আকর্ষণ করি এবং পুনর্বার পৃথিবীতে জল বর্ষণ করি। আমিই মৃত্যু, আবার আমিই অমরত্বপ্রদ অমৃত। আমিই নিত্য সৎ পদার্থ, আবার আমিই অনিত্য পরিবর্তনশীল ব্যক্ত জগৎ।'

কোরান শরীফ থেকে পড়ুন ঃ 'ইয়া আলামো মা ইয়ালেজো ফিল আরদে অমা ইয়াখরোজো মিনহা অমা ইয়ানজেলো মিনাস্‌ সামায়ে অমা ইয়া আরজো ফিহা অহুয়া মায়াকুম আয়না মা কুনতুম অল্লাহো বিমা তায়ামালুনা বাসির। লাহু মুলকুস্‌ সামাওঅতে অল্‌ আরদে অ এলাল্‌ লাহে তোরযাউল উমুর। ইউলে জুল লায়লা ফিনা নাহারে অইউলে জুন্‌ নাহারা ফিল্‌ লায়লে অহুয়া আলিমুম বেজাতিস্‌ সুদুর।' (৫৭ সূরা …৪,৫,৬ আয়াত) অর্থাৎ 'তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে নির্গত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্‌ তা দেখেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব

তাঁরই, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তাঁরই নিকট। তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে, তিনি অন্তর্যামী।'

গীতার দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে 'দেবতা এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তির বিষয় জানেন না ; কেননা আমিই সর্বপ্রকার দেবতা ও মহর্ষিদিগের আদি কারণ অর্থাৎ আমিই তাঁদের সৃষ্টি করেছি।' কোরান শরীফের বহুস্থানে আল্লাহ্‌ বলেছেন যে তিনি জিন (অগ্নি দিয়ে তৈরি), মানুষ, ফেরেস্তা (দেবদূত) এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। গীতায় অন্যত্র (১০।৩ শ্লোকে) বলা হয়েছে :

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্তেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ 'যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত (ভগবান কারো দ্বারা জাত নন ; কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি) এবং মহেশ্বর্য-সম্পন্ন সর্বলোক-প্রভু বলে জানেন মানুষদের মধ্যে সেই মোহশূন্য ব্যক্তিই সকল পাপ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।' কোরান শরীফের এই আয়াত চারটি লক্ষ্য করুন : 'কুল হো আল্লাহো আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ। অলাম ইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ। অর্থাৎ 'বল (হে মোহাম্মদ), তিনি আল্লাহ্‌ অদ্বৈত আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ের নির্ভর, তিনি জনক নন এবং জাতকও নন (কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি) এবং তাঁর সমতুল কেউই নেই।'

এভাবে ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে গীতায় যা বলা হয়েছে এবং কোরান শরীফে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে কতখানি পার্থক্য আছে তা বিজ্ঞ পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করবেন।

অবতার ও পয়গম্বর : গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি এই :

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ 'সৎপথাবলম্বী সাধুদিগের রক্ষা, পাপাচারদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপন— এ সকল কাজের জন্য আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকি।' পৃথিবীতে অরাজকতা উপস্থিত হলে, দুষ্টের প্রাদুর্ভাব ঘটলে, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি প্রবল হলে ভগবান আবির্ভূত হয়ে পুনরায় শান্তি স্থাপন করেন। লক্ষ্য করার বিষয় ভগবান নিজেই অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, একথা গীতায় বলা হয়েছে। কিন্তু কোরান শরীফে বলা হয়েছে, কোন অবস্থাতেই অবতাররূপে আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ হন না—তিনি যুগে যুগে পয়গম্বরদের (প্রেরিত পুরুষ) তাঁর বাণী ও নির্দেশসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় সূরার দুশো তের সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে : 'মানুষ (আদিতে) ছিল এক জাতি (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল), অতঃপর আল্লাহ্‌ নবীগণকে (প্রেরিত পুরুষদের) সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন, এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য সত্যসহ কিতাব (ঐশ্বরিক গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেন…। চতুর্থ সূরার একশো পঁয়ষট্টি সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে : 'সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসূল (প্রেরিত পুরুষ)

প্রেরণ করেছি যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।'…

বিশ্বরূপ দর্শন : একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে অর্জুন ভগবানের স্বরূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন : 'হে পরমেশ্বর, তুমি আপনাকে যেরূপ অনন্ত বিভূতি-সম্পন্ন বলে বর্ণনা করলে তা ঐরূপই বটে। হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।' কোরান শরীফের সপ্তম সূরার একশো তেতাল্লিশ সংখ্যক আয়াতে হজরত মুসাও আল্লাহ্‌র কাছে অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন :…'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব।'

গীতার একাদশ অধ্যায়ের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন 'অত্যন্ত বিস্ময়াম্বিত হলেন' এবং তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল। আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ময় প্রকাশ লক্ষ্য করে হজরত মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। গীতার (১১।১৪) শ্লোক এই :

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥

কোরান শরীফের আয়াত এই : …'ফালাম্মা তাজাল্লা রাব্বোহু লিল্‌ জাবালে জয়ালাহু দাক্‌ কাঁও অ খারুরা মুসা সায়েকা'…(৭ সূরা : ১৪৩ আয়াত) অর্থাৎ… 'যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল'…। কেবল হজরত মুসার ব্যাপারে নয়, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তিপ্পান্ন সংখ্যক সূরার এক হতে অষ্টাদশ আয়াতের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমি মূলের উদ্ধৃতি না দিয়ে প্রয়োজনীয় অনুবাদটুকু নিম্নে দিলাম : …'এবং তিনি (মোহাম্মদ) আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হলেন এবং তারপর (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলেন এবং (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) নত হলেন। দুটি ধনুকের জ্যার মধ্যে যতখানি ব্যবধান তিনি ততটুকু অথবা তার চেয়েও কম দূরবর্তী ছিলেন। এবং তিনি (আল্লাহ্‌) তাঁর ভৃত্যের (মোহাম্মদের) নিকট যা প্রকাশ করার ছিল প্রকাশ করলেন।'…কোরান শরীফে বর্ণিত এই ঘটনাকে মেরাজ বলা হয়।

গীতা এবং কোরান উভয় ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এই মহাদর্শন প্রায় একই রূপে সংঘটিত হয়েছে।

কাব্য : কোরান শরীফ একটি উচ্চাঙ্গের গদ্য কবিতার গ্রন্থ। শব্দবিন্যাসের ঔচিত্যবোধে, ভাবপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা, ছন্দের মাধুর্যময় ঝংকারে কোরান শরীফ সমগ্র আরবী সাহিত্যে অদ্বিতীয়। কেবলমাত্র কাব্য হিসেবে কোরান শরীফ পাঠ করে আত্মা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। উদ্ধৃতি দিতে গেলে সমগ্র কোরান শরীফকেই উপস্থিত করতে হয়। আমার মতে গীতাও একটি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ, এখানেও শব্দ-বিন্যাস, ছন্দ-ঝংকার, উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত। এ প্রসঙ্গে আমি মাত্র দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটান্ন শ্লোকটি দেখুন :

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অর্থাৎ 'কচ্ছপ যেমন হস্তপদাদি অঙ্গসকল নিজের মধ্যে টেনে নেয়, সেরূপ সাধক যখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তার ভোগ্য বিষয় হতে প্রত্যাহার করে আত্মস্থ রাখেন, তখন তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।' পরের অধ্যায়ের আর একটি (৩।৩৮) শ্লোক এই ঃ

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌॥

অর্থাৎ 'ধূম দ্বারা যেরূপ অগ্নি আচ্ছাদিত হয়, মলদ্বারা যেরূপ দর্পণ আচ্ছাদিত হয় এবং জরায়ুদ্বারা যেরূপ গর্ভস্থ সন্তান আবৃত থাকে, তদ্রূপ কাম এবং তৎপরিণাম ক্রোধদ্বারা পুরুষের বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়।' আমরা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ, যাঁরা গীতার নাম শুনে নাসিকা কুঞ্চন করি, কেবলমাত্র কাব্য হিসেবেই গ্রন্থটিকে একবার পাঠ করে দেখি না কেন!

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও কোরান শরীফ এই দুই মহান গ্রন্থের মধ্যে যে মিলগুলি আমার চোখে পড়েছে, বর্তমান ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে তার সামান্য অংশই আলোচিত হল। এ সম্পর্কে গবেষণামূলক বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনারও অবকাশ আছে।

কোন ধর্মকে ছোট করা বা কোন ধর্মকে বড় করা আমার উদ্দেশ্য নয়—উভয় ধর্মগ্রন্থের অন্তরালে যে অপূর্ব মিল আছে আমি কেবল সেটুকু দেখাতে চেষ্টা করেছি। এ আলোচনায় যদি কেউ মনে কোন আঘাত পান, তাঁর কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আসুন, আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আরো একটু শ্রদ্ধাশীল হই, একে অপরকে জানার চেষ্টা করি, জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার কেটে যাক, আমাদের সমবেত প্রার্থনা হোক ঃ

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাদের অসৎ হতে সতে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।

বাংলার বিপ্লববাদ ও গীতা

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতীয় বৈপ্লবিক-যুগ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ব্যাপ্ত ছিল। তার কাল ১৮৯৭ সাল থেকে১৯৪৭ সাল। এই দীর্ঘদিন ব্যাপী বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব ছিল অনন্য। বর্ণমালা না পড়ে যেমন ভাষার মন্দিরে ঢোকা যায় না—গীতা না পড়েও তেমনি বিপ্লবীর রাজ্যে সে যুগে প্রবেশ করা যেত না। বিপ্লব-দলে তখন বালক-বয়সে বা প্রথম-কৈশোরেই বিপ্লবীর প্রথম প্রবেশ ঘটত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের অজ্ঞাতে সেই বালক কোন প্রিয় সঙ্গীর টানে ধীরে ধীরে এসব দলে ঢুকে যেত। সেখানে শুনত সে নানা আলোচনা। সে সব থাকত সাধারণত ব্রহ্মচর্যপালন, দৈহিক শক্তিসঞ্চয়, দেশ ও জাতিকে ভালবাসা এবং মহৎ আদর্শের প্রতীক মহান ব্যক্তিদের জীবনী ইত্যাদি পাঠ সম্পর্কে। অন্তত চার-পাঁচ বৎসর জুড়ে থাকত এই শিক্ষার কাল। তৎপর শুরু হত সরাসরিভাবে বৈপ্লবিক শিক্ষার অনুশীলন। রাজনীতি-চর্চায় এবং দেশকে ব্রিটিশ-শাসন-মুক্ত করার চেষ্টায় কৃতিত্ব দেখাবার সময় তার এখান থেকেই শুরু। কিন্তু ঐ যে প্রথম দিন হতে যে-বালক গীতাপাঠ শুরু করেছে, তাকেই প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের শিক্ষালাভের পর বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতিতে ঢুকতে হত গীতা স্পর্শ করে শপথ নিয়ে। দেশের প্রতি এবং দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ বিপ্লবীকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাখতে হত। 'গীতা' ছিল তাঁর জীবনের অন্তিম কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

বালক-বিপ্লবীর কাছে যে-গীতা ছিল একটি অবশ্য পঠনীয় পুস্তক মাত্র, সে-গীতাই তরুণ-বিপ্লবীর হাতে হয়ে উঠত একটি জ্বলন্ত তরবারি। অর্জুনের 'গাণ্ডীব' হয়ে গীতা বিপ্লবীর কাছে আসত। দুর্গম পথের যাত্রায় তাঁকে শক্তি দিত গীতার বাণী—বিশেষ করে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রত্যেকটি সূত্র, প্রত্যেকটি অক্ষর।

১৮৯৮ সাল। বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হল। দামোদর চাপেকারের বিচার। দামোদরের বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের চার্জ। র‍্যাণ্ডসাহেব পুণার প্লেগ-অফিসার। তাঁকে হত্যা করেছেন এই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী।

বিদ্রোহী দামোদর চাপেকারের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হল কোর্টে। সহাস্যে দামোদর বললেন ঃ 'এই মাত্র! আর কিছু নয়?'...

যথানির্দিষ্ট দিনে পুণা শহরে যারবেদা-জেলের ফাঁসির মঞ্চে দামোদর চাপেকার আরোহণ করলেন। হাতে তাঁর ভগবদ্‌গীতা। এই গীতাখানা বন্দীকে পাঠিয়েছিলেন লোকমান্য তিলক তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ ভরে দিয়ে। জেলখানায় দামোদরের নিত্য সঙ্গী ছিল এ বইখানা।

ফাঁসিমঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর প্রশান্ত নয়নে। মৃত্যু আসছে তাঁর দিকে বন্ধুর বেশে, সহচরের আনুগত্যে।

কন্ঠ রোধ করল ফাঁসির নির্মম রজ্জু। ঝুলে পড়ল মৃত্যুহীনের দেহ। কিন্তু হাত থেকে তখনো গীতাখানি খসে পড়ে নি।

এই ভাবে একটি নয়—একই মার বুক থেকে পর পর তিনটি ভাই ঝরে গেলেন। দামোদর, বালকৃষ্ণ, বাসুদেব—এই তিনটি ভাই। তাঁরা চাপেকার-পরিবারের তিনটি সন্তান। বিপ্লবের দলগত সম্পর্কে তাঁরা তিনটি ভাই এবং সতীর্থ। তবে এ ক্ষেত্রে রক্ত থেকেও আদর্শের টান অধিক। সেই আদর্শ হল দেশজননীর মুক্তিকল্পে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান। সেই আদর্শ অব্যাহত রাখার শক্তিমূল ঐ গীতার অক্ষরগুলোর মধ্যে।

একই গৃহ থেকে মাত্র তেরটি মাসের ব্যবধানে পর পর তিনটি ভাই আত্মনিবেদন করে গেলেন ইংরেজের যূপকাষ্ঠে! তাঁদের জ্যোতির্ময় রূপ দেশের মানুষকে বিস্মিত করল। কিন্তু শুধু বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে থাকার ব্যক্তি যাঁরা নন, তাঁরা চাইলেন আবিষ্কার করতে—চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দের শক্তি-উৎস কোথায়?

এই জিজ্ঞাসুদের অন্যতমা ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। মহান যোগী, মহান বিপ্লবী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা—রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা'—ছুটে গেলেন শহর পুণায় শহিদত্রয়ের শক্তি-উৎস সন্ধানে। তাঁকে যে দেখতেই হবে শৌর্যবানদের গর্ভধারিণীর রূপ!...

চাপেকার গৃহে লোকমাতা প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিয়সী নারী পূজার আসনে উপবিষ্টা। গৃহদেবতার আরাধনায় সকল সত্তা তাঁর নিমগ্ন। পূজা-অন্তে আলাপ হল দু'জনার। অনুভব করলেন নিবেদিতা যে, এই মহিলা বিরাজ করছেন এক অখন্ড শান্তির রাজ্যে, আপন শক্তিতে। তাঁর সর্ব শোক-তাপ, দুঃখ-বেদনা 'নারায়ণে'র পায়ে নিবেদিত। তাঁর ভাল-মন্দ, ইহকাল-পরকাল বিশ্বনিয়ন্তার ধ্যানে সমর্পিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস এই মহিয়সী নারীর মধ্যে। ('ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব', পৃঃ ২৮)

যে সত্য নিবেদিতা সেদিন আবিষ্কার করেছিলেন চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস সম্পর্কে, সে-সত্য মোটামুটি স্থির হয়ে আছে প্রত্যেকটি শহিদ-জীবনেরই শক্তি-উৎস রূপে। মাতৃভক্তি সে-যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে নির্ভেজাল ছিল বলেই দেশকে তাঁরা জননীরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সেই দেশজননীর অপমান অসহ্য হয়েছিল বলেই তাঁর দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টায় তাঁরা প্রাণ দিতেন।

এই প্রাণদানের শিক্ষা বড় সামান্য ছিল না। সেই শিক্ষালাভ বিপ্লবীর শুরু হয়েছিল প্রথম দিন থেকে। মন্ত্রের মত অনুপ্রাণিত করত তাঁকে ঃ

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২।৩

হাজার বছরের অন্ধকার জাতির জীবনে ক্লীবত্ব এনেছে। এই ক্লীবত্বকে দূর করতে হবে। হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের দৌর্বল্য পরিহার করে জাতির প্রতিটি অংশকে জাগ্রত হতে হবে, কর্মোদ্যোগী হতে হবে। গীতার এই বাণী প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছেই

বরণীয় ছিল। রক্তের অক্ষরে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ছিল তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁদের কামনা ছিল ঃ

> আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
> পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।...

বিপ্লবের কর্মীকে এক একটি 'অর্জুন' হতে হবে—কুরুক্ষেত্রের অর্জুন। গীতার বাণী মর্ম দিয়ে উপলব্ধি না করতে পারলে সেই অর্জুন বা 'সব্যসাচী' হওয়া যায় না।

বিপ্লবের কর্মী শুনলেন ঃ

> নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
> উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২।১৬

অর্থাৎ শুনলেন তিনি পার্থসারথির কণ্ঠে—"প্রিয়বস্তুর 'প্রাপ্তিতে' হর্ষ অথবা 'অভাবে' বিষাদ, এই দু'টি বস্তুই ত্যাগ করতে হবে। অসৎ বস্তুর স্থায়িত্ব নেই। সৎ বস্তুর বিনাশ নেই। যাঁরা তত্ত্বদর্শী, তারা সদসৎ উভয় বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধি করেন।" সুতরাং বিপ্লবী বুঝলেন যে, তাঁকে তত্ত্বদর্শী হতে হবে। বিপ্লব-পথের পথিক শুনলেন ঃ

> অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
> অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ২।১৮

পার্থকে বলছেন পার্থসারথি—'আত্মা যে-দেহে বাস করেন সেই দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও নিত্য এবং স্বপ্রকাশিত। অতএব হে অর্জুন, যুদ্ধ কর।' সুতরাং বিপ্লবীকেও আত্মার অবিনাশিতা ও দেহের নশ্বরত্ব স্মরণ রেখে বীরের মত স্বধর্ম অর্থাৎ 'বিপ্লবীর ধর্ম' পালন করতে হবে।

বলছেন গীতার ভগবান ঃ

> য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
> উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২।১৯

অথবা

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০

অন্তরের নিভৃতে এই বাণীকে স্পর্শ করতে চাইলেন বিপ্লবী। তিনি বুঝলেন—'আত্মা কাউকে হত্যা করেন না, তাঁকে কেউ নিধন করতেও পারে না। কারণ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মা সৎরূপে নিত্য বিদ্যমান। ইনি শাশ্বত।'

বিপ্লবী তাই মৃত্যুর ভয় করবেন কেন ? তাঁর আত্মা তো মৃত্যুহীন। বিপ্লবী বিশ্বাস করলেন গীতার বাণী ঃ

> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২।২২

মহারাষ্ট্র পেরিয়ে বিপ্লব-বহ্নি এসে অভ্রংলিহ শিখায় জ্বলে উঠল বাঙলা দেশে। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চলল প্রস্তুতিপর্ব। অরবিন্দ বিপ্লবের ঋষি, নিবেদিতা তাঁর সহায়দাত্রী। পি. মিত্র, সরলা দেবী, সতীশ বসু প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বাঙলার তরুণদের মধ্যে শরীরচর্চা ও দুঃসাহসিকতার শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন। অরবিন্দ বিপ্লবী-দল সংগঠনে তৎপর। তাঁর অনুগামী হলেন বারীন ঘোষ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেম কাননগো, যতীন মুখার্জি এবং আরও কত তরুণবীর।

এই তরুণদলের সম্মুখে 'আনন্দমঠে'র সাংগঠনিক আদর্শ, কন্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। 'সন্তান' দলের ত্যাগনিষ্ঠ কর্মযাত্রা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে। আনন্দমঠের ঋষিপ্রবর্তিত আদর্শে দেশকে 'বিশ্বজননী'র ক্রোড়ে অবস্থিতা ভারতমাতার ধ্যানে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। সেই ভারতমাতা হলেন তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সামগ্রিক রূপ—তার মধ্যে রয়েছেন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-জৈন-শিখ-পার্সী সকলে ; তার মধ্যে রয়েছেন ধনী-দরিদ্র, মজদুর-কিষাণ, ছোট-বড় প্রত্যেকটি নর-নারী। এহেন যে ভারতবর্ষ—তার শৃঙ্খলমুক্তি জীবনের একমাত্র পণ। এই পণ সার্থক করবেন তাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ভক্তির অর্ঘ্যে। এক একটি বিপ্লবীকে তাই অর্জন করতে হবে সেই শক্তি, যা দুঃখসুখকে সমজ্ঞানে গ্রহণ করে নিঃশেষে আত্মদান করতে তাঁকে সাহায্য করবে। এই তপস্যাপালনে সর্বোত্তম সহায়ক বন্ধুরূপে বিপ্লবী-কর্মীরা গ্রহণ করলেন গীতার বাণী। বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা সত্যি অবিনাশী আত্মার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, যাঁরা যথার্থই নিত্যানিত্য বিবেচক হতে পেরেছিলেন—তাঁরাই ফাঁসি গেছেন অথবা নিঃশেষে আত্মত্যাগ করেছেন অবিমিশ্র আনন্দে। তাঁরা বুঝেছিলেন—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করার মতই সবার আত্মা জীর্ণ দেহ পরিহার করে নূতন দেহ পরিগ্রহণ করেন। কাজেই সে-সব বিপ্লবী ছিলেন বিগতভয়, অবিচল।

বিপ্লবীরা প্রত্যহ গীতাপাঠ করতেন, অন্তত বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে। গীতা ছিল তৎকালে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান অস্ত্র। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অনন্য—তাঁরা সত্যি সর্বসত্তা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ঃ

> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২।২৩
>
> অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
> নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
> অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২।২৪

তাঁরা জেনেছিলেন—'আত্মার অবয়ব নেই। সুতরাং অস্ত্র তাঁকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি তাঁকে দহন করতে পারে না, জল তাঁকে ভেজাতে পারে না, বায়ু

তাঁকে শুকাতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য।'

এই সত্যকে নিত্য গীতাপাঠে শুধু নয়, নিত্যকার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরা আত্মস্থ করেছিলেন বলেই সম্মুখ-যুদ্ধে বাঙলার প্রথম শহিদ প্রফুল্ল চাকি ১৯০৮ সালের মে মাসে শত্রুর জীবন নিতে যেমন শক্তিবিধৃত হয়ে উঠেছিলেন, নিজের জীবন দিতেও তেমনি ভয়মুক্তের বিভা বিকিরিত করতে পেরেছিলেন। আবার ঐ বছরই, ১১ই আগস্টের এক প্রভাতে, মজঃফরপুর জেলের ফাঁসিমঞ্চে জীবন দিলেন প্রফুল্ল চাকির সতীর্থ ক্ষুদিরাম বসু প্রশমিত চিত্তে, অপার সৌন্দর্যে। শহিদ-তীর্থে ক্ষুদিরামের এই অভিযাত্রা সন্দর্শনেই সেই কালে 'দি এম্পারার' নামক কাগজে প্রকাশিত হল ঃ 'Khudriam Bose was executed this morning ;...it is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling.' এই অপরূপ রূপটি কল্পনা করেই এক অখ্যাত কবি বহুখ্যাত এবং সর্বকন্ঠ-ঝংকৃত সেই গানখানি রচনা করেছিলেন ঃ

> একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।...
> হাসি হাসি পরব ফাঁসি,
> দেখবে জগৎবাসী...

গীতায় 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' বাক্যটি বিপ্লবীর একটি প্রতিজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা যায় বিপ্লবীদের শাসনদণ্ড অচল থাকল না ১৯০৮ সালেও। মোকামা-ঘাটে পুলিশ সাব্-ইন্সপেকটর নন্দলাল ব্যানার্জির অতিরিক্ত উৎসাহে প্রফুল্ল চাকি পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হয়ে নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেটেই আত্মদান করলেন। বিপ্লবীরা, দুষ্কর্ম যে করল তাকে ন্যায্য শাস্তি দেবেনই ! প্রফুল্ল চাকির আত্ম-বিলয়নের পর মাস ছয় কেটে যেতেই ঢাকার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি 'মুক্তি সংঘে'র (পরবর্তীকালের 'বি-ভি') কর্মনেতা শ্রীশচন্দ্র পালের হাতে প্রাণ দিতে হল নন্দ-লালকে কলকাতার সার্পেনটাইন লেনে, ৯ই নভেম্বরের (১৯০৮) এক সন্ধ্যায়। কেউ খুঁজে পেল না শ্রীশচন্দ্রকে। কেউ জানল না যে তাঁর সাথী ছিলেন অপর একটি তরুণ, 'আত্মোন্নতি সমিতি'র রণেন গাঙ্গুলি।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন কানাই দত্ত, সত্যেন বসু, চারু বসু ও বীরেন দত্তগুপ্ত। তাঁরা প্রত্যেকে মৃত্যু জয় করেন বিপ্লবীদলে কার্যভার পাবার মুহূর্তেই। তাঁদের প্রত্যেকের রক্ষাকবচ ছিল ঐ গীতার অক্ষয় বাণী। ঐ বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের বিপ্লবগুরু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে। এ সেই অরবিন্দ—যাঁর 'বাসুদেব দর্শন' লাভ হয়েছিল ইংরেজের কারাগারে, আলিপুর-বোমা-ষড়যন্ত্র-মামলার কালে।

স্থিতধী কানাইলাল দত্ত। তাঁর মধ্যে দেখা গেল বিস্ময়কর, প্রচণ্ড এক আত্ম-সমাহিত শক্তি। তাঁর ফাঁসির দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের কথা উঠলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'There shall be no appeal.'...আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই উক্তি শুনে বলেছিলেন ঃ "কানাই শিখিয়ে গেল হে !...'Shall' আর 'Will'-এর ব্যবহার করতে আর কেউ ভুল করবে না।" ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃঃ ৩২৯)

আরো একটি ঘটনা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসেবে ব্রাহ্মধর্মী সত্যেন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জেলের কণ্ডেমড-সেলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তাঁকে শেষ আশীর্বাদ করবেন। সাক্ষাৎকার অন্তে জেলের বাইরে চলে এলে শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কানাইকেও তিনি আশীর্বাদ করে এলেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।'

('বিঃ জীঃ স্মৃঃ', পৃঃ ৩২৯)

সত্যেন বসু। জয় করেছেন তিনি ভয়কে। তিনিও কানাই দত্তের মত গীতার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন: 'বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি'। অর্থাৎ—এই অব্যয়স্বরূপের বিনাশ কেহই করতে পারে না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার পূর্ব মুহূর্তে সত্যেনকে সেল্ থেকে নিয়ে এসেছিলেন যে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট, তাঁর উক্তি: "When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said, 'be ready', he answered, 'Well, I am quite ready', and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully." ('শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', পৃঃ ৭৪৮)। তাঁর সম্পর্কেই শ্বেত পুলিশ-সুপার বলেছিলেন জেল-গেটে অপেক্ষমান বিপ্লবীদেরই জনৈক বন্ধু ব্যক্তিকে: 'You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely.' এ সব ঘটনার সময়কাল ১৯০৮ সাল।

এল ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। আলিপুরের সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসকে মৃত্যুদণ্ড দান করলেন চারু বসু। চারু বসু কি বলেছিলেন? দায়রা জজের কোর্টে বলছেন বন্দী কিশোর: No sessions trial, but hang me to-morrow. It was all pre-ordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged. I killed him as he was an enemy of the country.

('Roll of Honour,' p. 206)

১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী। হাইকোর্টের সিঁড়িতে পুলিশের কর্তা সামসুল আলম নিহত হলেন বীরেন দত্তগুপ্তের গুলিতে। এই এ্যাকশানের পাঁচ দিন পর (২৯শে জানুয়ারি) 'কর্মযোগিন্' কাগজে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: 'Boldest of the many bold acts of violence. They (the revolutionaries) prefer public places and crowded buildings—Nasik-London-Calcutta.—Goswami in jail—These are remarkable features.'

('শ্রীঃ অঃ বাঃ স্বঃ যুঃ', পৃঃ ৮১৬)

দুঃসাহসের এই বাণী কোথায় পেয়েছিলেন অরবিন্দ? কোথায় পেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী-অনুগামীর দল এবং সর্বভারতের সকল বিপ্লবী? মৃত্যুহীন সত্তায়, কর্মফলের মোহ হতে মুক্ত থেকে, কর্তব্যপালনে আত্মনিবেদনের যে নিষ্ঠা—তার উৎস তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন কোথায়? অরবিন্দ থেকে সেই যুগের প্রত্যেকটি

বিপ্লবীই এর উত্তরে 'গীতা'র নামোচ্চারণ করবেন। গীতার শ্লোকগুলো বিপ্লবীদের ছিল মর্মবাণী, রক্তের সম্পদ।

১৯০৮ সাল থেকে পর পর নাসিকের প্রেক্ষাগৃহে জ্যাক্সন-হত্যা, লণ্ডনের সভাকক্ষে কার্জন উইলি নিধন, কলকাতার জেলের অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের কার্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—'These are remarkable features'; আর এসব কর্মীর সম্পর্কেই গীতার উক্তি—'বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।' বিপ্লবীদের কাছে তাই গীতা ধর্মগ্রন্থ ছিল না—ছিল মর্মগ্রন্থ, ছিল প্রতিদিবসের মননশীলতায় প্রাপ্ত অমূল্য আভরণ। রণসাজে সজ্জিত হবার বিশিষ্ট আভরণ।

এ-ও একটি জানা কথা যে, নিজে পড়বার সময় না করতে পারলে বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ অপরের কণ্ঠে গীতাপাঠ শুনতেন। তাই আমরা দেখি—তাঁর মাউজার-পিস্তল বাজাতে পেরেছিল 'পাঞ্চজন্যে'র রণ-ধ্বনি। ১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধ তাঁর কাছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে এসেছিল। তাঁরা পাঁচটি বীর তাই লড়তে পেরেছিলেন রাইফেলধারী দুর্ধর্ষ ইংরেজের সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে। মৃত্যুকে বরণ করতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। কারণ তাঁরা জানতেন: 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'। তাঁরা জানতেন:

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ২।৩২

অর্থাৎ, এ-যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ের জনাই এমন যুদ্ধলাভ সম্ভব। বিপ্লবীর বিশ্বাস, এমন প্রবুদ্ধ-ক্ষাত্রশক্তির উদ্দেশ্যেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন:

আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার,
'মুখ তোলো,
আবরণ খোলো,—
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক্ লিখে লিখে।'

গীতার প্রভাবে প্রবুদ্ধ অপর একটি বিপ্লবী-নায়কের কথা মনে পড়ে। দীর্ঘ তিরিশটি বছর সেই ব্যক্তি জেলে জেলে সকল দুঃখ ও গ্লানি, জেলকোডের সবগুলো সাজা ভোগ করেছিলেন প্রশান্তচিত্তে—মধুর হাসি হেসে। দেশ স্বাধীন হবার পরও সেই ব্যক্তির বেশ কিছুকাল কেটেছে পাকিস্তানের কারাকক্ষে। অশীতি বৎসর পেরিয়ে রোগজীর্ণ দেহে এইতো সেদিন এলেন তিনি ভারতখণ্ডে। মৃত্যু হল কর্মরত অবস্থায়ই তাঁর, রাজধানী দিল্লী শহরে সতীর্থদের স্নেহাশ্রয়ে। এই ব্যক্তির বিপ্লবী-নাম 'মহারাজ'। পোষাকী-নাম ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। অদ্ভুত এক কর্মযোগী।

কর্মযোগের মাধ্যমেই ঘটল তাঁর কর্মনিবৃত্তি। লাভ করলেন তিনি নির্বাণ। ১৯৭০ সালের ৯ই আগস্ট সহস্র সহস্র মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই নির্বাণ-প্রাপ্ত বিপ্লবী-নায়কের শবযাত্রা দিল্লীর পথে।

এই যে মহারাজ—তাঁর জীবনের সর্বোত্তম অবলম্বন ছিল 'গীতা'। গীতা ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। তিনি গীতাভাষ্য রচনায় নিযুক্ত থাকতেন সেই আনন্দে, যে-আনন্দে মানুষ গুনগুনিয়ে গান গায়। তিনি লিখছেন : '১৯২৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৩০ সালে পুনরায় ধৃত হইয়া আমি গীতার বাকি অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই। ছাপাইবার টাকা আমার ছিল না।'[১] ('জেলে ত্রিশ বৎসর', পৃঃ ১৩২)।

বিপ্লবী যুদ্ধ করেছেন—আঘাত হেনেছেন, আঘাত খেয়েছেন। ফাঁসীর মঞ্চে বা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে বহু বিপ্লবী 'শহিদ' হয়েছেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে দেখি নূতন এক পটভূমির বুকে নূতন এক দৃশ্য। এমন দৃশ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে কেউ দেখে নি।...

বাঙলার বিপ্লবী-তরুণ যতীন দাস। পাঞ্জাবের জেলে আমৃত্যু অনশনের প্রতিজ্ঞায় তিনি অচঞ্চল। সারা ভারতবর্ষ শঙ্কায় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আদর্শনিমগ্ন তাপসের দিকে। এ-প্রসঙ্গে 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে পাই : 'ভারতের টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনি জেল-বন্দীদের প্রতি 'মানুষের ব্যবহার' দাবি করে তেষট্টি দিন নিরম্বু উপবাস করেন লাহোর সেনট্রাল জেলে। এই অনশনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দেহত্যাগের তারিখ ১৩ই সেপ্টেম্বর। এ-মৃত্যু তো সাধারণ 'অনাহারে মৃত্যু' নয়। এ-যে চিরঞ্জীবী হওয়ার দুর্জয় তপস্যা। এ-তপস্যায় প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি তিলে তিলে জীবন দিয়ে। দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর।'

('সবার অলক্ষ্যে', ১ম পর্ব, পৃঃ ৩৪)

যতীন দাসের তিলে তিলে এই আত্মদানের উৎস কোথায়? উৎস ঐ আপ্তবাণীর মধ্যে—'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।' অর্থাৎ সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে এই যুদ্ধে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে অন্নগ্রহণ বা অন্নত্যাগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আদর্শের জন্য তিনি নিষ্কাম-চিত্তে এগিয়ে গেলেন। মৃত্যু এল। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত দেহ ত্যাগ করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আদর্শ মৃত্যুহীন হয়ে রইল।

ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ কেটেছে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯২০ সালের পরিসরে। প্রথম, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইংরেজ-রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করে দুঃসাহসিকতায় হত্যা করে, এবং ধরা পড়লে নির্ভয়ে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করে দেশবাসীকে ভয়মুক্ত করার প্রোগ্রাম ছিল বিপ্লবীর। সেই যুগ অতিক্রম করলেন মহানায়ক যতীন মুখার্জি ১৯১৫ সালে, বুড়িবালামের তীরে, বালেশ্বর-যুদ্ধে। এ-যুগেরই অবদান ইন্দো-জর্মান ষড়যন্ত্র ও গদর-অভ্যুত্থান সশস্ত্র-বিপ্লব ঘটানর সংকল্পে। কিন্তু ব্যর্থ হল সকল চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে। এখানেই শেষ হল দ্বিতীয় যুগ—বাধ্যতামূলক খণ্ড-যুদ্ধের যুগ। অতঃপর চার পাঁচ বৎসর বিপ্লবী-

১ পরে ১৯৫০ সালে 'গীতায় স্বরাজ' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। (লেখক)

কর্মীরা রইলেন কারার অন্তরালে। ১৯২০ সাল থেকে ('এ্যামনেস্টি' লাভের পর) শুরু হল আবার বিপ্লবের প্রস্তুতি—তৃতীয় যুগের অনুপ্রবেশ। এই তৃতীয় যুগে আমরা দেখি বিপ্লবীর কাছে গীতার মূল্য একটুও খর্ব না করে তার পাশে স্থান নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা। রবীন্দ্র-কাব্যে বিপ্লবী-কর্মীরা পেলেন গীতা-উপনিষদের ছড়িয়ে-থাকা বাণী। অতি সহজে ও নিটোল আনন্দে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ও রবীন্দ্র-কাব্যে আস্ত একখানি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সন্নিবেশিত দেখলেন তাঁরা তাঁদের মায়ের ভাষায়। এ বস্তু মস্তিষ্ক দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে না, এ হৃদয় দিয়ে মাথায় ঢোকে। এ গীতা বড় আপন, বড় মধুর।...

এ প্রসঙ্গে শহিদ দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে একটি কথোপকথন থেকে কিছুটা উল্লেখ করা যায়।

১৯২৭ সালের কথা। ৯৩-১ এফ্ বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে (কলকাতা), 'বেণু'-মাসিকপত্রের আপিসে, 'বেণু'র তৎকালীন সম্পাদকের সঙ্গে দীনেশ গুপ্তের আলোচনা হচ্ছে। এখানে আলোচনার একাংশ 'ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব' নামক গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৩২৩) তুলে দিচ্ছি :

প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে—কোন্ বস্তু পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও?

—কবিতা।

—গীতার শ্লোকগুলোও তো কবিতা। তবে একদিন বলেছিলে কেন যে, গীতা পড়বার সময় তোমার কষ্ট করে মন বসাতে হয়?

—গীতা পড়তে ভাল লাগে; কিন্তু দু'লাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তখনি ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি সে-যুদ্ধের সৈনিক হব! ব্যস্, গীতাপাঠ খতম হয়ে যায়।

—কিন্তু কার কবিতা তুমি স্থির হয়ে পড়?

—রবীন্দ্রনাথের।

—কেন?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি গীতার বাণী আমার মাতৃকণ্ঠে খুঁজে পাই।...

দীনেশ গুপ্তের শেষোক্ত কথাটি সে-যুগের প্রত্যেকটি বাঙালী বিপ্লবীরই অন্তরের কথা...

এখানে আরো একটি বক্তব্য আছে। বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লবের তৃতীয় যুগে নজরুল ইসলামের প্রভাবও সামান্য ছিল না। নজরুল স্বভাব-ধর্মে ক্ষত্রিয়—মহা ক্ষত্রিয়। তাঁর কাব্য-গান যথার্থ ক্ষত্রিয়ের জয়যাত্রাকে প্রকটিত করেছে। দীনেশ গুপ্তই যখন আবেগদৃপ্ত স্বরে 'অগ্নিবীণা' খুলে আবৃত্তি করতেন :

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত।

তখন মনে হত এই কিশোরই বুঝি কবি নজরুলের মানস-বিদ্রোহী। এবংবিধ

বিপ্লবী-কিশোরদের মধ্যেই বুঝি কবি আহবান করেছেন সেই যৌবন-দেবতাকে যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত :

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

অর্থাৎ 'সৎকে রক্ষার জন্য, অসৎকে বিনাশের জন্য এবং মানবধর্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।'

আবার 'বিদ্রোহী'-কবিতা-পাঠে তন্ময় এই দীনেশচন্দ্রই যখন রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করতেন :

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে ॥

তখনও মনে হত গীতার তত্ত্বকেই তিনি যেন রবীন্দ্রকাব্য-রসধারায় 'অমৃত' করে নিয়ে পান করছেন সর্ব সত্তা দিয়ে ।

সত্ত্বগুণাভিমুখী-ক্ষাত্রশক্তির ধারক দীনেশচন্দ্রের মত প্রত্যেকটি শহিদই অবশ্য গ্রহণ করেছিলেন গীতার মন্ত্র :

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ২।৩১

অর্থাৎ 'স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমার ভীত, কম্পিত হওয়া উচিত নয় । ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই ।' তাই তাঁদের কানে গীতা অনবদ্য আবেগে মাতৃকণ্ঠের ঘুমপাড়ানী ছন্দের মতো ধ্বনিত হত নজরুলের অগ্নি-বীণায়, রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণ-ঝলমল কাব্যস্রোতে । তাঁরা এঁদের গানে-কাব্যে এবং গীতার মন্ত্রগুঞ্জনে ঘুমিয়ে পড়তেন, এ-সব শুনে জেগে উঠতেন । এই বাণী-সঙ্গমে গাহন করেই তাঁদের 'যাত্রা' হতো 'শুরু' । বলতেন—'ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার !'...

বিপ্লবের তৃতীয় যুগের প্রথম প্রকাশ ঘটল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল । 'ইন্-সারেক্শান্'-এর যুগ একে বলা চলে । সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর বিপ্লবী বাহিনী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়িয়ে দিলেন চট্টলার আকাশতলে । স্বাধীন হয়ে গেল শহর চট্টগ্রাম স্বল্পকালের জন্য । পালিয়ে গেল ব্রিটন-পুঙ্গবেরা স্ত্রী-কন্যা-পুত্র নিয়ে, শহর ছেড়ে, নদীনালায় সমুদ্রে । এই যে দুর্ধর্ষ অভিযান—এ-তো শুধুই কতিপয় মৃত্যুঞ্জয়ী যুবকের রণ-যাত্রা, বিপুল ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে । প্রচণ্ড আঘাত হেনে, অভূতপূর্ব আত্মদান করে সমগ্র ভারতবাসীকে জাগ্রত করার এই চেষ্টার মূলে ছিল সেই শক্তি যা মুষ্টিমেয় ঐ বিপ্লবী-যোদ্ধার দল আহরণ করেছিলেন গীতা থেকে । শহিদ হলেন নির্মল সেন, তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণ এবং আরো কত তরুণ ! স্বাদশ-বীর যুদ্ধ করে শহিদ হলেন জালালাবাদ রণাঙ্গনে ! প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দক্ষতায় পাহাড়তলী-এ্যাকশান পরিচালিত করার পর আত্মবিলয়ন

ঘটালেন পটাশিয়াম্ সায়ানাইড্ খেয়ে কী অনায়াসে ! সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন দীর্ঘ চার বৎসর কঠিন সংগ্রাম চালাবার পর বন্দী হয়ে প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে । এই যে 'জীর্ণ বস্ত্রে'র মত অতি সহজে দেহকে পরিত্যাগ করে প্রশান্ত চিত্তে শহিদ-লোকে যাত্রা—এ সম্ভব হয়েছিল শুধু মনোবলে, গীতার মন্ত্র এঁদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' বলে ।

১৯৩০ সালে ২৯শে আগস্ট ঢাকা শহরে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে যে তরুণ লোম্যান্ ও হড্সন্‌কে নিখুঁতভাবে টার্গেট্ করেছিলেন—তাঁর মধ্যে আমারা কি পাই ? পাই অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ-শক্তি, অসীম স্থৈর্য, অপূর্ব আত্ম-প্রত্যয় এবং অবিশ্বাস্য সহজতা । এসব গুণাবলী 'সমত্ব-বুদ্ধি' লাভেরই লক্ষণ । বিনয় বসু সমত্ব-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন । তিনি বুঝেছিলেন গীতার নির্দেশ :

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৮

তাই বিনয়বসু-জাতীয় শহিদদের মধ্যে দেখা যায় সেই শক্তি—যার আশ্রয়ে তাঁরা যোগস্থ হয়ে, ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করে কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন ।

শহীদ দীনেশ গুপ্তর জেলখানা থেকে লিখিত পত্রাবলী এক অপূর্ব জাতীয়-সম্পদ । সেই পত্রগুলো যেন স্বচ্ছ মুকুর । তাদের বুকে ছায়া পড়েছে শুধু দীনেশচন্দ্রের অন্তরের নয়, শহিদগোষ্ঠির হৃদয়গুলোরই ।

দীনেশ লিখছেন : "মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের । কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর । সেই আত্মাই আমি—আমার সেই আত্মাই ভগবান । মানুষের যখন সে-উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, আমিই 'সে'—আগুন আমাকে পুড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয় ; গীতা বলিয়াছেন—শাস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না । এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী ।"

গীতার মর্মবাণী দীনেশের উপলব্ধ অনুভূতি । তিনি আত্মাকে জেনেছেন, ভগবদ্-ধারণাকে স্পর্শ করেছেন । তাই যে-কর্মে তিনি নিযুক্ত, সে-কর্ম ভগবানেরই কাজ বলে তিনি বুঝেছিলেন । তাই মা'কে লিখলেন দীনেশ : "তিনি (ভগবান) যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দিন । সে মালা কি সহজ ? 'এ-তো মালা নয় গো, এ-যে তোমার তরবারি' !"...তিনি আরো বললেন অতি সহজ সুরে : "যে খবর না-দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব ? ভুল, ভুল । 'মৃত্যু' মিত্ররূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে ।"

গীতার সূত্র এর চেয়ে গভীরতর করে পান্ডিত্যাভিমানী কোন বিশ্বজনও কখনো কি উপলব্ধি করেছেন ?...

২২শে নভেম্বর, ১৯৩২ সাল। ডগলাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য কারাগার থেকে লিখছেন তাঁর বড় বৌদিকে ঃ "পুনর্জন্মে মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস তো আছে, এবং শ্রীগীতাতে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।" মৃত্যুতোরণ-উত্তীর্ণ-জীবন ডাক দিয়েছিল প্রদ্যোৎকে। গীতার বাণী অনায়াসে তাই শুনতে পেয়েছিলেন তিনি 'গীতাঞ্জলি'তে ঃ

> আকাশ হতে প্রভাত-আলো
> আমার পানে হাত বাড়ালো,
> ভাঙ্গা কারার দ্বারে আমার
> জয়ধ্বনি উঠল রে, এই
> উঠল রে।

১৯৩৪ সাল, ২রা অক্টোবর। বার্জ-নিধন মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী রামকৃষ্ণ রায় লিখছেন তাঁর মাতৃদেবীকে ঃ "আপনার কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললাম। 'গীতা'টি দিয়ে গেলাম"...

বার্জ-নিধন মামলারই অপর বন্দী ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ১৯৩৪ সালের ২১শে অক্টোবর কারাকক্ষ থেকে লিখছেন তাঁর বাবাকে ঃ

> ...তারি মাঝে যাব অভিসারে
> তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—
> শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী...।

"পুনঃ, 'গীতা' পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম।"

('ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব', পৃঃ ৩৮৪)

কারারুদ্ধ প্রদ্যোৎ বা রামকৃষ্ণ-ব্রজদের মত আত্মসমর্পিত যুবকদল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে-ভয়হীনতার দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত ছিলেন, তার উৎসমুখের ইতিহাস প্রদ্যোৎ-ব্রজদের ছোট্ট চিঠিগুলোয় ধরা পড়েছে।

পাহাড়তলী-অভিযান-নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আত্মবিলয়নের পূর্বে তাঁর মা'র কাছে লিখেছিলেন ঃ 'আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?' সে-পত্রের তারিখ—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সাল।

আবার গভর্নর স্যার জন এন্ডার্সন সাহেবের দন্ডদাতা ভবানী ভট্টাচার্য ফাঁসি যাবার পূর্বে, ১৯৩৫ সালের ৩০শে জুন, চিঠির মাধ্যমে তাঁর ছোট্ট ভাইকে বলে গেলেন ঃ 'অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।'...

এই যে সব অনুভূতি—যা থেকে প্রীতিলতা পেলেন 'সত্য'কে উপলব্ধি করে প্রাণদানের সংকল্প, অথবা ভবানী জানলেন ভয়হীন 'সাধকে'র স্তরে পৌঁছবার

সংকেত—এর পশ্চাতে ঐ একই শক্তি-উৎস। সে শক্তি-উৎস উৎসারিত হয়েছে 'গীতা' থেকে, গীতার বাণী-অভিষিক্ত রবীন্দ্রকাব্য থেকে।

এর-ও পরে, ১৯৪০ সালে, ঐ যে বিপ্লবী উধম সিং জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যালীলার নায়ক ও'ডায়ারকে নিধন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শহর লণ্ডনের কারাগৃহে অবস্থান করার কালে বলেছিলেন ঃ 'I have seen people starving in India under British Imperialism. I am not sorry for protesting. It was my duty to do so just for the sake of my country. I do not mind what sentence—ten, twenty or fifty years, or be hanged'—এই অবিস্মরণীয় উক্তি কোন্ শক্তির বলে উচ্চারিত হয়েছিল? কোন্ শক্তির বলে তিনি নির্ভয়ে, স্মিত-হাস্যে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন সেই দুঃসহ প্রভাতে, স্বদেশ থেকে বহু দূরে ঐ ব্রিটিশ-রাজধানীর নির্বান্ধব পরিবেশে অবস্থান করে? তিনি গীতার সেই বাণী সম্বল করেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি' লাভ করেন নি কি?

> কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২।৪৭

তিনি নিশ্চয় জেনেছিলেন—'কর্তব্য কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো তোমার অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।'

কানাই-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকি-সত্যেনবসু-নলিনীবাগচি-প্রীতিলতা-ধীংড়া-আসফাকুউল্লা-বসন্তবিশ্বাস-বিনয়-বাদল-দীনেশ-ব্রজকিশোর-অনাথপাঞ্জা-প্রদ্যোৎ-মৃগেন-যতীন-দাস-মতিমল্লিক-ভবানী-উধমসিং-রামকৃষ্ণ-নির্মলসেন-দীনেশমজুমদার-ভকৎসিং প্রমুখ অসংখ্য শহিদদের প্রত্যেকে সেই যুগে একটি বাণীর মর্মকথা হৃদয় দিয়ে জেনেছিলেন ঃ

> তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
> বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৬১

তাই এই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে চিত্ত সমাহিত করতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করেই ক্রমে তাঁরা 'সমাহিত-চিত্ত' হতে পেরেছিলেন। নিঃশঙ্কে আত্মদান করে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন যে তাঁরা ছিলেন 'স্থিতপ্রজ্ঞ'।...

১৯৪০ সাল পেরিয়ে এল বিপ্লবের চতুর্থ যুগ। এ যুগের রূপায়ণ সংঘটিত হল বর্মা'র বুকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিতে নেতাজির অকল্পনীয় বৈপ্লবিক নেতৃত্বে।

এই যে বিরাট পুরুষ, এই যে বিশ্ববিশ্রুত আপোষহীন সংগ্রামী নায়ক, এই যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র—এর সমগ্র জীবন জুড়েই ব্যাপ্ত ঐ গীতার নিগূঢ় প্রভাব। গীতার বাণী একান্তভাবে সম্বল করেই দুর্গম পথে 'বিশ্ব-

পথিকে'র বেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সার্থক হয়েছিলেন—কারণ তিনি শুনেছিলেন তাঁর অন্তরতমের কণ্ঠে ঃ

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮।৬৬

এজন্য সুভাষচন্দ্র সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর অন্তরতমেরই শরণ নিতে পেরেছিলেন। সে অন্তরতমের নির্দেশ ছিল ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বই জনের রাজনীতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক মুক্তি আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করা। এ নির্দেশ পালনে তাঁর ফাঁক ছিল না, ফাঁকি ছিল না। এই মহোত্তম কর্মযোগী তাই হলেন সর্ববিধ কল্মষ থেকে মুক্ত। তিনি সাফল্যে বীতরাগ, অসাফল্যে বীতশোক। তাই তিনি 'নেতাজি'। অদ্বিতীয় কর্ম-পুরুষ নেতাজি।...

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী সশস্ত্র-বিপ্লবের ধারকদের শক্তি-উৎস কোথায় জানতে হলে তাঁদের উপর কোন্ বস্তুর প্রভাব কতখানি ছিল তা' জানতে হবে। তা' জানবার চেষ্টা করতে গিয়েই দেখা যায়, গীতার বাণী তাঁদের পথ চলায় অশেষ সামর্থ্য যুগিয়েছে। আরো দেখা যায়—গীতার বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গানে নব কলেবর ধারণ করে, নূতনতর প্রেরণায়, বিশেষ করে বাঙলার বিপ্লবীদের, প্রচুর শক্তিদান করে-তুলেছে।

তাঁদের কাছে গীতার শাশ্বত আহ্বান ঃ

> হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
> তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২।৩৭

তাঁদের কানে রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী কণ্ঠ ঃ

> বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।
> যত লোভ, যত শঙ্কা
> দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
> দূর, দূর, দূর ॥...

প্রতীচ্যে গীতাচর্চা

অমলেন্দু বসু

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভারতীয় সনাতন জীবনদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্যাস বিধৃত, এই বিশ্বাস এই যুগে আমাদের সর্বজন স্বীকৃত। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও গীতার মর্যাদা যে কত উত্তুঙ্গ তার কিছু বহিঃপ্রমাণ পাওয়া যায় অধুনা-প্রকাশিত বহু অনুবাদ ও আলোচনা থেকে। অথচ গীতা সম্বন্ধে ইওরোপের ঔৎসুক্য দ্বিশত বৎসরের অধিক নয়। বস্তুত ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ উইলকিন্‌স্-কৃত যে অনুবাদ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম অনুবাদ। এই অনুবাদ-প্রকাশের একশো বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল স্যর এড্‌উইন্ আর্নল্ড্-কৃত অনুবাদ (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ)। অনুবাদ হিসাবে অনবদ্য না হলেও এই দ্বিতীয় অনুবাদটি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ইংরেজি-ভাষী গীতা-পাঠকের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এমন কি গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি যে ব্যারিস্টারী অধ্যয়ন উপলক্ষে ইংলণ্ডে বাসের পূর্বে তিনি মাতৃভাষাতেও গীতা পাঠ করেন নি, কিন্তু লন্ডনে জনকয়েক নিরামিষ-ভোজী ইংরেজ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি এড্‌উইন্ আর্নল্ডের 'দি সং সেলেশ্চিয়ল' পাঠ করেন এবং এই ভাবেই গীতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল—ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে।

চার্লস্ উইলকিন্‌সের অনুবাদে ইওরোপীয় মানসে ভারতবিদ্যাচর্চার কোন্ নতুন ধারা প্রবর্তনের সাহায্য হয়েছিল সে কথা বুঝতে হলে ঐতিহাসিক পশ্চাৎ-পটের দু'চারিটি রেখা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যে সব ইংরেজ ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং নিজ নিজ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এডোয়ার্ড টেরি (ইনি জাহাঙ্গীরের রাজসভায় কিছুদিন ছিলেন), টমাস্ কোরিয়েট, জন্ ওগিল্‌বি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের ভ্রমণ-কারীরাও এসেছিলেন—ওলন্দাজ মিশনারি এব্রাম রজার (ইনি জার্মান ভাষায় নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছিলেন); জার্মান জেসুইট পাদ্রী হাংক্‌স্‌লিন্‌ডেন্ ১৬৯৯ সালে কিছুকাল মালাবার অঞ্চলে বাস করেছিলেন; ফরাসী পাদ্রী ফাদার পঁস্ ১৭৪০ সালে ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন (বিশেষত অমরকোষ এবং ষড়দর্শন)। জার্মান পাদ্রী জোসেফ স্টেফেনথেলার আঠারো শতকে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য-সম্বলিত এক পুস্তক রচনা করেন; ১৭৯২ সালে অস্ট্রিয়া দেশের পাদ্রী ফ্রা পাওলিনো একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। আঁকেতিল দুপেঁ'র নামে এক তরুণ ফরাসী বিদ্যার্থী ১৮০১-০২ সালে দারাহ্ শিকোহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদের ল্যাটিন অনুবাদ করেন।

॥ ২ ॥

এইভাবে ভারতবিদ্যার প্রসার হতে থাকল ইওরোপে। প্রথমে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হতে থাকল, ক্রমে ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তার দিকে দৃষ্টি পড়ল

কিছু মেধাবী ব্যক্তির। অবশ্য ঐতিহাসিক কারণেই এবিষয়ে ব্যাপকতম উৎসাহ দেখা দিল ইংরেজদের মধ্যে। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র ভারতবর্ষেই ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদিও হিন্দুস্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঐশ্বর্যময়, তবুও ইংরেজদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক নিপুণতা ছিল উচ্চতর, সুতরাং ইরেজ প্রভুত্বে ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ দুয়েরই মঙ্গল সাধিত হবে। তাঁর আরো বিশ্বাস ছিল যে অবনত জাতির ভাষা, সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে প্রভু-জাতি নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারবে না। তিনি নিজে কিছু স্থানীয় ভাষা শিখেছিলেন এবং কোম্পানীর নবীনবয়স্ক কর্মচারীদের উৎসাহ দিতেন যাতে তাঁরাও ভাষা শিক্ষা করেন। যে সব কর্মচারী তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য চার্ল্স্ উইল্কিন্স্ (যিনি পরে 'স্যর' হয়েছিলেন)।

উইলকিন্স্ কলিকাতায় পদার্পণ করেন ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, সাধারণ কেরানীর কাজ নিয়ে এসেছিলেন। কিছুকাল মধ্যেই তিনি বাংলায় ও ফার্সীতে পারদর্শী হলেন, তারপরে সংস্কৃত শিখতে থাকলেন। হেস্টিংসের নির্দেশে তিনি চলে গেলেন কাশীতে ভালো সংস্কৃত শেখার জন্য। কলকাতায় ফিরে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন। অনুবাদ সমাপ্ত হলে হেস্টিংস পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন লন্ডনে কোম্পানীর অফিসে এই সুপারিশ জানিয়ে যে কোম্পানী যেন সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এই বইখানা ছাপেন। মুদ্রিত অনুবাদটি প্রকাশিত হল ১৭৮৫ সালে, হেস্টিংসের ভূমিকা সহ। হেস্টিংসের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু প্রজ্ঞার সারবস্তু বিধৃত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, তাঁর ধারণা ছিল (কোল্‌রিজের ভাষায়) যে এই গ্রন্থে মিলবে 'a proof of sublimity beyond the excellence of Milton in the true adoration of the Supreme Being' (মিল্‌টন্-কাব্যের চেয়েও মহত্তর ভাষায় এই গ্রন্থে পরমাত্মার ভজনা করা হয়েছে)। উইল্কিন্সের এই অনুবাদটি গদ্যে রচিত, এর গদ্যশৈলী স্বভাবতই আঠারো শতাব্দীর পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছতোয়া ইংরেজি গদ্যের সহধর্মী। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুপরিচিত কয়েকটি শ্লোক ও উইল্কিন্সের অনুবাদ উদ্ধৃত হল ঃ

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০
>
> *　　*　　*
>
> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
> অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
> নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥
> অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
> তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২।২২—২৫

It [the Soul] is not a thing of which a man may say, it hath been, it is about to be, or is to be hereafter ; for it is a thing without

birth ; it is ancient, constant, and eternal, and is not to be destroyed in this its mortal frame. ...As a man throweth away old garments, and putteth on new, even so the soul, having quitted its old mortal frames entereth into others which are new. The weapon divideth it not, the fire burneth it not, the water corrupteth it not, the wind drieth it not away ; for it is eternal, universal, permanent, immoveable ; it is invisible, it is inconceivable and unalterable ; therefore, believing it to be thus, thou should not grieve.

উইল্কিন্সের গীতার অনুবাদ আজকাল অতীব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। সৌভাগ্যবশত এই গ্রন্থের দু'খানা কপি কলকাতায় আছে, একখানা ন্যাশ্নাল লাইব্রেরিতে, আরেকখানা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে।

এই অনুবাদ ইংরেজি ভাষার কাব্যে প্রবল সৃজনী-প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কোলরিজ্ এই অনুবাদ পাঠ করেছিলেন ব্রিস্টল্ লাইব্রেরিতে বসে ; তাঁর কাব্যের অনেক অংশে গীতাতত্ত্বের কোনো কোনো ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দার্শনিক বক্তৃতাবলীর কোথাও কোথাও বাইঅগ্রাফিয়া লিটেরারিয়ার প্রথমাংশে, এবং অধুনা-প্রকাশিত তাঁর 'নোট-বুক্স্' গ্রন্থের অন্তত দুই জায়গায় উইল্কিন্স গীতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের প্রথম জীবনের নিত্য সহচর ওয়র্ডস্বোয়র্থ স্বয়ং হয়তো এই গ্রন্থ পাঠ করেন নি, কিন্তু তাঁর কাব্যের কিছু অংশে ('টিন্টার্ন অ্যাবে', 'ইমর্টালিটি ওড্' এবং অন্যত্র) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে মনে হয় তিনি বন্ধুর কাছে কিছু গীতাতত্ত্ব পেয়েছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেলি এই অনুবাদ পড়েছিলেন তার প্রমাণ ইদানীং জনৈক শেলি-বিশারদের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। ম্যাথু আর্নল্ড্ গীতার অনুরাগী ছিলেন সে কথা তাঁর চিঠিপত্রে ও কিছু কবিতায় সপ্রমাণ। তাঁর গদ্যের বিখ্যাত কথাটি—disinterested endeavour—গীতার নিষ্কাম কর্ম কথাটির অনুবাদ। উনিশ শতকে আমেরিকান লেখকেরা কেহ কেহ নিষ্ঠা সহকারে গীতা পাঠ করেছিলেন (ইংরেজি অনুবাদে), যথা থোরো, এমার্সন্, হুইট্‌ম্যান। এড্‌উইন্ আর্নল্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পরে অনেক ইংরেজ কবি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই গৌণ কবি, গীতাতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মহৎ কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ (তন্মধ্যে ইয়েট্স্ ও এলিয়ট সর্বাগ্রগণ্য) গীতাতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ হেন সৃজনী-প্রভাব ইওরোপের অন্যান্য ভাষায়ও, বিশেষত ফরাসী ও জার্মান ভাষায় উজ্জ্বল। সাহিত্য-গবেষকগণ হায়েনরিখ হাইনে ও এমন কি র‍্যাবোঁর কাব্যেও গীতাতত্ত্বের দূরশ্রুত ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। বর্তমান যুগে স্প্যানিস্ কবি হিমেনেথ গীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

॥ ৩ ॥

গীতার প্রভাব একদিকে যেমন সৃজনী সাহিত্যে শক্তিশালী ও ব্যাপক হয়েছে, তার প্রভাব অন্যদিকে, ভারতবিদ্যাচর্চার দিকে, দার্শনিক চিন্তার দিকে, আরও শক্তিশালী এবং দূরপ্রসারী বলে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি

যে সতেরো আঠারো শতকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে নূতন জ্ঞানপিপাসা জাগরূক হয়েছিল তার শরিক ইংরেজগণ যতটা ছিলেন, ফরাসী ও জ্যর্মন পণ্ডিতগণ তার চেয়ে কম ছিলেন না। অবশ্য ইংরেজদের ভারতবিদ্যাচর্চার মূলে খানিকটা ছিল রাজনৈতিক প্রয়োজন, জ্যর্মান, ফরাসী ও অন্যান্য ইওরোপীয় পণ্ডিতদের পক্ষে ছিল বিশুদ্ধতর জ্ঞানপিপাসা। ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে স্যর চার্লস্ উইলকিন্‌স্ আদৌ নিঃসঙ্গ ছিলেন না, বস্তুত তাঁর গুরুতুল্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ এবং হেনরি টমাস্ কোলব্রুক। জোন্‌স্ ভারতবিদ্যার নানাদিক আলোচনা করে প্রতীচীর নিকটে অজস্র নূতন তথ্যের ও চিন্তার উদ্‌ঘাটন করলেন। তিনি হিন্দু আইন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ করলেন (সেই অনুবাদ পাঠ করে গ্যোয়টে, শ্লেগেল, শিলার, হের্ডের প্রমুখ জ্যর্মান লেখকগণ অনুপ্রাণিত হলেন), হিতোপদেশেরও মনুসংহিতার অনুবাদ করলেন; করলেন সবই ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। তাঁর বহুমুখী অবদানের মধ্যে পড়ছে শব্দতত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি, এবং এই ঐশ্বর্যময় অবদানের জন্য ডক্টর জন্‌সন্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, মানবসন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানোজ্জ্বল প্রতিভা এঁরই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস্ 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন তখন অনিবার্যভাবেই স্যর উইলিয়ম্ জোন্‌স্‌কে সভাপতিত্বে বরণ করলেন। কিছুকাল পরে লন্‌ডনে, প্যারিসে, বন্ নগরে ও সেন্ট পিটার্সবার্গেও অনুরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হল। নানা ইওরোপীয় দেশে ভারতবিদ্যার সর্বদিকে আলোচনা হতে থাকল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যবহারিক প্রথার সব কিছুরই আলোচনার যে প্রবল প্রবাহ উদ্বেল হয়ে উঠল তার কোনো ক্ষান্তি আজ পর্যন্ত হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

যাবতীয় ইওরোপীয় ভারতবিদ্যানুরাগী সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, তথাপি ফ্রান্‌ৎস্ বপ্, ম্যাক্‌স্ মূলার, মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্, সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, লুই রেনো, ওয়েবার প্রভৃতির নাম অবিস্মরণীয়। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি বিশেষভাবে গীতাতাত্ত্বিকদের কথা। এই দৃষ্টিতে উইল্‌কিন্‌সের পরেই নাম করতে হয় জার্মান পন্ডিত আউগুস্ত ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন্ শ্লেগেলের। শ্লেগেল ছিলেন সংস্কৃতের একনিষ্ঠ নিপুণ সাধক, তাঁর অন্যান্য বহু কর্মের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। তিনি রামায়ণেরও অনুবাদ করেছিলেন এবং দুটি অনুবাদ একই সঙ্গে ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদটির বিশেষত্ব দ্বিবিধ: প্রথমত, তিনি দেবনাগরী হরফে গীতার শ্লোকসমূহ মুদ্রিত করেন, দ্বিতীয়ত, অনুবাদটি ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের কারণ সম্ভবত শ্লেগেল মনে করতেন যে মূল সংস্কৃতের ধ্রুপদী পদ-গাম্ভীর্যের অনুকৃতি ল্যাটিনে যতটা সম্ভব কোনো আধুনিক ভাষায় ততটা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। অনুমান হয় যে সে কারণেই উনি গীতার অনুবাদ জ্যর্মানে না করে ল্যাটিনে করেছিলেন। জ্যর্মান ভাষায় অবশ্য ইতিপূর্বে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে, উইলকিন্‌সের ইংরেজী অনুবাদ থেকে গীতার ভাষান্তর হয়েছিল, মূল সংস্কৃত থেকে নয় বলে এই অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ। শ্লেগেলের এই অনুবাদ হয়ে উঠল জ্যর্মানিতে ভারতবিদ্যাচর্চার প্রাণবন্ত উৎস। বন্, বের্লিন, হাইডেলবার্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চার কর্মব্যস্ত কেন্দ্র গড়ে উঠল, জ্যর্মানি থেকে ভারতবিদ্যাচর্চার উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ল অস্ট্রিয়ায়, (বর্তমান

কালের) চেকোস্লোভাকিয়ায়, রোমানিয়ায়, এমন কি রুশদেশেও। সংস্কৃত ভাষায় প্রতীচীর পণ্ডিতেরা সুপ্রাচীন আর্যভাষা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যময় মঞ্জিমার সন্ধান পেলেন। তাঁদের উৎসাহে তুলনমূলক ভাষাতত্ত্ব (কম্‌প্যারেটিভ্ ফিললজি) নামক নূতন বিদ্যার প্রচলন হল। জ্যর্মান সাহিত্যিকগণ আঠারো শতকের শেষভাগ থেকেই ভারতীয় চিন্তায় উৎসাহী হয়েছিলেন, প্রধানত উইলিয়ম জোন্‌সের 'শকুন্তলা' এবং উইল্‌কিন্‌সের 'গীতা' অধ্যয়নান্তে। শ্লেগেলের গীতাচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য পন্ডিতেরাও অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। বস্তুত উনিশ শতকের ইওরোপীয় মহাপন্ডিতদের নিরলস গবেষণা, সম্পাদনা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, সমন্বয়ী আলোচনার ফলেই আমরা ভারতীয়রা (অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে রাজেন্দ্র-লাল মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর, গার্বে প্রমুখ মহাপন্ডিতগণের অবদানও চিরস্মরণীয়) আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে যেন নূতন করে অবহিত হলাম। এইসব ইওরোপীয় পন্ডিতদের মধ্যে মাত্র জনকয়েকের নামই বর্তমানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। বেদ অনুবাদ ও আলোচনা করেছিলেন ম্যাক্‌স্ মূলার, হোরেস্ উইলসন্, কাওয়েল, ওল্‌ডেন্‌বার্গ, গ্রাস্‌মান্, বার্নেল, লুডহিবগ্, কায়েগি। উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন ম্যাক্‌স্ মূলার; মহাভারত হোল্‌ৎস্‌মান ও হপকিন্‌স্ (আমেরিকান পন্ডিত); ভাগবতপুরাণ বুর্নুফ, অন্যান্য পুরাণ উইল্‌সন্, হল্; ষড়দর্শনের অনুবাদে ও চর্চায় লিপ্ত হয়েছিলেন ম্যাক্‌স্ মূলার, গোল্‌ডস্টুকার, ম্যাক্‌ডোনেল, ডয়সেন্; শংকর-মীমাংসা-ভাষ্য অনুবাদ করেছিলেন থীব, রোয়ের-কৃত সাংখ্য-অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। আইন সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনা করেছিলেন জলী, বুলার (ধর্মসূত্র, স্মৃতি), কোলব্রুক; বৌদ্ধধর্ম চর্চায় বুর্নুফ (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক), সেনার্ট (মহাবস্তু), ম্যাক্‌স্ মূলার (বজ্র পরিচ্ছেদ)। এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ, সঙ্গীত, নৃত্য, অলঙ্কার, গণিত, খ-বিদ্যা—বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সর্বপ্রকার গ্রন্থের ও চিন্তার আলোচনায় ইওরোপীয় পন্ডিতদের অবদান অবিস্মরণীয়।

॥ ৪ ॥

এই পন্ডিতগণ যে সকলেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন এমন নয়, কিন্তু তাঁরা যখন মহাভারতের বা বেদান্তের অনুবাদ ও আলোচনা করেছেন তখন অনিবার্যভাবেই গীতার অলোচনা এসে পড়েছে। তাঁরা শুধু গীতা পাঠই করেন নি, গীতার নানাবিধ ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও তাঁরা অবহিত থেকেছেন। ইউজিন্ বুর্নুফ ফরাসী ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্‌ৎস্ লরিন্‌গের করেন জ্যর্মান ভাষায় ১৮৬৯ সালে, দোমেত্রিয়া করেন গ্রীক ভাষায় ১৮৫৮ সালে। এর পরে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায়ই গীতার অনুবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকল। সর্বাধিক সংখ্যক অনুবাদ ও আলোচনা অবশ্যই হল ইংরেজি ভাষায়—ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে। যাবতীয় অনুবাদ ও আলোচনার গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়।[১] এই প্রবন্ধে

১ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষীদের অনূদিত ও ব্যাখ্যাত ভাগবদ্‌গীতার একটি বিস্তৃত তালিকা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে : পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

প্রাসঙ্গিকবোধে জনকয়েক ভারতীয় কর্তৃক গীতার ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখ করা হল। সর্বপ্রথমে অবশ্য বালগঙ্গাধর তিলকের নাম উল্লেখ করতে হয়। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণান এবং বিনোবা ভাবের অনুবাদ সুনাম অর্জন করে। মহাত্মা গান্ধী গীতার এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর বিশেষ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

এক ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে এই শতাব্দীতে, স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ইশেরউড্ কর্তৃক। কাগজের মলাটে মেন্টর বুক হিসাবে মাত্র ৩৫ সেন্ট দামে প্রকাশিত হয়ে বইখানার কয়েক লক্ষ কপি আমেরিকায় ও অন্যত্র বিক্রীত হয়ে গীতার প্রচার সর্বজন অধিগম্য হয়েছে। অনুবাদটি স্বচ্ছ অথচ গম্ভীর ভাষায় রচিত এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য অলডাস্ হাক্সলির মূল্যবান ভূমিকা-প্রবন্ধ। হাক্সলি একটি বাক্য উদ্ধার করেছেন আনন্দ কুমারস্বামীর এক গ্রন্থ থেকে, যার মর্মার্থ হচ্ছে: যেহেতু গীতাতে প্রাচীন বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে বিধৃত মূল বৈদিক চিন্তার সারকথা ব্যক্ত হয়েছে এবং যেহেতু পরবর্তী কালের ভারতীয় চিন্তারও কেন্দ্রীয় তত্ত্ব এই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে, সেজন্য বলা যায় যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভারতীয় ধর্মের সংহতি-বিন্দু। হাক্সলি আরও অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেছেন: This focus (সংহতি-বিন্দু) of Indian religion is also one of the clearest and most comprehensive summaries of this Perennial Philosophy ever to have been made. Hence its enduring value, not only for Indians, but for all mankind.

গীতার এই বিশ্বাত্মিক মূল্যের কথা ইদানীং হাক্সলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হয়েছে, বিশেষ করে তাঁর 'পেরেনিয়াল ফিলসফি' নামক গ্রন্থে। হাক্সলি দেখিয়েছেন যে গীতার কতকগুলি মূলসূত্রের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের ও ইসলামের চিন্তা-সাদৃশ্য বিদ্যমান। গীতার কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বাইবেল কথিত মার্থা (কর্ম) ও মেরী (ভক্তি) নাম্নী দুই ভগ্নীর কাহিনীতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হাক্সলি বুদ্ধিনির্ভর আলোচনায় বলেছেন যে Ways leading to the delivering union with God, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ প্রসাদাৎ যে জীবন্মুক্তি হয়ে থাকে তার মাত্র দুটি পথ নয়, কেবল মার্থার ও মেরীর পথই নয়, কেবল কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ নয়, অথবা এ-কালের বিচক্ষণ মনোবিৎ য়ুঙ্গ যে দুটি মনঃপন্থার নির্দেশ করেছেন (অর্থাৎ এক্‌স্‌ট্রোভার্সান ও ইন্‌ট্রোভার্সান) কেবল সে দুটিই নয়, বরঞ্চ তিনটি মার্গই একই পরম লক্ষ্যে মানবাত্মাকে উত্তীর্ণ করতে পারে—the way of work, the way of knowledge and the way of devotion—অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ। হাক্সলি বলেছেন, In Hindu thought the outlines of this completer and more adequate classification are clearly indicated, এখানে গীতাতত্ত্ব অন্যান্য তুলনীয় মুক্তিতত্ত্বের চেয়ে পূর্ণতর ও অধিকতর গ্রাহ্য। হাক্সলি আরো বলেছেন যে নিষ্কাম কর্মের যে অতুলনীয় তত্ত্ব গীতাতে বিধৃত হয়েছে তার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় পরবর্তী কালে সন্ত ফ্রান্সিস্ দ্য সেইলসের holyin difference নামক তত্ত্বে।

বস্তুত গীতার স্বল্পায়তনের মধ্যে জাগতিক জীবনের ও পারমার্থিক জীবনের, উভয়েরই গভীরতম তত্ত্বগুলি স্বচ্ছতম ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে প্রকাশ করা

হয়েছে। গীতার প্রতিটি বাণী অপরিসীম ঔদার্যে মণ্ডিত। যে অবতার-প্রত্যয় নিয়ে অর্ধশিক্ষিত ধর্মযাজকগণ হিন্দু প্রত্যয়ের নিন্দা করেছেন, সে বিষয়ে 'পেরেনিয়াল ফিলসফি'তে বলা হয়েছে, the doctrine that God can be incarnated in human form is found in most of the principal historic expositions of the philosophy—in Hinduism, in Mahayana Buddhism, in Christianity and in the Mohammedanism of the Sufis. (ঈশ্বর যে মনুষ্য-অবয়বে সমূর্ত হতে পারেন এই তত্ত্ব যাবতীয় শাশ্বত দর্শনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, হিন্দুধর্মে, মহাযান বৌদ্ধধর্মে, খৃষ্টধর্মে এবং সুফী মতাবলম্বী মহম্মদীয় ধর্মে।)—একথা বলার পরেই আরো বলা হয়েছে, the Christian doctrine of incarnation of the God-head in human form differs from that of India and the Far East inasmuch as it affirms that here has been and can be only one Avatar (মনুষ্য-মূর্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে খৃষ্টীয় প্রত্যয় ভারতীয় ও দূর প্রাচ্যের অনুরূপ প্রত্যয় থেকে ভিন্ন, কেননা এই প্রত্যয় বলে যে অবতার মাত্র একবারই হয়েছে, আর হতে পারে না।)—ভারতীয় চিন্তার অপরিসীম ঔদার্যের ও গভীরতার পরিচয় অবশ্য প্রতীচী জগৎ পেয়েছেন ও পেতে পারেন বহু ভারতীয় গ্রন্থ থেকে (যথা বেদ, উপনিষদাবলী, মহাভারত); কিন্তু ভারতবিদ্যানুরাগী ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ যদিও এসব গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করেছেন, তবুও এসব গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের সমীপে বড়ো একটা উপস্থিত হয় নি। বরং অন্য দুই সূত্রে—গীতাচর্চায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপিত ভাষণাবলীতে—এই সর্বমত-সমন্বয়ী, আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তাসম্মত উদার ও সুগভীর ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে ইওরোপীয় ভাবধারায়। যদিও গ্যোয়েটে এবং হেগেল গীতাতত্ত্ব গ্রহণ করেন নি, শ্লেগেলের প্রভাবে ইমানুয়েল কান্ট এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, তাঁর বিখ্যাত নুমেনন ও ফেনোমেনন সংক্রান্ত ধারণা গীতার ক্ষয়শীল লৌকিক সত্য ও অক্ষয় অব্যয় পারমার্থিক সত্য সংক্রান্ত ধারণার সগোত্র। ইংরেজ বা আমেরিকান দার্শনিকগণ গীতাতত্ত্বের তেমনটি নিকটবর্তী হতে পারেন নি, কেননা তাঁদের চিন্তা মূলত প্র্যাগমেটিক (যে চিন্তা প্রত্যক্ষ কার্যকারিতার বিচারে সীমাবদ্ধ)। পক্ষান্তরে জার্মানদের সহজাত দার্শনিকতার দরুন তাঁরা গীতাতত্ত্বে পুনঃপুনঃ আকৃষ্ট হয়েছেন, শোপেনহাওয়ার থেকে ডয়সেন, গ্লাসেনাপ, এমন কি শোয়াইট্‌সার অবধি।

॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সুধীজন-সমাজের অংশবিশেষে অবশ্যই গীতা সমাদৃত হয়েছে; কিন্তু সেজন্য এমন চিন্তা বা দাবি করা সঙ্গত হবে না যে গীতা-অনুরাগী ইওরোপীয় বা আমেরিকানগণ প্রচ্ছন্ন হিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অনেক হিন্দু ইওরোপীয় খৃষ্টীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি (অন্তত অংশত) শ্রদ্ধাবান, তথাপি তাঁরা নিষ্ঠাবান হিন্দুই থেকে গেছেন। অপর ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া মানে স্বধর্মচ্যুত হওয়া নয়। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যেন অত্যুক্তি না করি; উদ্দাম দাবি পোষণ না করি। বস্তুত কোনো কোনো তীক্ষ্ণধী ইওরোপীয়ান মনীষী গীতা অথবা ভারতীয় চিন্তা সম্পূর্ণত গ্রহণ করার

পক্ষে অন্তরে বিঘ্ন বোধ করেছেন। স্মরণ রাখা দরকার যে স্বয়ং মাক্স্‌ মুলার (যাঁকে ভারতবাসী আচার্য ভট্ট মোক্ষমূলর আখ্যা দিয়েছে) বলেছিলেন : Greece and India are indeed the two opposite poles in the historical development of the Aryan man. To the Greek existence is full of life and reality : to the Hindu it is a dream, an illusion. (আর্য মানবের বিবর্তনশীল ইতিহাসে গ্রীস এবং ভারত দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে। গ্রীকের দৃষ্টিতে মানবসত্তা সত্য জীবনময়, হিন্দুর দৃষ্টিতে এই সত্তা স্বপ্ন মাত্র, শুধুই মায়া)। —অর্থাৎ ইওরোপীয় মনোভঙ্গীর মূলে গ্রীক জীবন-পন্থাই কার্যকরী, হিন্দু পন্থা নয়। সম্ভবত এহেন ধারণার বশবর্তী হয়েই গ্যোয়েটে বলেছিলেন ১৮২৬ সালে : I have by no means an aversion to things Indian, but I am afraid of them, for they draw my imagination into the formless and the diffuse, against which I have to guard myself more than ever before. (আমি কোনোমতেই ভারতীয় ধ্যানধারণার বিরোধী নই, বরং আমি সে বিষয়ে ভয় পাই, সে সব ধ্যানধারণা যেন আমার কল্পনাকে কোন নিরবয়ব অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে টানে, তার বিরুদ্ধে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়)। ইওরোপীয়ের পক্ষে আপন দীর্ঘায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার অনুত্তরণীয় বিভেদজ্ঞান একটা অন্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২১ সালে টাইম্‌স্‌ লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট পত্রিকায় জনৈক প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার গ্রাহ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন, Acceptance of Tagore's ideas would mean a grave danger, nay, the decline of European culture. One thing however is certain : the Hellenistic thought which until now dominated the spiritual history of Europe and was responsible for its progress must be rejected as an error, should Tagore be right. (রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা গ্রহণ করা ইওরোপীয় সংস্কৃতির পক্ষে মহতী বিপদের, বস্তুত পতনের কারণ হবে। একটি কথা নিশ্চয় করে বলা যায় : যে গ্রীক চিন্তা আজ পর্যন্ত ইওরোপের আত্মিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তার অগ্রগতির কারণ হয়েছে, সে ভাবধারাকে ভুল বলে ত্যাগ করতে হবে যদি রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা সত্য বলে মানি)।

এই ঐতিহ্যগত এবং ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক ব্যবধান নিতান্ত অনতিক্রম্য নয়। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অপর দার্শনিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করা অসম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে কোনো ইওরোপীয় (স্মরণ করুন নিবেদিতাকে, কৃষ্ণপ্রেমকে) আচরণে, মনে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেলেন ঠিক যেমন কোন ভারতীয় ষোল আনা সাহেব বনে গেলেন (দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই), তথাপি এটাই স্বাভাবিক যে বিদেশীয় সংস্কৃতির ও চিন্তার অনুরাগী হয়েও কেউ আপন ঐতিহ্যেই নিবিষ্ট থাকবেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার প্রভাব অনুধাবন করার কালে মনুষ্যচিত্তের এই প্রবণতার বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। ইওরোপে ও আমেরিকায় প্রচুর গীতাচর্চা হয়েছে প্রায় দুশো বৎসর যাবত, এই মহৎ গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে অনেকের চিন্তায়—সাহিত্যে ও দর্শনে—তথাপি অনুরাগী ব্যক্তিগণ স্বধর্মেই নিরত থেকেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই স্বধর্ম পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

॥ মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥
যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদ-ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

—গীতার ধ্যানমন্ত্র

মা জগজ্জননি, আমি যখন গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া গীতার অক্ষয় শান্তির ভাণ্ডার হইতে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম, তখনই সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া শ্রীগীতা প্রকাশের কথা আমার মনে উদিত হইয়াছিল—উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আমার ন্যায় শোকদুঃখ-প্রপীড়িত নরনারীগণ শ্রীগীতার আলোচনার দ্বারা চিত্তের শান্তি ও শক্তি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে বুঝিতেছি তুমিই মা আমাকে তখন এই প্রেরণা দিয়াছিলে। তারপর যখন রোগশয্যায় শায়িত হইয়া গীতা-প্রকাশের আশা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার রোগযন্ত্রণার উপশম করিয়া আমাকে আবার এই কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলে। তারপর কত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতি ঘটনায় তোমার অপার করুণার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও কৃতার্থ হইয়াছি। সত্যই মা তুমি মূককে বাচাল কর, পঙ্গুর দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাও। নচেৎ এই অধমকে তুমি গীতার মহান ভাব প্রচারের মতি দিবে কেন ?···

* * * *

এক্ষণে প্রার্থনা করি ভারতের লাঞ্ছিত ও সুষুপ্ত আমার ভ্রাতাভগিনীগণ যেন গীতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের সমস্ত দৈন্য ও অবসাদ পরিত্যাগ-পূর্বক হৃদয়ে বল লাভ করে এবং নব জাগরণে জাগরিত ও নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া যেন নিজেদের এবং মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োজিত করিতে পারে।

॥ ইতি শ্রীভগবদর্পণমস্তু ॥

প্রথম অধ্যায়

॥ বিষাদ যোগ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

অন্বয় ঃ ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ (ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন) সঞ্জয় (হে সঞ্জয়) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধার্থী) মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব (আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ) ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ (সমবেত হইয়া) কিম্ অকুর্বত (কি করিলেন)।

শব্দার্থ ঃ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যভাগস্থ ভূমির নাম কুরুক্ষেত্র। ইহা একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বর্তমান দিল্লী নগরী এই প্রান্তরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত। কুরুক্ষেত্র পূর্বে সমন্তপঞ্চক নামে অভিহিত ছিল। এই স্থানে পরশুরাম শোণিতদ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমন্তপঞ্চক পূর্বেও তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ কুরুরাজ এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। কথিত আছে কুরুরাজ এই ক্ষেত্রে কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র প্রথমে তাঁহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কুরুরাজ তাহাতে নিবৃত্ত না হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ে তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে তপস্যা করিতে করিতে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে তাহারই স্বর্গলাভ হইবে। ইন্দ্রের নিকট এই বর লাভ করিয়া কুরুরাজ হলচালনায় নিবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্র ভারতের অতি প্রাচীন অন্যতম তীর্থ ও পুণ্যভূমি। যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কার্যের নিমিত্ত ইহা অতি প্রশস্ত স্থান। এই স্থান সম্বন্ধে জাবালোপনিষদে লিখিত আছে—'যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ।' কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেবযজন স্বরূপ এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষ লাভের নিকেতন। শতপথ ব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে 'তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্ ।' বর্তমান কালেও কুরুক্ষেত্র একটি প্রধান তীর্থভূমিরূপে পরিচিত। অনেক যোগী সন্ন্যাসী, বহু তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর এই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধের জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে মহাসমরের পর আধুনিক কালেও এইস্থানে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে।

মামকাঃ—(১) মদীয় [পুত্রগণ]। এই শব্দ দ্বারা পুত্রদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহাতিশয্য সূচিত হইতেছে। (২) 'মামকাঃ' শব্দে কেবল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে না বুঝাইয়া ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃবর্গকেও বুঝাইতে পারে।

পাণ্ডবাঃ—(১) পাণ্ডুপুত্রগ, (২) পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ।

সঞ্জয়ঃ—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি জন্মান্ধ। রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহার কিছু দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ যুদ্ধের ঘটনা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। এজন্য ব্যাসদেব প্রথমে তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্বচক্ষে আত্মীয়-স্বজনের মিধন দর্শন করা কণ্টকর হইবে বিবেচনায় তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তখন ব্যাসদেব মন্ত্রী সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়া সমস্ত যুদ্ধব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। এমন কি কেহ কোন কথা বলিলে অথবা কাহারও মনে কোন ভাবের উদয় হইলে তাহাও সঞ্জয়ের অবিদিত থাকিত না। তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, শুনিতেন বা জানিতে পারিতেন তাহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেন। এক্ষণে 'যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত মৎপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিলেন?'—ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই ভগবদ্গীতার আরম্ভ।

অকুর্বত—'মৎপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিলেন?'—ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের সার্থকতা সম্বন্ধে কতিপয় প্রাচীন টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের মনের একটি গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইলে উক্ত ধর্মক্ষেত্রের প্রভাববশতঃ যদি উভয়পক্ষীয় বীরগণের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক হয় তবে হয়ত যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে অথবা যদি পাণ্ডুপুত্রগণের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয় তবে তাহারা হয়ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। তাহা হইলে সহজেই দুর্যোধনের বাসনা পূর্ণ হইবে। এজন্যই ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন—উভয়পক্ষ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না অন্যপথ অবলম্বন করিলেন?

শ্লোকার্থ ঃ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—হে সঞ্জয়, আমার পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন?

ব্যাখ্যা ঃ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ন্যায় একটা বিষম হত্যাকাণ্ড কোনও ধর্মক্ষেত্রে বা পুণ্যভূমিতে সম্পন্ন হওয়া আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে যে এই যুদ্ধে বহুলোকের বিনাশসাধন হইলেও ইহা ধর্মযুদ্ধ—অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকারার্থই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। পাপাচারীদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাই এই মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য। কাজেই এই ধর্মযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়াতে পুণ্যক্ষেত্রের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রকেই এই মহাযুদ্ধের স্থানরূপে নির্দেশ করিবার আরও একটি কারণ এই যে ইন্দ্রের বরপ্রভাবে কুরুক্ষেত্রের এই খ্যাতি ছিল যে, যে ব্যক্তি এই পুণ্যভূমিতে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে তাহারই স্বর্গলাভ হইবে। কাজেই যুদ্ধ করিয়া হয় জয়লাভ নচেৎ মৃত্যুকে বরণ করিয়া স্বর্গলাভ—ইহাই উভয়পক্ষীয় বীরগণের প্রার্থিত হওয়াতে তাঁহারা কুরুক্ষেত্রকেই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন যে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জুনের চিত্তে সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এজন্যই তিনি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না। অর্জুনের হৃদয়ে একটা ত্যাগের ভাব আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা সাত্ত্বিক বৈরাগ্য নহে। বিচারমূলে বিষয়ের দোষ দর্শনে মনে যে বৈরাগ্যের উদয়

হয় অর্জুনের বৈরাগ্য সেইপ্রকারের নহে। স্বজনবিয়োগের আশংকায় ব্যথিত এবং স্বজনবধজনিত পাপের ভয়ে ভীত হইয়াই তিনি যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সত্ত্বরজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়স্বভাব সাময়িকভাবে তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই ভাবকে 'অনার্যোচিত, অস্বর্গ্য কশ্মল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গীতার উপদেশ যে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে তাহা সুসঙ্গতই বটে। ধর্মক্ষেত্রই এইরূপ মহান আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপদেশের যোগ্য স্থান। এজন্যই গীতার আরম্ভেই ধর্মক্ষেত্র এই বিশেষণ দ্বারা স্থানের যোগ্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

অন্বয় ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তদা (তৎকালে) রাজা দুর্যোধনঃ (রাজা দুর্যোধন) পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তু (পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহবন্ধ দেখিয়াই) আচার্যম্ উপসঙ্গম্য (আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই বাক্য বলিলেন)।

শব্দার্থ ঃ পাণ্ডবানীকম্—পাণ্ডবদিগের অনীক [সৈন্য]।

ব্যূঢ়ম্—ব্যূহাকারে সজ্জীকৃত। যুদ্ধার্থ সৈন্যসমাবেশকে ব্যূহ বলে। 'সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্।' সমস্ত সৈন্যের স্থানভেদে বিন্যাসের নাম ব্যূহ। ব্যূহরচনা সম্বন্ধে প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল যে প্রধান সেনাপতি ব্যূহের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেন। ব্যূহের একটি প্রধান দ্বার থাকিত এবং এই দ্বার একজন প্রধান বীরপুরুষ কর্তৃক রক্ষিত হইত। বিপক্ষ এই দ্বার ভেদ করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত। কোনপ্রকারে দ্বাররক্ষককে পরাজিত করিয়া শত্রুসেনা ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। এই কারণে দ্বাররক্ষককেও বিশেষ সাবধানতা ও কৌশলের সহিত দ্বাররক্ষা করিতে হইত। বর্তমান কালেও এরূপ ব্যূহরচনার প্রথা প্রচলিত আছে।

আচার্যম্—দ্রোণাচার্যকে। দ্রোণ দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে আচার্য বলা হইয়াছে।

শ্লোকার্থ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—তৎকালে পাণ্ডবসৈন্যকে যুদ্ধার্থ ব্যূহাকারে সজ্জিত দেখিয়া রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যদিগকে ব্যূহবন্ধ দেখিয়া এবং যুদ্ধ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে মনে করিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীষ্মদেব সর্বপ্রথম সেনাপতি পদে বৃত হওয়াতে পাছে দ্রোণাচার্য আপনাকে অনাদৃত বা উপেক্ষিত মনে করিয়া যুদ্ধে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন না করেন এই আশংকায় দুর্যোধন স্বয়ং দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের অবস্থা নিবেদন করিলেন এবং ভীষ্মকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সেনাপতিদিগকে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্মের নিকট না যাইয়া দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হওয়ার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে ভীষ্ম ছিলেন যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তিপ্রয়াসীদের নেতা। ভীষ্মের

উপদেশ উপেক্ষা করিয়াই দুর্যোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কাজেই ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইতে দুর্যোধনের ভয় ও লজ্জা হইতেছিল। পাছে ভীষ্ম পুনরায় সন্ধিস্থাপনের পরামর্শ দেন—এই আশঙ্কাও ছিল। তারপর ভীষ্ম যে পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত স্নেহবান এবং তাঁহাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাও দুর্যোধনের জানা ছিল। এজন্য ভীষ্মের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে স্মরণ করিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্‌।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অন্বয়ঃ আচার্য (হে আচার্য), তব ধীমতা শিষ্যেণ (আপনার ধীমান শিষ্য) দ্রুপদপুত্রেণ (দ্রুপদপুত্র কর্তৃক) ব্যূঢ়াম্‌ (ব্যূহাকারে নিবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্‌ (পাণ্ডুপুত্রদিগের) এতাং মহতীং চমূম্‌ (এই মহতী সেনা) পশ্য (দর্শন করুন)।

শব্দার্থঃ মহতীম্‌ চমূম্‌—বিরাট সৈন্যবাহিনী। দুর্যোধন মনে করিয়াছিলেন যে রাজ্যভ্রষ্ট সহায়হীন পাণ্ডবদিগের পক্ষে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত দেখিয়া দুর্যোধন বিস্মিত হইয়াছিলেন।

দ্রুপদপুত্রেণ—দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ বাল্যকালে দ্রোণের সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ ছিলেন। তিনি পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে দ্রোণকে অপমানিত ও উপেক্ষিত করেন। সেই জন্য পঞ্চালরাজ দ্রোণশিষ্যগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধকল্পে পঞ্চালরাজ দ্রোণের বধার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অগ্নির মধ্য হইতে বর্ম ও অস্ত্রধারী এক দেবকুমার আবির্ভূত হন এবং তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হয় যে এই দ্রুপদকুমার দ্রোণাচার্যকে বধ করিবেন। ইঁহারই নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন।

তব ধীমতা শিষ্যেণ—তোমার বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী শিষ্য কর্তৃক। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দৈব অপ্রতিবিধেয় বিবেচনায় স্থিরবুদ্ধি দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রাণান্তক জানিয়াও তাঁহাকে যথাবিহিত যত্নসহকারে অস্ত্রশিক্ষা দেন। ইহাতে দ্রোণাচার্যের অসাধারণ হৃদয়বল এবং মাহাত্ম্যই সূচিত হইতেছে। আচার্য দ্রোণ এই শিষ্যহস্তেই নিহত হইয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রু হইয়াও কৌশলে দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন—'ধীমান্‌' শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

শ্লোকার্থঃ হে আচার্য, আপনার শিষ্য প্রতিভাবান ও অস্ত্রবিদ্যাসম্পন্ন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডুপুত্রদিগের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী দর্শন করুন।

ব্যাখ্যাঃ শত্রুপক্ষের শক্তিমত্তার উল্লেখপূর্বক দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বিশাল পাণ্ডববাহিনীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। পাণ্ডবসেনা কৌরবসৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প ছিল, কিন্তু ব্যূহরচনার কৌশলে উহা বিশাল দেখাইতেছিল। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে আরও বলিয়া দিলেন যে তাঁহারই শিষ্য প্রতিভাবান অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক এই ব্যূহ রচিত

হইয়াছে। কাজেই উহা উপেক্ষণীয় নহে। সকলে সম্মিলিতভাবে বিশেষ চেষ্টা না করিলে উক্ত ব্যূহভেদ করিয়া জয়লাভের আশা করা যায় না।

দ্রুপদপুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অদ্যকার যুদ্ধে পঞ্চালগণই পাণ্ডবসৈন্যের নেতা, পঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যূহ রচিত হইয়াছে। অথচ এই পঞ্চালগণ দ্রোণাচার্যের প্রধান শত্রু। শত্রুর নাম উল্লেখ করিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের চিত্তে শত্রুদমনস্পৃহা জাগাইয়া তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ বাড়াইয়া দিতেছেন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্‌।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্‌।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ অত্র (এই সেনামধ্যে) শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ (বীর ও মহাধনুর্ধর) যুধি ভীমার্জুনসমা (যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের তুল্য) মহারথঃ (মহারথী) যুযুধানঃ বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ (সাত্যকি, বিরাট এবং দ্রুপদ) বীর্যবান্‌ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ কাশিরাজঃ চ (বীর্যবান্‌ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং কাশিরাজ) নরপুঙ্গবঃ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ শৈব্যঃ চ (নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ কুন্তিভোজ এবং শৈব্য) বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ (বিক্রমশালী যুধামন্যু) বীর্যবান্‌ উত্তমৌজাঃ চ (বীর্যবান্‌ উত্তমৌজাঃ) সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ (সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ) সর্বে এব মহারথাঃ (ইঁহারা সকলেই মহারথ)।

শব্দার্থঃ মহেষ্বাসাঃ—মহা [অন্যের অজেয়] ইষ্বাস্‌ [ধনু] যাহাদের, মহাধনুর্ধর; ভীমার্জুনসমা—ভীম ও অর্জুনের তুল্য বীর; ভীম ও অর্জুন তৎকালীন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন; কাজেই ভীমার্জুনের তুল্য বীর বলাতে উঁহাদের বীরত্বের প্রশংসা করা হইয়াছে। যুযুধানঃ—সাত্যকি, ইনি যদুবংশীয় প্রধান বীর। পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ—ইহা দুই বিভিন্ন পুরুষের নাম নহে। যে কুন্তিভোজ রাজাকে কুন্তি পালন করিয়াছিলেন পুরুজিৎ তাঁহার ঔরসপুত্র। কুন্তিভোজ তাঁহার কৌলিক নাম। ইনি যুধিষ্ঠিরাদির মাতুল ছিলেন। ধৃষ্টকেতুঃ—শিশুপালের পুত্র। শৈব্যঃ—শিবিদেশের রাজা। যুধামন্যুঃ উত্তমৌজাঃ—ইঁহারা পঞ্চালবংশীয়, অর্জুনের চক্ররক্ষক ছিলেন। চেকিতানঃ—যদুবংশীয় বীর; সৌভদ্রঃ—সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু। দ্রৌপদেয়ঃ—দ্রৌপদীর গর্ভজাত প্রতিবিন্দ প্রভৃতি পাণ্ডবগণের পঞ্চপুত্র। মহারথাঃ—যিনি একাদশ সহস্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ তাঁহাকে মহারথ বলা হয়।

শ্লোকার্থঃ এই পাণ্ডবসেনা মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ বীর মহারথ সাত্যকি, বিরাট এবং দ্রুপদ, বীর্যবান ধৃষ্টকেতু, চেকিতান এবং কাশিরাজ, নরশ্রেষ্ঠ কুন্তিভোজ-বংশীয় পুরুজিৎ এবং শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান্‌ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রভৃতি বীর ও মহাধনুর্ধর আছেন। ইঁহারা সকলেই মহারথ।

ব্যাখ্যা ঃ দুর্যোধন প্রথমে দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডবদের বিরাট বাহিনী দেখাইলেন, তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক রচিত দুর্ভেদ্য বজ্রব্যূহের কথা উল্লেখ করিলেন। এক্ষণে শত্রুপক্ষীয় প্রধান বীরগণের নামোল্লেখ করিয়া আচার্যকে যুদ্ধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতেছেন। তাঁহাদিগকে যে বড় বড় মহারথের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং সেই জন্য যে পরস্পরের সাহায্য এবং ঐক্যের প্রয়োজন তাহাও বলিয়া দিলেন। বীর্যবান, বিক্রান্ত, নরপুঙ্গব প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের শৌর্যবীর্যের আধিক্যই সূচিত হইতেছে।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

অন্বয় ঃ দ্বিজোত্তম (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ), অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ (আমাদেরও যাঁহারা প্রধান) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যের নায়ক) তান্ নিবোধ (তাহাদিগকে নিশ্চয় জানুন) তে সংজ্ঞার্থম্ (আপনার সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদের নাম বলিতেছি)।

শব্দার্থ ঃ দ্বিজোত্তম—দ্বিজদের [ব্রাহ্মণদের] মধ্যে উত্তম [শ্রেষ্ঠ], ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঃ এই ত্রিবর্ণের শ্রেষ্ঠ। দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বিজোত্তম বলা হইয়াছে। বিশিষ্টাঃ—পরমোৎকৃষ্ট, প্রধান। সংজ্ঞার্থম্—সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত (শ্রী) ; অসংখ্য বীরের মধ্যে কয়েকজনের নাম করিয়া পরিচয় দেওয়ার নিমিত্ত।

শ্লোকার্থ ঃ হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমাদের পক্ষভুক্ত যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যদের যাঁহারা নেতা তাঁহাদিগকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া লউন। আপনার সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত তাঁহাদের নাম বলিতেছি।

ব্যাখ্যা ঃ পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান বীরগণের নাম শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে অজেয় মনে করিয়া পাছে দ্রোণাচার্য যুদ্ধে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন এই আশংকায় দুর্যোধন স্বপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ বীরগণের নাম উল্লেখপূর্বক তাঁহাদের পরিচয় দিতেছেন। অবশ্য কোন্ কোন্ প্রধান যোদ্ধা দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন দ্রোণাচার্য মোটামুটি তাহা জানিতেন তথাপি তাঁহার সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত কতিপয় বিশিষ্ট নেতার নাম উল্লেখ করা হইল।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অন্বয় ঃ ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ (আপনি, ভীষ্ম ও কর্ণ) সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ (যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য) অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ (অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ) অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (আরও অনেক বীর) মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ (আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত) সর্বে [তে] (তাহারা সকলেই) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধাস্ত্রধারী) যুদ্ধবিশারদাঃ (এবং সংগ্রামে নিপুণ)।

শব্দার্থ ঃ সমিতিঞ্জয়ঃ—সমিতি [সংগ্রাম] যিনি জয় করেন, যুদ্ধজয়ী। কৃপঃ—কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্যের শ্যালক ; ইনিও ব্রাহ্মণ এবং কৌরবদিগের অস্ত্রগুরু। অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্যের পুত্র, জন্মিয়াই ইনি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম অশ্বত্থামা। বিকর্ণঃ—দুর্যোধনের শত ভ্রাতার অন্যতম। সৌমদত্তিঃ—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ভবান্—আপনি, দ্রোণাচার্যের সম্মান বর্ধনার্থ তাঁহার নাম অগ্রে বলা হইয়াছে। মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ—আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত ; প্রাণত্যাগেও আমার উপকারসাধনে প্রবৃত্ত। নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ—যাহাদের নানা শস্ত্র [খড়্গ, বাণ প্রভৃতি] এবং প্রহরণ [গদা প্রভৃতি] আছে। জয়দ্রথঃ—ইনি সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন, দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার সহিত ইহার বিবাহ হয়। অভিমন্যুকে যে সপ্তরথী বধ করিয়াছিল ইনি তাহাদের অন্যতম।

শ্লোকার্থ ঃ আপনি (দ্রোণ), ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ এবং আরও অনেক বীর আমার প্রয়োজন-সাধনার্থ প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন। নানাবিধ অস্ত্রধারী এই বীরগণ সকলেই সংগ্রামে নিপুণ।

ব্যাখ্যা ঃ দুর্যোধনের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে ভারতবর্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন তাঁহাদের অনেকে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহার সৈন্যসংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী হইয়াছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে দুর্যোধনের পক্ষ অধর্মের পক্ষ। তিনি বলপূর্বক অবিচারে পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পিতৃরাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই অত্যাচার সত্ত্বেও তাহার পক্ষাবলম্বী লোকের অভাব হয় নাই। এমন কি অনেকে নিজেদের রাজ্য, ধন এবং প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও দুর্যোধনের খাতিরে, ভয়ে অথবা অন্য কারণে তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমান করা যায় সেই সময়ে অধর্মের কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই অধর্ম ও অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্তই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। অধর্ম যখন অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন তাহার প্রতিকার প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমাজের অধিকাংশ লোক অধার্মিক হইয়া উঠে, যখন দেশব্যাপী ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই একটা মানব-ধ্বংসকারী বিপ্লবের সূচনা হয়। অন্যান্য কালে এবং অন্যান্য দেশেও এই কারণে এরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বহুকালের ও বহুব্যাপী সঞ্চিত অধর্মের যে অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অন্বয় ঃ ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্ম কর্তৃক চতুর্দিকে রক্ষিত) অস্মাকং তৎ বলম্ (আমাদের সেই সৈন্য) অপর্যাপ্তম্ (অপর্যাপ্ত)। তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীম কর্তৃক রক্ষিত) এতেষাম্ ইদং বলম্ (ইহাদের এই সৈন্য) পর্যাপ্তম্ (পর্যাপ্ত)।

শব্দার্থ ঃ অপর্যাপ্তম্—অপরিমিত (আ) ; যুদ্ধে অসমর্থ (শ্রী)। পর্যাপ্তম্—পরিমিত (আ) ; সমর্থ (শ্রী)। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্—ভীষ্ম কর্তৃক চতুর্দিকে রক্ষিত। ভীমাভিরক্ষিতম্—ঐদিনকার যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নই পাণ্ডবসৈন্যের নায়ক ছিলেন। তিনিই

বজ্রব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীম ঐ ব্যূহের দ্বারদেশরক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই পাণ্ডবসৈন্যের রক্ষক বলা হইয়াছে।

শ্লোকার্থ ঃ ভীষ্ম কর্তৃক চতুর্দিকে রক্ষিত আমাদের সৈন্য অপরিমিত (সংখ্যায় অধিক), ভীম কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য পরিমিত (সংখ্যায় অল্প)।

ব্যাখ্যা ঃ প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, যথা ঃ (১) আমাদের এই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য অপরিমিত, ইহারা প্রথিতনামা ভীষ্ম কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ; কাজেই ইহারা শত্রুগণের পরাভবে সমর্থ (আ)। (২) ঐ বীরগণ কর্তৃক যুক্ত এবং ভীষ্মদেব কর্তৃক রক্ষিত হইলেও আমাদের সৈন্য পাণ্ডবদিগের পরাজয়ে অসমর্থ, ভীম কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদিগের বল পর্যাপ্ত অর্থাৎ আমাদের অভিভবে সমর্থ (শ্রী)।

বোধ হয় দুর্যোধনের মনের ভাব এই ছিল যে যদিও তাহার সৈন্যসংখ্যা পাণ্ডবদের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অধিক তথাপি বিপক্ষই অধিক বলবান। অবশ্য দুর্যোধন যেরূপ অহঙ্কারী এবং উদ্ধত ছিলেন তাহাতে তিনি যে স্বপক্ষের দুর্বলতা স্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভবপর নয়—একথা মনে করিলে প্রথমোক্ত অর্থই সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু পাণ্ডবগণের অপ্রত্যাশিত সৈন্য সংগ্রহ, তাহাদের পক্ষে বহু প্রসিদ্ধ বীরের উপস্থিতি এবং ধীমান ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যূহরচনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া দুর্যোধনের চিত্তে ভয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

অন্বয় ঃ সর্বেষু চ অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশের সকল পথে) যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ (স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থিত হইয়া) সর্বে এব হি ভবন্তঃ (আপনারা সকলেই) ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু (ভীষ্মকেই রক্ষা করুন)।

শব্দার্থ ঃ অয়নেষু—ব্যূহপ্রবেশের পথসমূহে। যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ—যাঁর যাঁর বিভক্ত [নির্দিষ্ট] স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, স্ব স্ব রণভূমি ত্যাগ না করিয়া। অভিরক্ষন্তু—চারিদিকে ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

শ্লোকার্থ ঃ আপনারা সকলে ব্যূহপ্রবেশের সমস্ত পথে স্ব স্ব বিভাগানুসারে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকে চারিদিক হইতে রক্ষা করুন।

ব্যাখ্যা ঃ দুর্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণকে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা যেন স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সেনাপতি ভীষ্মকে সকল দিক হইতে রক্ষা করেন ; কদাপি যেন স্থানত্যাগ না করেন। কারণ, ভীষ্ম সেনাপতি, তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেই সকলের রক্ষা, সেনাপতির পরাজয় হইলেই সমস্ত সৈন্যের পরাজয়। ভীষ্মদেব সেনাপতিপদে বৃত হইয়াছেন বলিয়া কেহ যেন নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধকার্যে অবহেলা না করেন। এই কথা দুর্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। ভীষ্মদেব মহাবলপরাক্রান্ত। তিনি নিজেই আত্মরক্ষায় সমর্থ। কিন্তু শিখণ্ডী সম্মুখস্থ হইলে যুদ্ধ করিবেন না—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। এজন্য শিখণ্ডী যাহাতে তাঁহার সম্মুখস্থ হইতে না পারে অথবা পশ্চাৎ দিক হইতে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে এজন্য দুর্যোধন স্বপক্ষীয় প্রধান বীরগণকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতেছেন।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

অন্বয় ঃ প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ (তাহার হর্ষ উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খ বাজাইলেন)।

শব্দার্থ ঃ কুরুবৃদ্ধঃ—কুরুবংশীয়দের মধ্যে বৃদ্ধ, এজন্য প্রবীণ ও বহুদর্শী। পিতামহঃ—ভীষ্মদেব দুর্যোধনাদির পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরাদির পিতা পাণ্ডু, এই উভয়ের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন ; এজন্য তাঁহাকে পিতামহ বলা হইয়াছে। সিংহনাদং বিনদ্য—সিংহনাদ করিয়া, সিংহের ন্যায় শব্দ করিয়া। প্রতাপবান্—প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। এই বিশেষণটিতে বুঝাইতেছে যে ভীষ্মদেব বৃদ্ধ হইলেও পরাক্রান্ত ছিলেন।

শ্লোকার্থ ঃ কুরুকুলের বৃদ্ধ, কিন্তু পরাক্রান্ত পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে দুর্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শঙ্খধ্বনি করিবার প্রথা প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। তদনুসারে ভীষ্মদেব শঙ্খধ্বনি করিলেন। শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ খুব উচ্চ ও গভীর হইলে স্বপক্ষীয়গণের চিত্তে উৎসাহ জন্মে এবং বিপক্ষের চিত্ত বিষণ্ণ হয়। ভীষ্মদেবের উচ্চ সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া দুর্যোধনের ভয় দূর হইল, তাহার চিত্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে ভীষ্মদেব যেরূপ উৎসাহ ও পরাক্রমের সহিত সিংহনাদ করিতেছেন তাহাতে জয়লাভের আশা করা যাইতে পারে।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

অন্বয় ঃ ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ (শঙ্খ ও ভেরীসকল) পণবানকগোমুখাঃ (পণব, আনক ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্রসকল) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (সহসা বাজিয়া উঠিল) ; সঃ শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হইল)।

শব্দার্থ ঃ পণবানকগোমুখাঃ—পণব [মর্দল] আনক [পটহ] এবং গোমুখ [বাদ্যযন্ত্র বিশেষ] সকল।

শ্লোকার্থ ঃ ভীষ্মের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনির পর শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্রসকল কুরুসৈন্য মধ্যে সহসা বাজিয়া উঠিল এবং তাহাতে মহান শব্দ উত্থিত হইল।

ব্যাখ্যা ঃ ভীষ্মের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনির পর চারিদিকে কুরুসৈন্য মধ্যে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রসকল এককালে বাজিয়া উঠিল এবং তাহাতে তুমুল শব্দ হইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে রণবাদ্য বাজাইবার নিয়ম সর্বত্রই প্রচলিত আছে, ইহাতে যোদ্ধৃবর্গের চিত্তে উৎসাহের সঞ্চার হয়। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিলেই বুঝা যায় যে যুদ্ধ আসন্ন। বর্তমান কালেও সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য রণবাদ্য বাজান হয়।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

অন্বয় ঃ ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণের অশ্বযুক্ত)

মহতি স্যন্দনে (মহান রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ (দিব্য শঙ্খ বাদন করিলেন)।

শব্দার্থ ঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ—অর্জুনের রথের অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ছিল। শুভ্র শ্বেতবর্ণ পুণ্য ও পবিত্রতার পরিচায়ক। স্বয়ং নরনারায়ণ যে রথে উপবিষ্ট, যাঁহারা পুণ্য ও পবিত্রতার মূর্তি তাঁহাদের রথে শ্বেতবর্ণের অশ্বযোজনা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। মহতি স্যন্দনে—অর্জুন যে রথে উপবিষ্ট ছিলেন তাহা অগ্নিদত্ত দিব্যরথ। খাণ্ডবদাহে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব অর্জুনকে এই রথ দান করিয়াছিলেন। এই রথের চূড়ায় স্বয়ং কপিরাজ হনুমান উপবিষ্ট ছিলেন, এজন্য ইহার নাম ছিল কপিধ্বজ রথ। দিব্যৌ শঙ্খৌ—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য এবং অর্জুনের দেবদত্ত নামক শঙ্খ পার্থিব নহে, উহারা অপ্রাকৃত, দিব্য শঙ্খ।

শ্লোকার্থ ঃ সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া শুভ্রবর্ণ অশ্বযুক্ত অগ্নিপ্রদত্ত মহান রথে আরূঢ় কৃষ্ণ এবং অর্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ কৌরবপক্ষের শঙ্খধ্বনি ও রণবাদ্য শ্রবণে যুদ্ধ আসন্ন ভাবিয়া অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহাদের শঙ্খ পার্থিব নহে, কাজেই সেই শঙ্খধ্বনি শত্রুর হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল। শ্বেতাশ্বযুক্ত অগ্নিদত্ত মহারথ, দিব্য শঙ্খ এবং তদুপরি নরনারায়ণের একসঙ্গে অবস্থান—এই সকল দ্বারা পাণ্ডবগণের অবশ্যম্ভাবী জয়ই সূচিত হইতেছে।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যম্ (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তম্ (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীমকর্মা বৃকোদরঃ (ভীষণকর্মা ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রম্ (পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ) কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় শঙ্খ) নকুলঃ সহদেবশ্চ (নকুল এবং সহদেব) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন)।

শব্দার্থ ঃ হৃষীকেশঃ—হৃষীক [ইন্দ্রিয়] সমূহের ঈশ [প্রভু], সর্বেন্দ্রিয়প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ। অথবা হৃষী অর্থাৎ আনন্দে দণ্ডায়মান বা প্রশস্ত যাঁহার কেশ, শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়ঃ—ধনকে [ধনাধিপতি কুবেরকে] জয় করিয়াছেন যিনি, অর্জুন। ভীমকর্মা—ভীম [ভীষণ] কর্ম [হিড়িম্বাবধাদিরূপ কার্য] যাঁহার। বৃকোদরঃ—বৃকের [ব্যাঘ্রের] ন্যায় উদর যাঁহার, বহু অন্ন ভোজনবশতঃ অতি বলিষ্ঠ ভীমসেন। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ—যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া মুখ্য রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি এক্ষণে রাজ্যভ্রষ্ট, তথাপি তিনি কৌরব রাজ্যের অর্ধাংশের অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে রাজা বলা হইয়াছে।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ, ভীষণকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং পঞ্চ পাণ্ডব এক সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিলেন। ইঁহাদের শঙ্খ-

গুলি স্বনাম প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে কৌরবদের কোন শঙ্খেরই নাম দেওয়া হয় নাই। ইহাতেই পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খধ্বনির বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

অন্বয় ঃ পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্র), পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ (মহাধনুর্ধর কাশিরাজ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাটরাজ) অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (অপরাজিত সাত্যকি) দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (মহাবাহু সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু) সর্বশঃ (ইঁহারা সকলে) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন)।

শব্দার্থ ঃ পরমেষ্বাসঃ—পরম [শ্রেষ্ঠ] ইষ্বাস [ধনু] যাহার, মহাধনুর্ধর। শিখণ্ডী—দ্রুপদ রাজার পুত্র, ইনি ক্লীব ছিলেন। এজন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল যে শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখিলেই তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবেন। পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়াই নিরস্ত্র ভীষ্মকে শরশয্যায় পাতিত করিয়াছিলেন। অপরাজিতঃ—যিনি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। সর্বশঃ—সকলে এক সময়ে।

শ্লোকার্থ ঃ হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু—ইঁহারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

অন্বয় ঃ তুমুলঃ সঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ এবং পৃথিবী) ব্যনুনাদয়ন্ (বা 'অভ্যনুনাদয়ন্'—বিনাদিত করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল)।

শব্দার্থ ঃ তুমুলঃ—বিপুল অতিভৈরব। ব্যনুনাদয়ন্—বিশেষরূপে নাদযুক্ত করিয়া (আ); অভ্যনুনাদয়ন্ [প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ করিয়া] (শ্রী)। ব্যদারয়ৎ—বিদীর্ণ করিল, হৃদয়বিদারণতুল্য বেদনা জন্মাইল। ধার্তরাষ্ট্রাণাম্—ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের, অথবা ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণের।

শ্লোকার্থ ঃ পাণ্ডবদিগের সেই ভৈরব শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের হৃদয় বিদীর্ণ করিল অর্থাৎ শত্রুপক্ষের বীর্য ও উৎসাহ দর্শনে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত ও ভগ্নোৎসাহ হইল।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করেন তাঁহাদের বীর্য অসীম, উৎসাহ অদম্য; তাই তাঁহাদের সিংহনাদ শঙ্খধ্বনিতে এরূপ শব্দ উত্থিত হইল যে তাহাতে আকাশ ও

পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গেল। সেই ভৈরবনাদে দুর্যোধনপক্ষীয় বীরগণের হৃদয়ে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল, তাহাদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল বিপক্ষ কত প্রবল এবং তাহারা কত দুর্বল। তাহাদের চিত্ত হইতে বিজয়ের আশা একেবারে লুপ্ত হইল। অধার্মিক দুরাচারগণ সর্বত্রই ধর্মের ভৈরবনাদ শ্রবণে এইরূপ ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পাণ্ডবপক্ষের শংখধ্বনির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরগণের মধ্যে কেবল ভীষ্মদেবই শংখধ্বনি করিয়াছিলেন। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষগণের শংখধ্বনির কোন উল্লেখ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণ ও অর্জুন শংখধ্বনি করিবামাত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট প্রভৃতি বীরগণ একসংগে শংখধ্বনি করিলেন। ইহাতে পাণ্ডবগণের ঐক্য ও উৎসাহ এবং কৌরবগণের অনৈক্য ও নিরুৎসাহই সূচিত হইতেছে।

তারপর কৌরবপক্ষে ভীষ্মের সিংহনাদ এবং শংখধ্বনিতে দুর্যোধনের চিত্তে হর্ষ হইয়াছিল; কিন্তু বিপক্ষের চিত্তে যে কোনপ্রকার ত্রাস বা বিষাদের সঞ্চার হইয়াছিল—একথার উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে পাণ্ডবগণের শংখধ্বনি শ্রবণে কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে পাণ্ডবদিগের ভাবী জয় এবং কৌরবগণের ভাবী পরাজয় সূচিত হইতেছে।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অন্বয়ঃ মহীপতে (হে পৃথিবীপতি), অথ (অনন্তর) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (শস্ত্রক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গকে ব্যবস্থিত দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলন করিয়া) তদা (সেই সময়ে) হৃষীকেশং (হৃষীকেশকে) ইদং বাক্যম্ আহ (এই বাক্য বলিলেন)।

শব্দার্থঃ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে—শস্ত্রক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে, শস্ত্রসমুদয় প্রয়োগাভিমুখ হইলে (আ)। কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ—অর্জুনের রথে কপি [হনুমান] অবস্থিত ছিলেন বলিয়া অর্জুনকে কপিধ্বজ বলা হইয়াছে। ব্যবস্থিতান্—যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত (শ্রী); যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত।

শ্লোকার্থঃ হে পৃথিবীপতি রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), অতঃপর বাণক্ষেপের সময় উপস্থিত হইলে দুর্যোধনপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জীকৃত দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জুন গাণ্ডীব ধনু উত্তোলনপূর্বক সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বলিলেন।

ব্যাখ্যাঃ কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া অবস্থিত আছে, উভয়পক্ষে যুদ্ধের প্রাক্কালীন শংখধ্বনি হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অস্ত্রানিক্ষেপের সময় উপস্থিত। অর্জুন অস্ত্রত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে ধনু উত্তোলন করিয়াছেন—এমন সময় তাঁহার মনে হইল কাহার কাহার সংগে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার দেখিয়া লওয়া দরকার। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন। দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও অর্জুন যুদ্ধাভিলাষীই ছিলেন, এমন কি শস্ত্রক্ষেপের জন্য ধনুও উত্তোলন করিয়াছিলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁহার চিত্তে বিষাদের কোনও ভাব জাগিয়া উঠে নাই। ইহার

পর আত্মীয়গণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াই তাঁহার চিত্তের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত), যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত এই বীরগণকে) যাবৎ অহং নিরীক্ষে (যাবৎ আমি নিরীক্ষণ করি) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধোদ্যোগে) কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ (কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে)? যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ (দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের প্রিয়সাধনেচ্ছু) যে এতে অত্র সমাগতাঃ (যাঁহারা এই স্থানে সমাগত) যোৎস্যমানান্ [তান্] অহম্ অবেক্ষে (যুদ্ধার্থী তাহাদিগকে আমি অবলোকন করি) [তাবৎ] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) মে রথং স্থাপয় (আমার রথ স্থাপন কর)।

শব্দার্থঃ অচ্যুত—যাঁহার স্বরূপের কখনও চ্যুতি [বিকার বা বিনাশ] হয় না, শ্রীকৃষ্ণ। যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্—যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিত, যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত। প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছুক।

শ্লোকার্থঃ অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ, কাহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইস্থানে অবস্থিত হইয়াছেন এবং এই যুদ্ধব্যাপারে কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে? দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের হিতসাধনে ইচ্ছুক হইয়া এইস্থানে যাহারা উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ব্যক্তিদিগকে যতক্ষণ আমি দর্শন করি, ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুন জানিতেন যে দুর্যোধনের পক্ষে অনেক বীরপুরুষ সমবেত হইয়াছে, কিন্তু কে কে আসিয়াছে বিস্তারিত জানিতেন না। তাই একবার তাহাদিগকে দেখিয়া লইতে চাহিলেন। দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধিবশতই এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অসঙ্গত রাজ্যলোভই এই যুদ্ধের হেতু। কিন্তু দুর্যোধন অধার্মিক হইলেও তাহার পক্ষসমর্থনকারীর অভাব হয় নাই। যাহারা তাহার আত্মীয়, অধীনস্থ, বিত্তভোগী বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী তাহারাই তাহার প্রিয়কার্য সাধনের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের ক্ষত্রিয়বংশের তখন অবনতি হইয়াছিল। তাই দুরাচারেরও অনেক সহায়কারী জুটিয়াছিল। এই সকল সহায়কারী কে কে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ইহা সম্যক্ দেখিয়া লইবার নিমিত্তই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সৈন্যের মধ্যভাগে রথস্থাপন করিতে বলিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশঃ গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—ভারত (হে ভারত), গুড়াকেশেন এবমুক্তঃ (অর্জুন কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যভাগে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ (ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমুদয় নরপতির সম্মুখে) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা (উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া) পার্থ (হে অর্জুন) সমবেতান্ এতান্ কুরূন্ পশ্য (সমবেত এই কুরুবংশীয়দিগকে দেখ)—ইতি উবাচ (এই কথা বলিলেন)।

শব্দার্থ ঃ ভারত—ভারতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র। গুড়াকেশেন—(১) গুড়াকা [নিদ্রা] তাহার ঈশ [প্রভু]; অর্জুন জিতনিদ্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গুড়াকেশ বলা হয়। (২) অথবা গুড়া গর্থাৎ গূঢ় বা ঘন যাঁহার কেশ তিনিই অর্জুন। ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ—(১) ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে; ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা বলিয়া তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। (২) ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি। কুরূন্—কুরুবংশীয় যোদ্ধৃবর্গকে। পার্থ—পৃথার [কুন্তীর] তনয় বলিয়া অর্জুনের এক নাম পার্থ। রথোত্তমম্—উৎকৃষ্ট দিব্য কপিধ্বজ রথ।

শ্লোকার্থ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ এবং যুদ্ধার্থ আগত অন্যান্য নরপতির সম্মুখে অর্জুনের উৎকৃষ্ট দিব্যরথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'হে অর্জুন, যুদ্ধার্থ সমবেত কুরুবংশীয় এই বীরগণকে দর্শন কর।'

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যগ্রহণের কতকগুলি কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নেতা, অধর্মাচারী কুরুকুলের বিনাশ সাধনপূর্বক ধর্মরাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি স্বয়ং যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিলে লোকে তাঁহাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে করিত। অথচ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলে পাণ্ডবগণের জয়লাভ সহজসাধ্য ছিল না। এই কারণেই তিনি সারথির কার্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্ ।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সেই স্থানে) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ (উভয় সেনাতেই অবস্থিত) পিতৄন্ অথ পিতামহান্ (পিতৃব্য ও পিতামহদিগকে) আচার্যান্ মাতুলান্ (আচার্য ও মাতুলদিগকে) ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ (ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র ও সখাদিগকে) শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব (শ্বশুর এবং সুহৃদ্গণকে) অপশ্যৎ (অবলোকন করিলেন)।

শ্লোকার্থ ঃ অর্জুন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনাতেই অবস্থিত পিতৃব্য তথা পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও বন্ধুদিগকে দেখিতে পাইলেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুন কি দেখিলেন? দেখিলেন, যাঁহারা তাঁহার নিকট আত্মীয়, একবারে আপনার জন, যাঁহাদিগকে লইয়া সংসারে তাঁহার সুখ, শান্তি, যাঁহারা তাঁহার পূজনীয় শিক্ষাগুরু, যাঁহারা পিতৃস্থানীয় বা পুত্রকল্প, যাঁহারা বন্ধু ও সুহৃদ আজ তাঁহারাই যুদ্ধার্থীরূপে উভয় সেনাতে অবস্থিত। যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে তবে ইঁহারা প্রায় সকলেই নিহত হইবেন এবং তাঁহাকেই নিজহস্তে কত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের বিনাশ সাধন করিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে যুবক বৃদ্ধ নানা শ্রেণীর লোকই আছেন। এই বৃদ্ধদের হত্যা, যুবকদিগের অকাল মৃত্যু কত শোচনীয়, কত দুঃখের হেতু!

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭

অন্বয়ঃ সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন) সর্বান্ তান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য (সেই সমস্ত বন্ধুকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাপরবশ) বিষীদন্ (এবং বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন)।

শব্দার্থ ঃ—বন্ধূন্—যথোক্ত পিতৃপিতামহাদি আত্মীয়দিগকে। পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ—পরম করুণা দ্বারা অভিভূত, আপ্লুত। 'ইহা আমার', এই প্রকার মোহজনিত যে স্নেহ তাহার নাম কৃপা। বিষীদন্—বিষণ্ণ হইয়া, বিষাদের সহিত।

শ্লোকার্থ ঃ কুন্তীপুত্র অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরব এবং পাণ্ডবপক্ষীয় উভয় সেনার মধ্যে আত্মীয় বন্ধুবর্গকে যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখিয়া সাতিশয় করুণা দ্বারা অভিভূত হইয়া বিষণ্ণভাবে এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ সম্মুখে বান্ধব ও আত্মীয়গণকে দেখিয়া অর্জুনের হৃদয়ে করুণার উদয় হইল। মনে হইল, হায়! ইহারা ত প্রায় সকলেই এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে, আমি কি করিয়া আমার আত্মীয়গণকে স্বহস্তে বধ করিব, ইহাদের অকাল মৃত্যু কত শোচনীয়, কত কষ্টকর—এই কথা মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে দুর্যোধনাদি আত্মীয়-স্বজনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং যুদ্ধে বহু আত্মীয়ের মৃত্যু হইবে—ইহা ত অর্জুন পূর্বেই জানিতেন এবং তাহা জানিয়াই তো তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। তবে এখন তাঁহার বিষণ্ণ হওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে আমরা যখন আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে অবস্থিত থাকি তখন তাহাদের প্রতি করুণা এবং মমতার তীব্রতা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু তাহারা যখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত করুণা ও মমতা উথলিয়া উঠে। অর্জুনেরও তাহাই হইয়াছিল, অধিকন্তু নিজহস্তে স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন।

কিন্তু অর্জুনের চিত্তে যে বিষাদ আসিয়াছিল তাহার আর একটি গভীর কারণ আছে। অর্জুন ছিলেন তদানীন্তন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্বপ্রধান কর্মী। কিন্তু যতক্ষণ কর্মীর চিত্ত জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ সে মোহের

আক্রমণ হইতে একবারে নিস্তার পায় না। অজ্ঞানী কর্মীর উদ্দেশ্য যতই মহৎ, সংকল্প যতই দৃঢ়, জীবন যতই উন্নত হউক না কেন মায়া-মোহের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া সময় সময় সাধুচরিত্র জিতেন্দ্রিয় কর্মীকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার সত্ত্বরজোগুণ-প্রধান প্রকৃতি স্বজনগণের মৃত্যু কল্পনায় সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া একবারে বিকল হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

অন্বয় ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় সম্মুখে অবস্থিত) ইমান্ স্বজনান্ (এই স্বজনদিগকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি সীদন্তি (আমার অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ পরিশুষ্যতি (মুখও পরিশুষ্ক হইতেছে) মে শরীরে (আমার দেহে) বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে (কম্প এবং রোমাঞ্চ জন্মিতেছে) হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু স্খলিত হইতেছে) ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে (এবং চর্মও দগ্ধ হইতেছে) কেশব (হে কেশব) অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি (আমি আর স্থির থাকিতেও পারিতেছি না) মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব (আমার মনও যেন ঘুরিতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি (বিপরীত লক্ষণসকলও দেখিতেছি)।

শব্দার্থ ঃ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্—যুদ্ধার্থ সজ্জীকৃত হইয়া সম্যক অবস্থিত। রোমহর্ষঃ—রোমাঞ্চ, গাত্ররোমসমূহের পুলক। বেপথুঃ—কম্প। পরিদহ্যতে—দগ্ধ হইতেছে, অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে। গাণ্ডীবভ্রংস দ্বারা অধৈর্য-লক্ষণ এবং চর্মদহন দ্বারা অন্তঃসন্তাপ দর্শিত হইয়াছে। অবস্থাতুম্—স্থিরভাবে অবস্থান করিতে। মে মনঃ ভ্রমতীব—আমার মন যেন ঘুরিতেছে অর্থাৎ আমি এক বিষয়ে স্থির হইয়া মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না, আমার চিন্তাশক্তি যেন লোপ পাইতেছে। বিপরীতানি নিমিত্তানি—প্রতিকূল অমঙ্গলসূচক লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ, যেমন শকুনাদি (শ্রী); বামনেত্র স্ফুরণাদি (আ)।

শ্লোকার্থ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিবার অভিলাষে সম্মুখে অবস্থিত এই আত্মীয় ও বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার হস্তপদাদি অঙ্গসকল অবসন্ন হইতেছে, মুখও শুকাইয়া যাইতেছে, আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু খসিয়া পড়িতেছে, সমস্ত চর্ম যেন পুড়িয়া যাইতেছে। হে কৃষ্ণ, আমি স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেছি না। আমার মন যেন ঘুরিতেছে, চারিদিকে প্রতিকূল অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দেখিতেছি।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের চিত্তে যে বিষাদ জন্মিয়াছিল তাহা এত গভীর যে বাহিরেও তাহার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইল। চিত্তে কোনও প্রবল ভাবের উদ্রেক

হইলে তাহা যে দেহের কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করে তাহা সচরাচরই দৃষ্ট হয়। অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ সরল বীরের হৃদয়ে কোনও ভাবের উচ্ছ্বাস হইলে তাঁহার পক্ষে উহা সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। কপটাচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণই হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অর্জুনের সেইরূপ অভ্যাস না থাকাতেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোকদুঃখ বাহিরেও প্রকাশ পাইল।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

অন্বয় ঃ আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (স্বজনকে বধ করিয়া) শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি (শ্রেয়ও দেখিতেছি না) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে (আমি জয়ের আকাঙ্ক্ষা করি না) রাজ্যং চ সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে] (রাজ্য এবং সুখ-সকলও আকাঙ্ক্ষা করি না)।

শব্দার্থ ঃ শ্রেয়ঃ—শুভফল ; দৃষ্ট বা অদৃষ্ট পুরুষার্থ (ম·)। ন অনুপশ্যামি—বহু বিচার করিয়াও দেখিতেছি না (ম)। সুখানি—রাজ্যলাভ হেতু বিবিধ সুখভোগ।

শ্লোকার্থ ঃ যুদ্ধে স্বজনদিগকে বধ করিয়া আমি কোন মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা বিবিধ সুখভোগ—কিছুই চাহি না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে অর্জুন বলিতেছেন, 'হে কৃষ্ণ, স্বজনদিগকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া যে কেবল আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, মন ঘুরিতেছে তাহা নহে। আমি সম্যক্ বিচার করিয়াও এই যুদ্ধে স্বজনের হত্যা দ্বারা কোনও শ্রেয়োলাভ হইবে বলিয়া মনে করি না।'

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থই সাধারণতঃ মানুষের শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে অর্থ, কাম ও ধর্ম—এই তিনটি ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের হেতু। কিন্তু মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। এক্ষণে অর্জুনের কথার তাৎপর্য এই যে স্বজনবধ দ্বারা অর্থ ও কাম লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহা তাঁহার প্রার্থনীয় নহে। আর প্রার্থনীয় হইলেও সেই অর্থ ও কাম কখনও সুখকর হইবে না[১] তারপর স্বজনের বধে যে পাপ জন্মিবে তাহার ফলে পরকালে নরকভোগ নিশ্চিত।[২] এইরূপ পাপকার্য দ্বারা মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব। কাজেই স্বজনবধ দ্বারা আমাদের কোন প্রকার শ্রেয়োলাভই হইবে না। সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যু ঘটিলে হত ব্যক্তির স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু হন্তার স্বর্গলাভ হয় না। এর সমর্থন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যথা ঃ দ্বিবিধ পুরুষ সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া তথায় অবস্থান করেন—যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সংগ্রামে নিহত বীর।[৩]

'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'—এই বাক্যটিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় অমৃতময়ী বাণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। একদিক

১ দ্রঃ ১।৩২ ও ২।৪ শ্লোক। ২ দ্রষ্টব্য ১।৩৬ ও ১।৪১ শ্লোক।
৩ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥

দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা অমৃতময়ী বাণীই বটে। মানুষ সাধারণত ভোগসুখের নিমিত্তই চেষ্টা করিয়া থাকে। নানাবিধ সুখভোগই সাধারণ মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এই সকল সুখভোগের জন্য কত লোক কত যে গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করে তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য বিষয়ের জন্য ভ্রাতা ভ্রাতার সর্বনাশ করিতেছে—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই অবস্থায় অর্জুন যে তাঁহার চিরশত্রু স্বজনবর্গের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া বিজয়গৌরব ও রাজ্যসুখ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্র কত মহৎ, তিনি সাধারণ মানবের কত ঊর্ধ্বে অবস্থিত তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু অপরদিকে নিজের বিজয় ও রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া অর্জুন যে যুদ্ধত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মোহেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার নিজের বিজয়লাভ কি রাজ্যলাভই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয়সাধনের নিমিত্তই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম। কাজেই অর্জুনের যদি রাজ্যলাভ বা জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা নাও থাকে, যদি উহা তাঁহার পক্ষে সুখকর না হইয়া দুঃখকরও হয় তথাপি স্বধর্মের অনুষ্ঠান, সমগ্র সমাজের হিতসাধন এবং ভগবানের আদেশ পালনার্থ তাঁহার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। এই ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের সুখদুঃখ, স্নেহ-মমতার বিষয় বিবেচনা করিলে চলিবে না। স্বধর্মপালনস্বরূপ কর্তব্য সম্পাদন তাঁহাকে করিতেই হইবে। স্বজনের বধে নিজের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিবে, জীবনব্যাপী যে দুঃখ হইবে তাহা স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে এই মহৎকার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

এই শ্লোকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থ লাভকেই শ্রেয় বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থ, কাম ও ধর্ম মানুষের প্রার্থনীয় হইলেও উহা প্রকৃত শ্রেয় নহে। উহা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের হেতু বলিয়া মানবের প্রেয়। কঠোপনিষদে এই শ্রেয় ও প্রেয়ের বিভিন্নতা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়কে অবলম্বনই মানবের কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ঃ

> শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ সুখকর পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে জীবনকে আবদ্ধ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়। আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে ; জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। তিনি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।[1]

---

১ অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥
কঠ উঃ ১।২।১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥
কঠ উঃ ১।২।২

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২

তে ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫

অন্বয় ঃ গোবিন্দ (হে গোবিন্দ) নঃ রাজ্যেন কিম্ (আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (ভোগসকল এবং জীবনেই বা কি প্রয়োজন) যেষাম্ অর্থে (যাহাদের নিমিত্ত) নঃ রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতং (আমাদের রাজ্য প্রার্থিত) ভোগাঃ সুখানি চ (ভোগ ও সুখ সকলও প্রার্থিত) তে ইমে (সেই এইসকল) আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ (আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র ও পিতামহগণ) মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ (মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (প্রাণ এবং ধনরাশির ত্যাগে প্রস্তুত হইয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধে অবস্থিত আছেন) মধুসূদন (হে মধুসূদন) ঘ্নতঃ অপি (আমাকে বধ করিলেও) এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি (ইহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না) মহীকৃতে কিংনু (পৃথিবীর জন্য ত দূরের কথা) অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ (ত্রিলোকের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যও নয়) জনার্দন (হে শ্রীকৃষ্ণ) ধার্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বধ করিয়া) নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ (আমাদের কি আনন্দ হইবে)।

শব্দার্থ ঃ ভোগাঃ—ধন, জন, দারা প্রভৃতি ভোগসকল। সুখানি—চিত্তের আনন্দকর ব্যাপারসমূহ। শ্যালাঃ—পত্নীর ভ্রাতৃগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি (আ)। সম্বন্ধিনঃ—যাহাদের সহিত সম্বন্ধ আছে, কুটুম্বগণ। প্রাণান্ ত্যক্ত্বা ধনানি চ—প্রাণ ও ধনের ত্যাগে প্রস্তুত হইয়া। ঘ্নতঃ অপি—তাহারা আমাকে বধ করিলেও। মধুসূদন—মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম মধুসূদন। মহীকৃতে কিংনু—পৃথিবীর কথা কি ? পৃথিবী ত তুচ্ছ কথা।

শ্লোকার্থ ঃ হে গোবিন্দ, যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ধন, জন, দারা প্রভৃতি ভোগ এবং বিবিধ সুখের আকাঙ্ক্ষা করি সেই আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত আছেন। তাঁহাদের যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয় তবে আমাদের রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন, জীবনেই বা কি প্রয়োজন, ভোগেই বা কি প্রয়োজন অর্থাৎ রাজ্য, ভোগ, এমন কি জীবনেও কোন প্রয়োজন নাই। হে মধুসূদন, যদি এই আত্মীয়েরা আমাকে বধও করে, তথাপি এই পৃথিবীর রাজত্ব ত দূরের কথা ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও ইহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে অর্থাৎ কোন আনন্দই হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন যে তিনি বিজয়, রাজ্য ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই শ্লোকে বলিতেছেন—'যদিই বা আমরা স্বজনদিগকে নিহত করিয়া রাজ্য ও ভোগসকল লাভ করি তাহাতেই বা আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায় ? কারণ আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর প্রভৃতি যাঁহারা আমাদের একান্ত

আপনার জন, যাঁহাদের নিয়া আমাদের ঘর-সংসার, যাঁহাদের সুখে আমরা সুখী হই এবং যাঁহাদের দুঃখে দুঃখ বোধ করি আজ তাঁহারাই যুদ্ধার্থ এই স্থলে উপস্থিত। যদি ইঁহারাই নিহত হন তবে রাজত্ব-ভোগ করিব কাহাদের লইয়া ? এরূপ রাজত্ব-ভোগের প্রয়োজনই বা কি ? বন্ধুহীন স্বজনহীন রাজ্য আমাদের সুখের কারণ না হইয়া বরং দুঃখেরই হেতু হইবে।' কিন্তু অর্জুন যদি রাজ্য বা সুখ কামনা না করিয়া স্বজনবধের আশংকায় যুদ্ধ হইতে বিরত হন তাহা হইলেও শত্রুপক্ষ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না, তাহারা নিরস্ত্র অর্জুনকে অবশ্যই বধ করিবে। কাজেই যুদ্ধ ত্যাগ করিলে যে কেবল রাজ্য নষ্ট হইবে তাহা নহে, প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা আছে। এই আপত্তি নিরসনার্থ অর্জুন বলিতেছেন—'আমি যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেও যদি ইহারা আমাকে বধ করে তাহাও আমি স্বীকার করিব, তথাপি আমি স্বজনদিগকে বধ করিব না। পৃথিবী তো দূরের কথা, যদি স্বজনবধ করিয়া ত্রিভুবনের রাজত্ব লাভ হয় আমি তাহাও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিয়া কিছুতেই আমার আনন্দ হইবে না।'

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ আততায়িনঃ [অপি] এতান্ হত্বা (আততায়ী হইলেও ইহাদিগকে বধ করিলে) পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ (পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে) তস্মাৎ (সেই হেতু) সবান্ধবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ (সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) বয়ং হন্তুং ন অর্হাঃ (আমরা বধ করিবার যোগ্য নহি) হি (যেহেতু) মাধব (হে মাধব) স্বজনং হত্বা (স্বজনকে বধ করিয়া) কথং সুখিনঃ স্যাম (কি প্রকারে সুখী হইব)।

শব্দার্থ ঃ আততায়িনঃ—'অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥' অগ্নিদাতা, বিষপ্রদাতা, বধার্থ শস্ত্রধারী, ধন, ভূমি ও স্ত্রী হরণকারী—এই ছয়জন আততায়ী। জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, দ্যূত-ক্রীড়ার ছলে ধন ও রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি বহু আততায়ীর কার্য দুর্যোধন ও তাহার দুষ্ট পরামর্শদাতাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে ঃ এই কারণে তাহারা আততায়ী।

শ্লোকার্থ ঃ দুর্যোধনাদি শত্রুগণ যদিও আমাদের আততায়ী (কারণ ইহারা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে এবং প্রাণনাশে চেষ্টিত), তথাপি ইহারা আমাদের স্বজন। স্বজন আততায়ী হইলেও তাহাকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। এই কারণে বন্ধুবান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে বধ করা আমাদের কর্তব্য নহে। হে মাধব, স্বজনদিগকে বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ?

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে স্বজনদিগকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিলে তাহা কিছুতেই সুখকর হইবে না। এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে কেবল তাহা নহে উহাতে পাপ হইবে। যদি একথা বলা যায় যে দুর্যোধনাদি তো আততায়ী, ইহারা তো শাস্ত্রমতে বধ্য, কাজেই ইহাদের বধে পাপ নাই। এই আশংকা নিরসনার্থ অর্জুন বলিতেছেন, 'যদিও ইহারা আমাদের রাজ্য ও প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত হইয়া আমাদের আততায়ী হইয়াছে, তথাপি ইহারা আমাদের স্বজন। স্বজন আততায়ী

হইলেও তাহাকে বধ করা যায় না। কাজেই ইহাদিগকে বধ করিলে আমরা অবশ্যই পাপী হইব। অধিকন্তু ইহাদিগকে বধ করিয়া আমরা সুখীও হইতে পারিব না।'

আততায়ী যে স্থলবিশেষে বধ্য তৎসম্বন্ধে শ্রীধরস্বামী একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—আততায়ীকে আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়া বধ করিবে, আততায়ীর বধে হত্যাকারীর কোনও দোষ হয় না।[১] কিন্তু এটি অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য হইলেও ধর্মশাস্ত্রানুসারে বধ্য নহে। অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র বলবান। কাজেই স্বজন ও বন্ধুবর্গ আততায়ী হইলেও তাহাদের বধে পাপই জন্মিবে।

এই শ্লোকে অর্জুন কেবল নিজের দিক দিয়াই বিষয়টির বিবেচনা করিতেছেন : স্বজনবধ করিলে তাহাদের সুখ হইবে না, দুর্যোধনাদি আততায়ী হইলেও তাহাদের বধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং পাপজনক—এই সকল ভাবের উচ্ছ্বাসে পাপীর শাস্তিবিধান ধর্মের সংস্থাপন ও মানবসমাজের হিতসাধন প্রভৃতি ধর্মযুদ্ধের মহান উদ্দেশ্যগুলি তিনি একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু অপর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই সকল আততায়ী বধে যে অর্জুনের আপত্তি তাহাদ্বারা তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বই সূচিত হইতেছে। দুর্যোধন ও তাঁহার সহকারিগণ এপর্যন্ত পাণ্ডবদিগকে বিবিধ উপায়ে নির্যাতন করিয়াছেন। জতুগৃহে তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্যহরণ, দ্রৌপদীকে সভামধ্যে বস্ত্রহীনা করিবার নির্লজ্জ প্রয়াস প্রভৃতি কার্য ভীষণ আততায়ী ব্যতীত আর কেহই করিতে পারে না। এই সকল অত্যাচারের প্রতিশোধকল্পেই বর্তমান যুদ্ধের আয়োজন। আজ সেই যুদ্ধ উপস্থিত। যে আততায়িগণ তাহাদিগের এত লাঞ্ছনা দিয়াছে, প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে, সাধ্বী ভার্যাকে সভামধ্যে নির্লজ্জভাবে অপমানিত করিয়াছে আজ তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার, আজীবন লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ লোক এই ভীষণ অপমান ও নির্যাতনের প্রতিশোধ-কল্পে বহু পূর্বেই শত্রুনিধনের চেষ্টা করিত। কিন্তু অর্জুন আজ আততায়িগণকে যুদ্ধস্থলে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়াও কৃপাবশতঃ তাহাদিগকে বধ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। মর্মান্তিক আততায়ীর প্রতি এই কৃপা, শত্রুর প্রতি এই ক্ষমা এবং শত্রুর প্রাণরক্ষার্থ স্বীয় রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হওয়া—ইহা অর্জুনের ন্যায় অসাধারণ পুরুষেই সম্ভবপর।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৮

অন্বয় ঃ যদি অপি (যদিও) এতে (ইহারা) লোভোপহতচেতসঃ (লোভদ্বারা পাত-অভিভূতচিত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং দোষম্ (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ (এবং মিত্রদ্রোহের পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছে না) জনার্দন (হে কৃষ্ণ) অস্মাভিঃ (আমা-কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ (কুলক্ষয়জনিত দোষ-দর্শনকারী)

---

[১] আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥

দিগের দ্বারা) অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং (এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া) কথং ন জ্ঞেয়ম্ (কেন না জ্ঞেয় হইবে)।

শব্দার্থ ঃ লোভোপহতচেতসঃ—লোভ দ্বারা [রাজ্যলোভ হেতু] উপহত [বিমূঢ়, ভ্রষ্টবিবেক] চেতঃ [চিত্ত] যাহাদের লোভাভিভূতচিত্ত। কুলক্ষয়কৃতম্ দোষম্—বংশনাশজনিত দোষ, বংশস্থ ব্যক্তিগণ নিহত হইলে তাহার দরুন যে দোষ উৎপন্ন হয়। অস্মাৎ পাপাৎ—স্বজনবধরূপ এই পাপ হইতে। নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্—নিবৃত্ত হওয়ার বুদ্ধি আমাদের কেন না জন্মিবে, অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার বুদ্ধি আমাদের কর্তব্য (শ্রী)। প্রপশ্যদ্ভিঃ—সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া।

শ্লোকার্থ ঃ যদিও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ রাজ্যলোভে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া বংশবিনাশে যে দোষ উৎপন্ন হয় এবং বন্ধুগণের হত্যায় যে পাপ জন্মে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তথাপি হে কৃষ্ণ, আমরা যখন কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝিতে পারিতেছি তখন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জ্ঞান আমাদের কেন না জন্মিবে অর্থাৎ উক্ত দোষ বুঝিতে পারিয়া উক্ত পাপ হইতে আমরা নিবৃত্ত হইব না কেন ? এ প্রকার পাপের কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে অর্জুন কুলক্ষয়ের দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন হইতে পারে যে কুলক্ষয়ে যে কেবল পাণ্ডব-দিগের অনিষ্ট হইবে তাহা নহে, দুর্যোধনাদিরও তো মহা অনিষ্ট হইবে ; সেই কারণে তাহারা তো যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। তবে অর্জুন কেন যুদ্ধ ত্যাগ করিবেন। এই আপত্তির নিরসনার্থ অর্জুন বলিলেন, 'রাজ্যলোভে দুর্যোধনাদির বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে; কুলক্ষয়ে যে কত দোষ তাহারা তাহা দেখিতে পাইতেছে না, মিত্রদ্রোহে যে মহাপাপ তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। তাহারা বিমূঢ়চিত্ত বলিয়াই এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না, আমরা তো কুলক্ষয়ের দোষ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি ; তবে আমরা জানিয়া শুনিয়া এই মহা অনিষ্টকর কার্য হইতে কেন নিবৃত্ত হইব না ?'

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

অন্বয় ঃ কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনাঃ কুলধর্মাঃ (সনাতন কুলধর্মসকল) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) ধর্মে নষ্টে (ধর্ম নষ্ট হইলে) অধর্মঃ কৃৎস্নম্ কুলম্ উত অভিভবতি (অধর্ম সমুদায় কুলকেই অভিভূত করে)।

শব্দার্থ ঃ সনাতনাঃ—চিরন্তন, পরম্পরাপ্রাপ্ত, যাহা বংশের উদ্ভবাবধি প্রচলিত আছে। কুলধর্মাঃ—কুলপ্রচলিত ধর্মসকল, অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানসমূহ। বংশগত আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান ও সংস্কার, সমস্তই কুলধর্মের অন্তর্গত। কৃৎস্নম্ কুলম্—অবশিষ্ট সমস্ত বংশ।

শ্লোকার্থ ঃ বংশের ক্ষয় হইলে পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাগত বংশপ্রচলিত আচার ও ধর্মানুষ্ঠানসমূহ লুপ্ত হয় এবং সেই হেতু অবশিষ্ট সমস্ত বংশ অধর্ম দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে কুলক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে। এ শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েক শ্লোকে অর্জুন কুলক্ষয়ের দোষসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। বংশের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের মৃত্যু হইলে বালক এবং স্ত্রীলোকমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ; কাজেই যে সমস্ত আচার, নিয়ম ও ধর্মানুষ্ঠান বংশে প্রচলিত ছিল কর্তার অভাবে তাহা ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। কারণ কুলাগত ধর্মের মর্ম যাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন, যাঁহারা ঐ সকল ধর্মের অনুষ্ঠান করেন সেই সকল প্রবীণ লোকের অভাব হইলে ধর্ম পালন করিবে কে ? কুলধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম আসিয়া অবশিষ্ট বংশকে আশ্রয় করিবে। যে সকল নীতি, সংস্কার ও ধর্মানুষ্ঠান বংশে প্রচলিত থাকে তাহাই বংশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনেক পরিমাণে পাপকার্য হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কাজেই এই সকল আচার ও ধর্মানুষ্ঠান নষ্ট হইলে অথবা সেগুলি বজায় রাখিবার উপযুক্ত লোকের অভাব হইলে বংশের অবশিষ্ট লোকগণ যে উচ্ছৃঙ্খল ও পাপানুষ্ঠানে রত হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ ॥ ৪০

অন্বয় ঃ কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) অধর্মাভিভবাৎ (অধর্মদ্বারা অভিভূত হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি (কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়) বার্ষ্ণেয় (হে বার্ষ্ণেয়) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে) বর্ণসংকরঃ জায়তে (বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়)।

শব্দার্থ ঃ অধর্মাভিভবাৎ—অধর্ম দ্বারা অভিভব [পরাজয়] হেতু, সমস্ত বংশ পাপদ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়ার দরুন। প্রদুষ্যন্তি—দোষগ্রস্তা হয়, ব্যভি-চারিণী হইয়া উঠে। বর্ণসংকরঃ—উচ্চজাতীয়া স্ত্রী ও নিম্নজাতীয় পুরুষের মিলনে যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হয় তাহাকে বর্ণসংকর বলে। স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে জাত সন্তানও বর্ণসংকর। বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ। দুষ্টাসু—পুত্রের নিমিত্ত বর্ণান্তরে উপগত (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ, বংশ অধর্ম দ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয় এবং নারীগণ ভ্রষ্টা হইলে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়।

ব্যাখ্যা ঃ কুলধর্মের লোপবশতঃ বংশ অধর্ম কর্তৃক অভিভূত হইলে স্ত্রীলোকগণ ব্যভিচারিণী হইয়া উঠে। বংশপরম্পরাগত রীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও সংস্কারসমূহই অনেক পরিমাণে পারিবারিক নীতি ও পবিত্রতার রক্ষক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উপর এই সকল ধর্মানুষ্ঠান ও সংস্কারের প্রভাব খুব প্রবল। কাজেই কুলধর্ম নষ্ট হইয়া অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে নারীগণ যে ব্যভিচারিণী হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রাচীনকালে কোনও নারী পতিহীনা হইলে অথবা তাহার স্বামী সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হইলে অন্য পুরুষের নিয়োগ দ্বারা উহার সন্তানোৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই নিয়মেরও শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি বিধি নির্দিষ্ট আছে। যেমন, কেবল পুত্রসন্তান লাভার্থই নিয়োগ হইতে পারে এবং একটি মাত্র পুত্রলাভের জন্য নিয়োগ বিধিসম্মত। কিন্তু কোন নারী যদি কামলালসায় কোনও পুরুষকে সন্তানোৎপাদনার্থ নিয়োগ করে তবে সে সন্তান বর্ণসংকর হইবে, আবার যদি কোন উচ্চজাতীয়া নারী নিম্নজাতীয় পুরুষকে সন্তানোৎপাদনার্থ নিয়োগ করে তবে সেই সন্তানও বর্ণসংকর হইবে।

এক্ষণে অর্জুনের কথার ভাবার্থ এই যে কুলক্ষয় হেতু বংশ অধর্মদ্বারা আক্রান্ত হইলে পতিহীনা স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইয়া কামলালসায় নিম্নজাতীয় লোকদিগকে পুত্রোৎপাদনের জন্য নিয়োগ করিবে এবং এরূপ নিয়োগের ফলে যে সকল সন্তান জন্মিবে তাহারা বর্ণসংকর।

উচ্চজাতীয়া নারীর নিম্নজাতীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। এই প্রতিলোম বিবাহজনিত সন্তানও বর্ণসংকর। কিন্তু এ স্থলে বিবাহের প্রসঙ্গ দেখা যায় না। কারণ বংশের পুরুষগণের বিনাশ হইলে নারীগণ বিধবা হইবে। ঐসকল বিধবার পুনর্বিবাহের কোনও প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কোনও ভীষণ যুদ্ধ বা বিপ্লবের ফলে কোন দেশে বহু পুরুষের মৃত্যু হইলে সে দেশীয় নারীগণ যে ব্যভিচারিণী হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত ইউরোপের গত মহাযুদ্ধেও পাওয়া গিয়াছে।

সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ সংকরঃ (বর্ণসংকর) কুলঘ্নানাং কুলস্য চ (কুলনাশকদিগের ও সমস্ত কুলের) নরকায় এব (নরকগমনের হেতু) এষাং পিতরঃ (ইহাদের পিতৃপুরুষগণ) হি (নিশ্চয়) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধতর্পণাদি বিরহিত হইয়া) পতন্তি (পতিত হয়)।

শব্দার্থঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ—লুপ্ত [নষ্ট] পিণ্ড [শ্রাদ্ধাদি] এবং উদকক্রিয়া [তর্পণাদি] যাহাদের; বৈধপুত্রাদির অভাবে যাহাদের শ্রাদ্ধতর্পণাদির কার্য লুপ্ত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিগণ।

শ্লোকার্থঃ বর্ণসংকরের উৎপত্তি কুলনাশক ব্যক্তিগণের ও সমস্ত বংশের নরকগমনের হেতু। বৈধ পুত্রাদির অভাবে শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য লুপ্ত হওয়াতে কুলনাশকদিগের পিতৃপুরুষগণ নিশ্চয় নরকে পতিত হন।

ব্যাখ্যাঃ বংশের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি আর্যগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কোনও নীচ জাতির রক্ত বংশে প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নানাবিধ বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বর্ণসংকরের উৎপত্তিকে তাঁহারা অতি ঘৃণ্য মনে করিতেন। এজন্যই অর্জুন বলিতেছেন—যাহারা কুলঘ্ন, যাহারা বর্ণসংকরোৎপাদনের সহায়তা করিয়া কুলের পবিত্রতা নাশের কারণ হয় তাহারা নরকে যাইবে। কেবল তাহাই নয় পিতৃপুরুষগণও শ্রাদ্ধতর্পণাদির লোপ হেতু পতিত হইবে।

স্মৃতিশাস্ত্রমতে বৈধপুত্র বা স্ববংশীয়গণ কর্তৃক পিণ্ডদান (শ্রাদ্ধাদি) ও জলদান (তর্পণাদি) বিধিমত অনুষ্ঠিত না হইলে প্রেতাত্মার মুক্তি হয় না। কাজেই বংশে বর্ণসংকরের উৎপত্তি হইলে তাহারা জলপিণ্ড দানে অনধিকারী বলিয়া পিতৃপুরুষের পতন হয়।

নরক নামে যে একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং সেই স্থানে পাপীদিগকে প্রেরণ করিয়া বিবিধ প্রকারের কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়—একথা আজকাল অনেকে হয় তো বিশ্বাস করিবেন না। নরক একটা দুর্গতির অবস্থা, একটা দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার ভাব বলিয়াই মনে হয়। পাপীরা মৃত্যুর পর এই দুর্গতি বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

যুদ্ধ করিয়া স্বজনদিগকে যাহারা বধ করে তাহারা কুলঘ্ন; কুলঘ্নগণের

নরকবাস হয়। অর্জুন যদি এই যুদ্ধে স্বজনগণের বধ করেন তবে তিনিও কুলঘ্ন বলিয়া নরকে পতিত হইবেন—এই আশংকার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ পরে বলিয়াছেন যে স্বধর্মপালনার্থ ধর্মযুদ্ধে স্বজনবধ করিলেও তাহাতে পাপ হয় না, স্বধর্মোচিত যুদ্ধ না করিলেই পাপ হয়। কাজেই অর্জুনের নরকভোগের আশংকা অমূলক।

তারপর জলপিণ্ড-লোপবশতঃ পিতৃপুরুষের নরকে পতন হইবে বলিয়া অর্জুন যে আশংকা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে তাহার কোনও উত্তর দেন নাই। তবে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে মৃত্যুর পর জীবাত্মা ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মলাভ করে। প্রেতাত্মা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃ পৃথকভাবে কিছু বলেন নাই।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ কুলঘ্নানাম্ (কুলনাশকদিগের) এতৈঃ বর্ণসংকরকারকৈঃ দোষৈঃ (এই সকল বর্ণসংকরকারক দোষসমূহদ্বারা) শাশ্বতাঃ (চিরকালাচরিত) জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাঃ চ (জাতিধর্ম ও কুলধর্ম সকল) উৎসাদ্যন্তে (উৎপন্ন হয়)।

শব্দার্থঃ বর্ণসংকরকারকৈঃ দোষৈঃ—বর্ণসংকরের উৎপাদনজনিত দোষসমূহ দ্বারা। জাতিধর্মাঃ—বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির ধর্মানুগত কর্মসকল। শাশ্বতাঃ—চিরকাল প্রচলিত, পরম্পরাগত।

শ্লোকার্থঃ কুলক্ষয়কারীদের কৃতকার্যের ফলে বংশে বর্ণসংকরের উৎপত্তি হইলে তজ্জনিত পূর্বোক্ত যে সকল দোষের উদ্ভব হয় তাহাদ্বারা চিরপ্রচলিত জাতিধর্মসকল এবং পরম্পরাগত বংশপ্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানসমূহ নষ্ট হয়।

ব্যাখ্যাঃ যাহারা বংশের ধ্বংস সাধন করে তাহারাই বর্ণসংকরোৎপাদনের হেতু। বর্ণসংকর উৎপন্ন হইলে যে সকল দোষ ঘটিয়া থাকে তাহাতে জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নষ্ট হয়। কুলধর্ম কি প্রকারে নষ্ট হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি বা বর্ণের ধর্ম নির্দিষ্ট আছে; বংশে বর্ণসংকর উৎপন্ন হইলে তাহা নষ্ট হয়। যেমন ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কোন নীচজাতীয় ব্যক্তিদ্বারা সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহার পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন সম্ভবপর হয় না। কারণ এরূপ সন্তানে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক তেজ বীর্য না থাকিবারই কথা। অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রাচীন টীকাকারগণ 'জাতিধর্ম' শব্দের অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্মই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু জাতি বলিতে বর্ণ না বুঝাইয়া কুলসমষ্টি এমন কি সমগ্র আর্য জাতিও বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে 'জাতিধর্ম' শব্দের অর্থ হইবে—কুলসমষ্টি বা সমগ্র আর্যজাতির মধ্যে প্রচলিত পুরুষপরম্পরাগত সনাতন আদর্শ, কর্মশৃঙ্খলা ও সংস্কারসমূহ। এক্ষণে অর্জুনের কথার ভাবার্থ এই যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে অনার্য বা নীচজাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই সন্তান কুলসমষ্টির যে ধর্ম, এমন কি সমগ্র আর্যজাতির যে ধর্ম তাহাও পালন করিতে পারিবে না।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ জনার্দন (হে জনার্দন) উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাম্ (বিনষ্ট কুলধর্ম

লোকদিগের) নিয়তং নরকে বাসঃ (সর্বদা নরকে বাস হয়) ইতি অনুশুশ্রুম (ইহা আমরা শুনিয়াছি)।

শ্লোকার্থ ঃ হে শ্রীকৃষ্ণ, শাস্ত্র ও আচার্য মুখে আমরা শুনিয়াছি যে যাহাদের জাতি-ধর্ম ও কুলধর্ম বিনষ্ট হয় তাহারা চিরকাল নরকে বাস করে।

ব্যাখ্যা ঃ যে বংশের কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম বিনষ্ট হয় সে বংশের সমস্ত লোক পাপাচারী হইয়া উঠে, স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হয়। কাজেই উহাদের মৃত্যুর পর নরকে গমন আশ্চর্যের বিষয় নহে। একথা অর্জুনের নিজের নহে, শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, আচার্যগণও একথা বলিয়া থাকেন। অধরস্বামী একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন— যে সকল পাপনিরত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করে না অথবা পশ্চাত্তাপ ভোগ করে না তাহারা দারুণ নরকে গমন করে।[১]

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

অন্বয় ঃ অহোবত (হায় হায়) মহৎ পাপং কর্তুম্ (মহাপাপ করিতে) বয়ং ব্যবসিতাঃ (আমরা কৃতনিশ্চয় বা প্রবৃত্ত) যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্য-সুখের লোভহেতু) স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ (স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি)।

শ্লোকার্থ ঃ হা কষ্ট, রাজ্যলাভজনিত সুখভোগের প্রতি লোভবশতঃ স্বজনবধরূপ মহাপাপকর কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুন বলিতেছেন—রাজ্যলোভে স্বজনবধ করিলে আমাদের দারুণ পাপ হইবে। প্রথমতঃ আচার্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্রাদি স্বজনগণের বধই ত মহা-পাপ। তদুপরি কুলক্ষয়হেতু কুলধর্মের লোপ, তাহার জন্য বংশে অধর্মের আক্রমণ, বর্ণসংকরের উৎপত্তি, জলপিণ্ডলোপহেতু পিতৃপুরুষগণের পতন। হায়! আমি রাজ্যলোভে এই সকল অনিষ্টকর ও পাপজনক কার্যে লিপ্ত হইয়াছি। আমার মত পাপকারী কে আছে?

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

অন্বয় ঃ যদি (যদি) শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রাঃ (শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) অপ্রতীকারম্ (প্রতিকারে পরাঙ্মুখ) অশস্ত্রম্ (শস্ত্রহীন) মাম্ (আমাকে) রণে হন্যুঃ (যুদ্ধে বধ করে) তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ (তাহাই আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে)।

শ্লোকার্থ ঃ যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ প্রতিকারবিমুখ ও নিরস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাই আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুন তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে বলিতেছেন—শত্রুগণ কর্তৃক নিহত হইলে আমাদের রাজ্যলাভ হইবে না সত্য, কিন্তু আমি পাপপঙ্কে লিপ্ত হইব না, আমার আত্মার অকল্যাণ হইবে না। পক্ষান্তরে স্বজনদিগকে বধ করিলে আমার ঘোর পাপ হইবে এবং কুলঘ্ন বলিয়া আমাকে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হইবে।

১ প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥

তারপর শত্রুগণ আমাকে বধ করিলে কেবল আমারই বিনাশ হইবে, কিন্তু বংশের ধ্বংস হইবে না এবং তাহার জন্য পূর্বোক্ত বিবিধ অনিষ্টেরও উৎপত্তি হইবে না।

এই উভয়দিক বিবেচনা করিয়া অর্জুন সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ না করাই শ্রেয়। যুদ্ধে অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বধ করা ধর্মবিরুদ্ধ। কিন্তু দুর্যোধন অধর্মাচারী বলিয়াই মনে করিতেছেন যে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিলেও বিপক্ষগণ তাঁহাকে বধ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। কিন্তু তিনি যে মনে করিতেছেন— বিপক্ষের অন্যায় আক্রমণের প্রতিরোধ না করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়—এটি তাঁহার ভ্রম। কোন স্থলে অত্যাচার বা অবিচার হইলে তাহা নিজের উপরই হউক কি অপরের উপরই হউক, উহার প্রতিকার করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য—ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। প্রতিকার না করিয়া অত্যাচার সহ্য করা দুর্বলের ধর্ম, ভীরুতার পরিচায়ক। কাজেই অর্জুনের পক্ষে তাহা স্বধর্মোচিত এবং শ্রেয়স্কর নহে। একথাই পরে শ্রীকৃষ্ণ বিশেষরূপে অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

অন্বয় ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জুনঃ (শোকাকুলহৃদয় অর্জুন) সশরং চাপং বিসৃজ্য (শরসমেত ধনু পরিত্যাগ করিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) রথোপস্থে উপাবিশৎ (রথের উপর উপবেশন করিলেন)।

শ্লোকার্থ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—এই কথা বলিয়া অর্জুন নিতান্ত শোকাকুল হইয়া যুদ্ধে বাণযোজিত ধনু পরিত্যাগপূর্বক রথের উপর উপবেশন করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুন যে শোকের উচ্ছ্বাসে নিজের কর্তব্য ভুলিয়া যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করিলেন ইহা যে তাঁহার মোহের, অজ্ঞানের ফল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মোহের মধ্যেও তাঁহার স্বাভাবিক সৎসাহস ও মনের দৃঢ়তা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। স্বজনগণকে বধ করা অধর্ম এবং পাপ মনে করিয়া তিনি কিছুতেই উহা করিতে সম্মত হইলেন না। যদিও তাঁহার এই বোধ ভ্রমাত্মক তথাপি যাহা নিজের পক্ষে শ্রেয় ও বংশের হিতকর বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহার জন্য তিনি সকল প্রকার গ্লানি সহ্য করিতে, সকল প্রকার স্বার্থ বর্জন করিতে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সমবেত সৈন্যগণের মধ্যস্থলে, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত গুরুজনের মত ও স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে 'আমি যুদ্ধ করিব না' বলিয়া বসিয়া পড়া কতদূর সৎসাহসের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ সাংখ্যযোগ ॥

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

অন্বয় ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তথা (উক্ত প্রকারে) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপাদ্বারা আবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র) বিষীদন্তম্ (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাহাকে) ইদং বাক্যম্ উবাচ (এই কথা বলিলেন)।

শব্দার্থ ঃ কৃপয়া আবিষ্টম্—করুণা দ্বারা অভিভূত, স্বজনগণের মৃত্যু হইবে এই চিন্তায় তাহাদের প্রতি স্নেহার্দ্রহৃদয়। বিষীদন্তম্—স্বজনবিয়োগের আশংকায় বিষণ্ণচিত্ত। অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্—অশ্রুদ্বারা পূর্ণ এবং আকুল [দর্শনাক্ষম] ঈক্ষণ [চক্ষু] যাহার, অশ্রুপূর্ণনেত্র, সজলনয়ন।

শ্লোকার্থ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—পূর্বোক্ত প্রকারে করুণা দ্বারা অভিভূত সজলনয়ন বিষণ্ণচিত্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'কৃপা মমেতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ'—'ইহারা আমার' এ প্রকার মোহ হইতে যে স্নেহ বা মমতা জন্মে, স্বজনের দুঃখ দেখিয়া বা চিন্তা করিয়া অথবা স্বজনের বিয়োগে বা বিয়োগাশঙ্কায় নিজের প্রাণে যে দুঃখের অনুভূতি হয় তাহাই মমতা বা কৃপা। হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহা একটি মোহাত্মক চিত্তবৃত্তি। আত্মীয়-স্বজনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই স্নেহ আবদ্ধ। যাহাদিগকে 'আমার' বলিয়া ভাবা যায় তাহাদের দুঃখেই সহানুভূতি হয়, আর যাহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করা যায় না তাহাদের দুঃখে কোন দুঃখ হয় না। কাজেই কৃপার মূলে আছে অহংভাব ও মমত্ববুদ্ধি—ইহা এক প্রকারের স্বার্থপরতা। এই বৃত্তি মানুষের চিত্তকে অভিভূত করিলে তাহার উদার দৃষ্টি ব্যাহত হয়, আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখই তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হয়। বিরাট মানবসমাজের হিতের সঙ্গে স্বজন-হিতের বিরোধ হইলে সে স্বজনের-হিতকেই বড় মনে করে। এমন কি মমতার বশে অনেক স্থলে মানুষের স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয়, তাহার বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, ধর্ম ও ন্যায়ের পথ হইতে সে ভ্রষ্ট হয়, কর্তব্যের আহবানেও সে সাড়া দিতে পারে না।

অর্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। স্বজনের প্রতি মমতাবশতঃ তিনি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল। তিনি যে ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদারক্ষার্থ, দুর্বৃত্তের দমনের নিমিত্ত, সমগ্র মানবসমাজের হিতসাধনের জন্য কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। এমন কি তাঁহার ক্ষত্রিয়স্বভাব এবং স্বাভাবিক তেজ ও বীর্য এই কৃপাদ্বারা অভিভূত

হইয়াছিল। তিনি প্রাকৃত জনের ন্যায় বিষণ্ণচিত্তে রথের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই বিষাদগ্রস্ত কর্তব্যবিমুখ অর্জুনকে তাঁহার ধর্মের পথ, কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিবার নিমিত্তই গীতাশাস্ত্রের উপদেশ।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অর্জুন (হে অর্জুন) বিষমে (সংকটকালে) কুতঃ (কোথা হইতে, কি কারণে) অনার্যজুষ্টম্ (অনার্যসেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গের অযোগ্য) অকীর্তিকরম্ (অযশস্কর) ইদং কশ্মলম্ (এই মোহ) ত্বা সমুপস্থিতম্ (তোমাতে উপস্থিত হইল)।

শব্দার্থ ঃ শ্রীভগবান্—'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥' সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ ; এই ভগ যাঁহার আছে তাঁহার নাম ভগবান্। ইদং কশ্মলম্,—এই মোহ (শ্রী) ; চিত্তের এই মালিন্য (ম)। বিষমে—সঙ্কট-কালে (শ্রী), সভয় স্থানে (ম)। অনার্যজুষ্টম্—অনার্যদের সেবিত, শিষ্ট বিগর্হিত। অস্বর্গ্যম,—(১) স্বর্গের অযোগ্য, সুতরাং প্রাকৃত-জনোচিত, হীন। (২) স্বর্গলাভের প্রতিবন্ধক, সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ। অকীর্তিকরম্—কীর্তিনাশক, অযশস্কর।

শ্লোকার্থ ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, এই ঘোর সঙ্কটকালে কোথা হইতে তোমার চিত্তে যুদ্ধবিরতিরূপ এই মোহ উপস্থিত হইল যাহা অজ্ঞানী অনার্যদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্বর্গের অযোগ্য এবং যাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত অযশস্কর।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের কথা শুনিয়া এবং এই সংকটকালে তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রথের উপর বিষণ্ণচিত্তে উপবেশন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের কারণও ছিল। অর্জুন জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বীর, ন্যায় যুদ্ধ করাই তাঁহার ধর্ম ; তিনি এ পর্যন্ত বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিপুল কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। দুর্বৃত্ত দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, উভয় পক্ষের সৈন্য সমবেত হইয়াছে, শংখধ্বনি হইয়া গিয়াছে, অস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইবে। এমন সময়ে কি না অর্জুন বলিতেছেন 'আমি যুদ্ধ করিব না'। অথচ অর্জুনই হইতেছেন পাণ্ডবপক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যুধিষ্ঠিরের প্রধান ভরসাস্থল। তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করিলে পাণ্ডবদিগের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আশা বিলুপ্ত হইবে ; শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইয়া যাইবে ; অধর্মের জয় এবং ধর্মের পরাজয় হইবে।

কাজেই অর্জুনের আকস্মিক মত পরিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধস্থলে স্বজনগণকে দেখিয়া করুণার বশে অর্জুনের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সেই হেতু তাঁহার স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়াছে, তাঁহার বিচারশক্তি লুপ্ত হইয়াছে। তিনি যে সংকল্প করিয়া যুদ্ধে

আসিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আর্যসন্তান, দেবতার অংশে তাঁহার জন্ম, বিপুল কীর্তির তিনি অধিকারী—এ সকল কোন কথাই তাঁহার মনে পড়িতেছে না। কাজেই এ সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অর্জুনের মোহ দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ একটু ভর্ৎসনার ভাবে বলিলেন—'হে অর্জুন, এই সংকটকালে তোমার চিত্তে এই দারুণ মোহ কোথা হইতে আসিল! তুমি যে আর্যসন্তান তাহা স্মরণ কর। এ প্রকারের মোহ কেবল অজ্ঞানী অনার্যগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর দেবতার অংশে তোমার জন্ম, দিব্যজীবন লাভ তোমার উদ্দেশ্য, তোমার পথ স্বর্গের পথ—এ প্রকার মোহ তো প্রাকৃত হীনজনেই সম্ভবপর। তাহাছাড়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলে ইহা যে তোমার বিপুল কীর্তি নষ্ট করিবে, তোমার পক্ষে নিতান্ত অযশের কারণ হইবে তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখ।'

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন) ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ (ক্লীবভাব প্রাপ্ত হইও না) এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না) পরন্তপ (হে শত্রুদমন) ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ (তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠ)।

শব্দার্থ ঃ ক্লৈব্যম্—ক্লীবের ভাব, কাতরতা (শ্রী); অধৈর্য (ম); বীর্যহীনতা (নী)। ক্ষুদ্রম্—তুচ্ছ (শ্রী); হীনজনোচিত, ক্ষুদ্রত্বের কারণ (ম); যাহা মানুষকে ক্ষুদ্র বা ছোট করিয়া দেয়। হৃদয়দৌর্বল্যম্—স্বজনের স্নেহে বিগলিত হইয়া যুদ্ধত্যাগরূপ দুর্বলতা; মনের ভ্রমণ, অশ্রুমোচনাদিরূপ অধৈর্য (ম)। পার্থ—পৃথার পুত্র; পৃথার ন্যায় বীর রমণীর পুত্রে ক্লীবত্বাদি অযোগ্য, এজন্য 'পার্থ' সম্বোধন করা হইয়াছে (ম)। পরন্তপ—শত্রুর দমন যাহার কার্য তাহার যুদ্ধ ত্যাগ করা উচিত নহে; 'পরন্তপ' শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, তুমি বীর্যহীন ক্লীবের ন্যায় কাতরভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর।

ব্যাখ্যা ঃ ক্লীবগণের বীর্যহীনতা ও কাতরতা প্রসিদ্ধ। ইহা অর্জুনের মত বীর পুরুষে একান্ত অশোভন—এই কথা বলিয়া, ক্লীবের সহিত তাঁহাকে তুলনা করিয়া ভগবান অর্জুনের প্রসুপ্ত বীর্যকে জাগাইয়া তুলিতেছেন। পূর্বশ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে অর্জুনের মোহ অনার্যোচিত, অস্বর্গ্য এবং অযশস্কর। এই শ্লোকে বলিতেছেন—কেবল তাহাই নহে, ইহা ক্লীবজনোচিত হৃদয়দৌর্বল্য হইতে জাত, অর্জুনের মত বীরপুরুষের একান্ত অনুপযুক্ত; অতএব এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

অর্জুনের হৃদয়দৌর্বল্য কোথায় তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতাবশতঃ তাহাদের আসন্ন মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিলেন। স্বজনের স্নেহে স্বধর্ম হইতে চ্যুত হওয়া স্বীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করা দুর্বল চিত্তেরই পরিচায়ক। সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ কখনও ভাবের উচ্ছ্বাসে বিচলিত হইয়া ধর্মের পথ, কর্তব্যের পথ হইতে চ্যুত হন না। তারপর অর্জুনের যে মানসিক ও দৈহিক বিকার উপস্থিত হইয়াছিল—তাঁহার শরীর যে কাঁপিতেছিল, মন ঘুরিতেছিল,

তিনি যে বিষণ্ণ হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন—এই সকল মানসিক ও দৈহিক বিকারও তাঁহার চিত্তের দুর্বলতারই ফল। সাধারণ লোকের পক্ষে আত্মীয়-স্বজনের মমতাবশতঃ এপ্রকার কাতরতা নিন্দনীয় না হইতে পারে, কিন্তু অর্জুনের পক্ষে ইহা মোটেই উপযুক্ত নহে; কারণ তিনি জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বীর, বীররমণী পৃথার গর্ভে দেবতার অংশে তাঁহার জন্ম, অত্যাচারী শত্রুকে দমন করাই তাঁহার কার্য। বিশেষতঃ শত্রু কর্তৃক অপহৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কাজেই এপ্রকার কাতরতা এবং অধৈর্য প্রদর্শন তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের একান্ত অযোগ্য।

পূর্বশ্লোকে অর্জুনের মোহের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহার হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা বলা হইল। চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইলেই উহা দুর্বল হইয়া পড়ে—অজ্ঞানীর চিত্ত দুর্বল—অজ্ঞানীর চিত্ত নানা কামনা-বাসনা দ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে, ভাবের উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানী নিজের বুদ্ধিকে স্থির ও সমাহিত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞানীর চিত্তই সবল—তাহা আত্মজ্ঞানে সমাহিত, স্থিরলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত, ভাবের উচ্ছ্বাসে উহার কোন বিচলন হয় না। কাজেই চিত্তকে শুদ্ধ ও সবল করিবার নিমিত্ত আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। এই তথ্যটিই গীতায় পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অন্বয় ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) অরিসূদন (শত্রুনাশন) মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজার যোগ্য) ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি (ভীষ্ম ও দ্রোণকে লক্ষ্য করিয়া) ইষুভিঃ (বাণদ্বারা) কথং যোৎস্যামি (কি প্রকারে যুদ্ধ করিব)।

শব্দার্থ ঃ অরিসূদন—অরি অর্থাৎ শত্রুকে যিনি নিধন করেন, শত্রুহন্তা। পূজার্হৌ—পূজার যোগ্য, কুসুমাদি দ্বারা অর্চনার যোগ্য (ম)। প্রতিযোৎস্যামি—প্রতিযুদ্ধ করিব, অথবা 'ভীষ্মং দ্রোণং প্রতি যোৎসামি'—ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি [সহিত] যুদ্ধ করিব।

শ্লোকার্থ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে শত্রুহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, আমি কি প্রকারে এই ভীষণ যুদ্ধে পূজনীয় পিতামহ ভীষ্মদেব এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের উপর তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিব; অথবা তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাঁহাদের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব অর্থাৎ তাঁহারা বাণক্ষেপ করিলেও আমি কি প্রকারে গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব?

ব্যাখ্যা ঃ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও অর্জুনের শোকের ভাব দূর হইল না। তিনি নিজের দুর্বলতা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাই ভাবের আবেগে হৃদয়বৃত্তির কান্না আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি ভীরুতা বা বীর্যহীনতা বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু আমি কেমন করিয়া পিতামহ ভীষ্মদেব ও অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের উপর অস্ত্রক্ষেপ করিব? ভীষ্মদেব আমাদিগকে শিশুকালে পালন করিয়াছেন, দ্রোণাচার্য আমাদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন। ইঁহাদিগকে কুসুমাদি দ্বারা অর্চনা করাই

আমার কর্তব্য। আমি কোন্ হৃদয়ে ইঁহাদিগকে তীক্ষ্ন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব? বাক্য দ্বারাও যাঁহাদের যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নহে, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করিব? ইহা কি আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও অধর্মের কার্য হইবে না?

এমনি করিয়া মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানী মানুষ স্নেহ-মমতাত্মক হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনায় অনেক স্থলে কর্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য অর্জুনের অবস্থা একটি অসাধারণ অবস্থা। গুরুকে, পিতামহকে স্বহস্তে বধ করিতে হইবে—এপ্রকারের ভীষণ অবস্থা মানুষের জীবনে প্রায়শঃ ঘটে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমক্ষেও এমন অনেক সমস্যা উপস্থিত হয় যখন তাহার স্নেহ মমতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি একদিকে এবং কর্তব্যের আহ্বান তাহাকে অন্যদিকে টানিতে থাকে, এমন অনেক কর্তব্য উপস্থিত হয় যাহা সম্পাদন করিতে গেলে নিতান্ত প্রিয়তম স্বজনের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, কি তাহার বিষম ক্ষতি হয়। তখন সে অর্জুনের মতই বলিয়া থাকে, 'হায়, আমি কেমন করিয়া আমার প্রিয়জনের প্রাণে আঘাত দিব, কেমন করিয়া তাহার দুঃখ উৎপাদন করিব?' এপ্রকার স্নেহের আকর্ষণে সে কর্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনেক স্থলে প্রিয়জনের সন্তোষ বিধানেই নিরত হয়। অর্জুনের সমক্ষে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল—মানুষের জীবনে যে সমস্যা প্রায়শঃ উপস্থিত হইয়া থাকে—গীতাতে তাহার কি ভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহা পরে বলা হইবে।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ মহানুভাবান্ গুরূন্ (মহানুভব গুরুজনদিগকে) অহত্বা হি (বধ না করিয়া) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ (ভিক্ষান্ন ভোজনও শ্রেয়) গুরূন্ হত্বা তু (কিন্তু গুরুজনদিগকে বধ করিয়া) ইহ এব (এই সংসারেই) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্ত) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থকামাত্মক ভোগসকল) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে)।

শব্দার্থঃ মহানুভাবান্—মহা [শ্রেষ্ঠ] অনুভব [মহিমা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্যাদি হেতুক প্রভাব] যাঁহাদের, তপোবীর্যসম্পন্ন। গুরূন্—ভীষ্মদ্রোণাদি পূজনীয় গুরুজনদিগকে। উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, পরিত্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ও পিতৃব্য ঃ ইঁহারা গুরুজন। রুধিরপ্রদিগ্ধান্—রুধির [রক্ত] দ্বারা প্রদিগ্ধ [প্রলিপ্ত], রক্তমাখা। অর্থকামান্—অর্থ [ধন] ও কাম [কাম্যদ্রব্য], অর্থকামপ্রদ ভোগ্যবস্তুসকল। 'অর্থকামান্' শব্দ কেহ কেহ 'গুরূন্' এই পদের বিশেষণ করিয়া থাকেন; তাহা হইলে অর্থ হইবে 'অর্থকামলোভী গুরুজনদিগকে'। ভীষ্মদ্রোণাদি অর্থলোভে দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অর্থকামলোভী বলা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে 'মহানুভাবান্' শব্দের সহিত বিরোধ ঘটে। ভৈক্ষ্যম্—ভিক্ষালব্ধ অন্ন। অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন তবে রাজ্যনাশ হইবে, কাজেই তখন ভিক্ষা ব্যতীত জীবনধারণের উপায় থাকিবে না। ভিক্ষা ব্রাহ্মণের বৃত্তি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যশের নয়, কিন্তু আপৎকালে অপরের বৃত্তিগ্রহণ দোষাবহ নহে। কেহ কেহ 'ভৈক্ষ্যম্' শব্দে 'সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক ভিক্ষান্নগ্রহণ' অর্থ করেন। শ্রেয়ঃ—কল্যাণকর; অর্থ ও কামপ্রদ না হইলেও, ধর্ম ও মোক্ষের অবিরোধী।

শ্লোকার্থঃ তপোবীর্যসম্পন্ন মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও আমার পক্ষে কল্যাণকর; পক্ষান্তরে ইঁহাদিগকে বধ করিলে ইহলোকেই তাঁহাদের রক্তমাখা অর্থকামাত্মক ভোগ্যদ্রব্যসমূহ ভোগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনদিগকে বধ করিয়া রাজ্যসুখভোগ এবং তাঁহাদিগকে বধ না করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ—এই উভয়ের তুলনা করিয়া অর্জুন বলিতেছেন যে শেষোক্ত পথই শ্রেয়। তপোবীর্যসম্পন্ন মহিমান্বিত ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে বধ করিলে ধর্ম ও মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ বিনষ্ট হইবে, অধিকন্তু অর্থ কাম যাহা লাভ করিব তাহাও আমাদের সুখকর না হইয়া দারুণ দুঃখের হেতু হইবে। কারণ এই সকল ভোগের কালে মনে হইবে যেন উহারা গুরুজনের রুধিরলিপ্ত হইয়াই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই উহাদ্বারা ইহকালেও সুখ হইবে না, পরকালে ত পাপের শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে যদি গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া আমরা রাজ্যচ্যুত হই এবং তাহার দরুন আমাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিতে হয় তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ যদিও উহা অর্থকামপ্রদ নহে, যদিও ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অযশস্কর, তথাপি তাহা ধর্ম ও মোক্ষ লাভের প্রতিকূল হইবে না।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ যৎ বা জয়েম (যদি বা আমরা জয়লাভ করি) যদি বা (অথবা যদি) নঃ [এতে] জয়েয়ুঃ (আমাদিগকে ইহারা পরাজিত করে) কতরৎ নঃ গরীয়ঃ (এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে শ্রেয়) এতৎ চ ন বিদ্মঃ (ইহাও জানি না) যান্ হত্বা (যাহাদিগকে বধ করিয়া) ন এব জিজীবিষামঃ (বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না) তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্র-সুত ও তৎপক্ষীয় স্বজনগণ) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সম্মুখেই অবস্থিত রহিয়াছে)।

শ্লোকার্থঃ এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভ করি অথবা বিপক্ষগণ জয়লাভ করে—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে গুরুতর (শ্রেয়) হইবে তাহাও নিশ্চিতরূপে জানি না। কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না—অর্থকাম ভোগ করা তো দূরের কথা—সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় আমাদের স্বজনগণ আমাদের সম্মুখেই যুদ্ধার্থ অবস্থিত আছে।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুন বলিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং তৎপক্ষীয় ভীষ্মদ্রোণাদি স্বজনগণ আমাদের এত প্রিয়, আমাদের এরূপ স্নেহ বা ভক্তির পাত্র, আমাদের সুখ-দুঃখের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তাঁহাদের অভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না, রাজ্যাদি সুখভোগ ত দূরের কথা। এই অবস্থায় তাঁহাদের দ্বারা আমাদের পরাজয়, কি আমাদের দ্বারা তাঁহাদের পরাজয়—উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ, যদি আমাদের পরাজয় হয় তবে আমাদের মৃত্যু ঘটিবে অথবা যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আমাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিতে হইবে—ইহা নিতান্ত দুঃখকর সন্দেহ নাই। আর যদি স্বজনদিগকে বধ করিয়া আমরা জয়লাভ করি তবে তাহাও কম দুঃখের হইবে না। ইষ্টনাশ হেতু আমাদের জয় পরাজয়েরই তুল্য হইবে, বাঁচিয়া থাকাও মরণের তুল্য হইবে। এই অবস্থায় যুদ্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

এই শ্লোকেও অর্জুন-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্যোধনাদি স্বজন হইলেও তাহারা পাণ্ডবগণের বিষম শত্রু। শত্রুর সুখে সুখ, শত্রুর দুঃখে দুঃখ বোধ করা, শত্রুর মৃত্যুকে নিজের মৃত্যুর মত বিবেচনা করা, শত্রুর পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলিয়া মনে করা—কত বড় মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে।

> কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (দৈন্যদোষদ্বারা অভিভূতস্বভাব) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্মাধর্মনির্ণয়ে বিমূঢ়চিত্ত) ত্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি) যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ (যাহা আমার শ্রেয়ঃ হয়) তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি (তাহা নিশ্চয় করিয়া বল) অহং তে শিষ্যঃ (আমি তোমার শিষ্য) প্রপন্নং মাং শাধি (শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও)।

শব্দার্থঃ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ—কার্পণ্য [দৈন্য] রূপ দোষদ্বারা উপহত [অভিভূত, দূষিত] স্বভাব [ক্ষত্রিয়স্বভাব চিত্ত] যাহার ; 'ইহাদিগকে বধ করিয়া কি প্রকারে জীবিত থাকিব ?' এইরূপ হীনতা দ্বারা যাহার ক্ষত্রিয়-স্বভাব অভিভূত হইয়াছে। 'কার্পণ্য' শব্দের দুইটি অর্থ—একটি লৌকিক, অপরটি বৈদিক। "যোঽল্পাং স্বল্পামপি ক্ষতিং ন সহতে স কৃপণঃ।' যে ব্যক্তি অল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না সে কৃপণ। আত্মীয়দের বিয়োগে চিত্তে যে দুঃখ হইবে তাহাই সহ্য করিতে পারিতেছেন না ; ইহাই অর্জুনের কৃপণতা। 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।' [বৃঃ উঃ ৩।৮।১০] হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ ; ইহাই বৈদিক অর্থ। এইস্থলে 'কৃপণ' শব্দ লৌকিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ধর্মসংমূঢ়চেতা ঃ—ধর্মে [ধর্মাধর্ম-নির্ণয়ে কার্যাকার্য-নিশ্চয়ে] সংমূঢ় [সন্দিগ্ধ, অজ্ঞ] চেতঃ [চিত্ত] যাহার, ধর্মাধর্মবিবেকহীন, কোন্ কার্যটি ধর্মসঙ্গত তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ।

শ্রেয়ঃ—কল্যাণকর। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ঃ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভই মানুষের শ্রেয়। ইহাদের মধ্যে ধর্ম এবং মোক্ষই পরম শ্রেয়। এই শ্রেয়োলাভের জন্য যদি অর্থ ও কামকে ত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও অর্জুন প্রস্তুত আছেন। কাজেই এস্থলে 'শ্রেয়' বলিতে ধর্ম ও মোক্ষই বুঝাইতেছে।

শিষ্যঃ—শাসনযোগ্য, শিক্ষার্থী, কোনটি শ্রেয় তৎসম্বন্ধে উপদেশপ্রার্থী। প্রপন্নম্—শরণাগত ; শরণাগত না হইলে গুরুর কৃপা হয় না।

শ্লোকার্থঃ দীনতাদোষ দ্বারা আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, কোনটি আমার ধর্ম তাহাতেও আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা আমার পক্ষে শ্রেয় তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকটি অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ যে প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানার্থ সমস্ত গীতাশাস্ত্র কথিত হইয়াছে সেই সমস্যাটি এই শ্লোকেই অর্জুন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অর্জুনের প্রশ্নটি এই—যুদ্ধ করিয়া স্বজনগণের বিনাশসাধনপূর্বক

রাজ্যলাভ অথবা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া তৎফলস্বরূপ রাজ্য হারাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ, এমন কি নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণত্যাগ—এই দুইটির মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে শ্রেয়, কোনটি আমার কর্তব্য তাহা আমি নিশ্চয় স্থির করিতে পারিতেছি না। হে কৃষ্ণ, তুমি জ্ঞানী তুমি শ্রেষ্ঠপুরুষ। আমি উপরোক্ত সন্দেহের নিরাকরণার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম। আমাকে সখা বলিয়া মনে করিও না। আমাকে শিষ্য ভাবিয়া যথোচিত শিক্ষা প্রদান কর। আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও কোনটি আমার ধর্ম, কোনটি শ্রেয়।

অর্জুন প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে যুদ্ধ না করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়। এজন্য বলিয়াছিলেন 'ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে' (১।৩১)। 'ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ' (১।৪৫)। নানাবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা একথা প্রমাণ করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া তাঁহার চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সন্দেহ দূর করার জন্যই তাঁহার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। শাস্ত্রমতে পুত্র ও শিষ্য ব্যতীত কাহাকেও ধর্মোপদেশ দিতে নাই। কারণ অপরে হয়ত গুরুর কথার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে। তারপর গুরুর উপদেশ লাভ করিতে হইলে ভক্তির সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তিকেই গুরু কৃপাপূর্বক ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই কারণে অর্জুন সখ্যভাব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া এই ধর্মসঙ্কটে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে এই শ্লোকটিতে অর্জুন ব্রহ্মবিদ্যার্থী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আসিয়া অর্জুনের চিত্তে সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি মুমুক্ষু হইয়া কৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভৈক্ষ্যম্, কার্পণ্য, শ্রেয়ঃ, শিষ্য, প্রপন্ন প্রভৃতি শব্দের তদনুরূপ অর্থ করিবেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অর্জুনের চিত্তে যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল তাহা মুমুক্ষুর সাত্ত্বিক বৈরাগ্য নহে। বিষয়ের দোষ-বিচার করিয়া মুমুক্ষুর চিত্তে যে বৈরাগ্যের উদয় হয় অর্জুনের বৈরাগ্য সেই প্রকারের বৈরাগ্য নহে। স্বজনের, বিশেষতঃ ভীষ্মদ্রোণাদির মত গুরুজনের, বধে যে মহাপাপের সঞ্চয় হইবে তাহার ফলে নরকে বাস করিতে হইবে, কুরুকুল ধ্বংস হইবে, পিতৃগণ পতিত হইবেন—এই সকল অনিষ্ট ফলের আশঙ্কায় তিনি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবনধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ধর্মের পথে, পুণ্যের পথে, মোক্ষের পথে থাকিবার তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তজ্জন্য তিনি সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত, ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনটি ধর্মের পথ তাহাই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতেই তিনি কৃষ্ণের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

> দীনতাদোষে অর্জুনের ক্ষত্রিয়স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্মাধর্ম সব বিপর্যস্ত হইয়াছে—তিনি ধর্ম কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহার কর্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন্ নীতির অনুসরণ করিলে তিনি নিশ্চিন্তমনে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। শুধু এই জন্যই শিষ্যভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কার্যতঃ তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন, 'কর্মের একটা সত্য স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও—আমি ইহাই হারাইয়া বিমূঢ়

হইয়া পড়িয়াছি। এমন পথ দেখাও, এমন নীতি শিক্ষা দাও যেন আমি নিশ্চিন্ত মনে কর্মের পথে অগ্রসর হইতে পারি।' জীবনের গূঢ় রহস্য, সংসারের গূঢ় রহস্য—এই সকলের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য অর্জুন জানিতে চাহিলেন না ; তিনি কেবল চাহিলেন একটা 'ধর্ম'।

তবে কথা হইতে পারে যে কার্যাকার্য, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ লাভই যদি অর্জুনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন কেন? তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে কেহই অভ্রান্ত ভাবে নিশ্চিত রূপে কর্মের নীতি স্থির করিতে পারে না। জ্ঞানী যে কর্ম করেন তাহাই শুদ্ধ ও অভ্রান্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানীর মোহ এবং সন্দেহ জন্মিবেই। বুদ্ধি শুদ্ধ, নির্মল এবং স্থির হইয়া পরমাত্মায় সমাহিত না হইলে উহা নানা কামনা-বাসনা দ্বারা বিচলিত, নানা সন্দেহ-সংশয় দ্বারা বিমূঢ় হইবেই। কাজেই বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার মোহ ও সন্দেহ হইতে নির্মুক্ত করিয়া শুদ্ধ, স্থির ও নিশ্চয়াত্মিকা করিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ একান্ত আবশ্যক। এজন্য অর্জুনের চিত্তকে মোহ ও সন্দেহের আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত কর্মের পন্থা প্রদর্শনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যম্ (নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য) সুরাণাম্ অপি আধিপত্যং চ (এবং দেবতাদিগেরও আধিপত্য) অবাপ্য (পাইলেও) যৎ (যাহা) মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ (আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী শোক) অপনুদ্যাৎ (দূর করিতে পারে) [তৎ] ন প্রপশ্যামি (তাহা তো দেখিতেছি না)।

শব্দার্থঃ অসপত্নম্—যাহার সপত্ন [শত্রু] নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, নিষ্কণ্টক। ঋদ্ধম্—সমৃদ্ধ, ধন-শস্যাদিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্—যাহা ইন্দ্রিয়গণকে শোষণ করে অর্থাৎ উহাদের শক্তি হরণ করে, ইন্দ্রিয়ের সন্তাপকর।

শ্লোকার্থঃ এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য, তদুপরি স্বর্গের দেবতাদিগের উপর আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়সকলকে শোষণ করিতেছে, সেই শোক নিবারণ করিতে পারে (তোমার উপদেশ ব্যতীত) এমন তো কিছু দেখিতে পাইতেছি না।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকেও অর্জুনের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে। স্বজনগণের বিয়োগাশংকায় শোকে দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে অর্থকাম লাভ দ্বারা তাঁহার এই শোকের প্রশমন হইবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিবার কথা বলিতেছ, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে দারুণ শোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিকল করিয়াছে। পৃথিবীর রাজত্ব ত দূরের কথা, স্বর্গের আধিপত্যলাভেও তাহার নিবৃত্তি হইবে না। একমাত্র তোমার উপদেশেই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে। কাজেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম ; আমাকে এমন শিক্ষা দাও যাহাতে আমার এই দুর্জয় শোকের উপশম হয় এবং আমি প্রসন্নচিত্তে ধর্মের পথে চলিতে পারি।

মানুষ সাধারণতঃ মনে করে যে সংসারে অর্থকাম লাভ করিতে পারিলেই তাঁহার

সকল দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় অর্জুনের এই কথাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। অর্জুন ইচ্ছা করিলেই বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যতই তাঁহার পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ হউক তাঁহার দুর্জয় শোকদুঃখের কিছুতেই উপশম হইবে না। এজন্য তিনি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের শান্তিলাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশপ্রার্থী হইলেন।

অর্জুনের এই যে অনুভূতি তাহা সাধারণ মানুষের জীবনেও সময় সময় উপস্থিত হয়। কখন কখন তাহার চিত্ত শোকদুঃখ দ্বারা এরূপভাবে আহত হয় যে সাংসারিক ভোগসুখে সে আর কোনই আনন্দ পায় না। তখন তাহার চিত্ত এমন একটা বস্তু পাইতে চায়, এমন সত্য উপলব্ধি করিতে চায় যাহাতে তাহার সকল শোকদুঃখের অবসান হইতে পারে। এই অবস্থায় যদি সে অন্তরস্থিত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারে তবেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। নচেৎ পুনঃপুনঃ শোকদুঃখের অধীন হইয়া যে শান্তিহীন জীবন যাপন করিয়া থাকে। মানবের এই চিরন্তন দুঃখের কি প্রকারে নিবৃত্তি হইতে পারে, কি উপায়ে মানব পরম শান্তি লাভ করিতে পারে গীতাতে ভগবানের মুখে তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

অন্বয়ঃ সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ (শত্রুদমন অর্জুন) হৃষীকেশং গোবিন্দম্ (হৃষীকেশ গোবিন্দকে) এবম্ উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) [অহং] ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি উক্ত্বা (এই কথা বলিয়া) তূষ্ণীং বভূব (নীরব হইলেন)।

শ্লোকার্থঃ সঞ্জয় বলিলেন—পূর্বোক্ত বাক্য বলিবার পর শত্রুতাপন জিতনিদ্র অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে বলিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিব না'। এই কথা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

ব্যাখ্যাঃ অর্জুন কৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধোদ্যম পরিত্যাগপূর্বক শান্ত সমাহিত চিত্তে রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন। এটি ঠিক জিজ্ঞাসু শিষ্যের উপযুক্ত ভাব। কিন্তু তিনি যে বলিলেন 'যুদ্ধ করিব না'—ইহা তাঁহার স্থিরসংকল্প নহে। কারণ যুদ্ধ কর্তব্য কি অকর্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়াই তিনি গুরুর উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথার উদ্দেশ্য এই যে, যাবৎ গুরুর উপদেশে তাঁহার চিত্তের সংশয় দূর না হয় তাবৎ তিনি যুদ্ধ করিবেন না। তারপর কৃষ্ণের উপদেশে যখন তাঁহার সংশয় দূর হইল তখন তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, 'আমার সংশয় দূর হইয়াছে, তোমার বাক্যই আমি পালন করিব।'

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্ ইব (ঈষৎ হাসিয়া)

উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যস্থলে) বিষীদন্তং তম্ (বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে) ইদং বচঃ উবাচ (এই বাক্য বলিলেন)।

শব্দার্থ ঃ প্রহসন্ ইব—যেন উপহাস করিয়া (আ) ; প্রসন্নমুখ হইয়া (শ্রী); অনুচিতাচরণ প্রকাশের জন্য অর্জুনকে লজ্জাসাগরে নিমজ্জিত করিয়া (ম)। এস্থলে শ্রীধরস্বামীর অর্থই সঙ্গত মনে হয়।

শ্লোকার্থ ঃ হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুনের বাক্য শুনিয়া হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যস্থলে বিষণ্ণচিত্ত অর্জুনকে এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুন যে অবশেষে যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন এবং এই প্রসন্নতার ভাব তাঁহার হাসিতে ব্যক্ত হইল। অর্জুনের বিষণ্ণতা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি প্রসন্নমুখে ঈষৎ হাসিয়া উভয় সেনার মধ্যস্থলে তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে অর্জুনকে উপহাস করাই শ্রীকৃষ্ণের হাসির উদ্দেশ্য। কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। যে ব্যক্তি সন্দেহপীড়িত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক উপদেশলাভের নিমিত্ত শরণাপন্ন হইয়াছে তাহাকে উপহাস করা যায় না। গুরু কখনও শরণাগত শিষ্যকে উপহাস করেন না। অর্জুনের শরণাগতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা—ইহার একটি আধ্যাত্মিক গূঢ় অর্থ আছে। মানুষ মোহ ও সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া যতক্ষণ অহংকারবুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যাভিমানে কার্যাকার্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে ততক্ষণ সে কেবলই অন্ধকারে ঘুরিতে থাকে—তাহার সংশয়-সন্দেহের অবসান হয় না। কিন্তু যখনই সে অহংকার দম্ভ পরিত্যাগপূর্বক হৃদয়স্থিত গুরুর শরণাপন্ন হয়, বলে—হে ভগবন্, আমি সংশয়াকুল হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, আমাকে কৃপা করিয়া ধর্মের পথে, কর্তব্যের পথে চালিত কর—তখনই সে হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের বাণী শুনিতে পায়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উভয় সেনার মধ্যস্থলে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন ইহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধারণতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ নির্জন শান্তপ্রদেশেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঋষিদিগের তপোবন বা পর্বতগুহাই তত্ত্বোপদেশের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু অর্জুনকে কোনও নিভৃত প্রদেশে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে ভীষণ কর্মকোলাহলের মাঝখানেই যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাদ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে মানুষ ভক্তির সহিত জিজ্ঞাসু হইয়া যেস্থানে যখনই ভগবানের শরণাপন্ন হয় সেস্থানে তখনই সে হৃদয়স্থিত ভগবানের বাণী শুনিতে পায়। ভগবান যে কেবল নির্জন শান্তপ্রদেশেই মানবাত্মায় আবির্ভূত হন তাহা নহে, কর্মকোলাহলের মাঝখানে—এমন কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ রক্তারক্তির মধ্যেও—ভগবান তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ধর্মের পথে, কর্তব্যের পথে চালিত করিয়া থাকেন। তারপর গীতাতে যে কর্মযোগের উপদেশ আছে তাহা কোনও শান্ত নিভৃতপ্রদেশে না দিয়া কর্মের মাঝখানে দেওয়াই সুসঙ্গত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ

(অশোচ্য ব্যক্তিদের নিমিত্ত শোক করিতেছ) প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (অথচ পণ্ডিতদিগের ন্যায় কথা বলিতেছ) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) গতাসূন্ অগতাসূন্ চ (মৃত এবং জীবিত কাহারও নিমিত্ত) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)।

শব্দার্থ ঃ অশোচ্যান্—যাহাদের জন্য শোক হইতে পারে না তাহাদিগকে, শোকের অবিষয়ীভূত ব্যক্তিদিগকে (শ্রী)। অন্বশোচঃ—'ইঁহারা আমাকর্তৃক হত হইবে, ইঁহাদের অভাবে আমরা কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিব ?' ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া তুমি শোক করিতেছ। প্রজ্ঞাবাদান্—প্রজ্ঞাবান [জ্ঞানী] ব্যক্তিদের বাদ [বাক্যসকল] (শ্রী), পণ্ডিতদের কথাসমূহ। পণ্ডিতাঃ—পণ্ডা [আত্মবিষয়ক জ্ঞান] আছে যাঁহাদের তাঁহারা ; আত্মজ্ঞ, বিবেকবান ব্যক্তিগণ। গতাসূন্ ন অনুশোচন্তি—'ইহারা মরিয়া গেল, ইহাদের অভাবে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব ?' এই বলিরা শোক করেন না। অগতাসূন্ চ—'ইহাদের শীঘ্রই মৃত্যু হইবে অথবা বাঁচিয়া থাকিলেও বন্ধুহীন ইহারা কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে ?' ঃ এই বলিয়া শোক করেন না।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জুন, যাঁহারা শোকের অযোগ্য অর্থাৎ যাঁহাদের জন্য শোকের কোনও কারণই নাই তুমি তাঁহাদের জন্যই শোক করিতেছ, অথচ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের ন্যায় কথা বলিতেছ। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা মৃতই হউক কি জীবিতই হউক কাহারও জন্য শোক করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ শোক-মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে কর্তব্যের পথ প্রদর্শনার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমেই আর্যগণের মধ্যে প্রচলিত সনাতন ধর্মনীতির উল্লেখ করিলেন। এই নীতি অনুসারে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ যে অবশ্যকর্তব্য ; যুদ্ধত্যাগ যে অনার্যোচিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অর্জুনের ন্যায় বীরের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত—তাহাও বলিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্জুনের শোকমোহ দূর হইল না, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না, বরং বলিলেন যে ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও তাঁহার দুর্জয় শোকের নিবৃত্তি হইবে না। গুরু দেখিলেন যে সাংসারিক বা সামাজিক নীতির বিচার দ্বারা এই শোকের প্রশমন হইবে না। তাই তত্ত্বোপদেশ দ্বারা এই শোকের মূল বিনাশে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি যাঁহাদের মৃত্যুর আশংকায় শোক করিতেছ তাঁহারা অশোচ্য ; তাঁহাদের জন্য শোকের কোনও কারণ নাই। যদি তাঁহাদের দেহের বিনাশের জন্যই তোমার শোক হইয়া থাকে, যদি মনে কর স্বজনগণের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ তাঁহাদের দেহের বিনাশ হইলে তোমার জীবন দুঃখময় হইবে তবে বিবেচনা করিয়া দেখ যে দেহ তো জড়পিণ্ড—অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। এই অনিত্য, অকিঞ্চিৎকর পদার্থের নিমিত্ত শোকের কোন কারণ থাকিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান, মোহজনিত মমতার দরুনই তোমার শোক হইতেছে। আর যদি দেহের সহিত আত্মারও বিনাশ হইবে ভাবিয়া তুমি শোকাকুল হইয়া থাক তবে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ আত্মা অবিনাশী, নিত্য। তুমি তো আত্মার পরলোকে অবস্থানের কথা নিজেই বলিয়াছ। কাজেই অবিনাশী আত্মার নিমিত্ত কোন শোক হইতে পারে না। আর যদি মনে কর—হায় ! এই সংসার-স্বজন ইহারা ছাড়িয়া যাইতেছে, ইহাদের কত দুঃখ, মৃত্যুর পর ইহাদের কি গতি হইবে, এবং এই কারণে তোমার শোক হইয়া থাকে, তবে তাহাও অমূলক। কারণ ভীষ্ম দ্রোণাদি মৃত্যুর পর বর্তমান জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট দেহ লাভ করিবেন। কাজেই যেদিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক ইহারা কখনও শোকের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

তারপর 'স্বজনগণকে বিনাশ করিলেই পাপ হইবে', 'কুলের ধ্বংস হইবে', 'পিতৃগণ পতিত হইবেন', 'গুরুজনকে বধ না করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও ভাল'—ইত্যাদি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা তুমি বলিতেছ, অথচ অজ্ঞ মোহাচ্ছন্ন জীবের মত স্বজনের মৃত্যুর আশঙ্কায় মমতাবশতঃ শোক করিতেছ, অশ্রুজল ফেলিতেছ। ইহাতেই বোঝা যায় তোমার প্রকৃত পাণ্ডিত্য নাই। কারণ যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত, যাঁহারা আত্মার স্বরূপ অবগত আছেন তাঁহারা গতাসু (যাহার প্রাণ গত হইয়াছে) এবং অগতাসু (যাহার প্রাণ গত হয় নাই কিন্তু হইবে)—এরূপ কাহারও জন্য শোক করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন যে মৃত্যুতে কেবল দেহেরই বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ হয় না। প্রকৃতপক্ষে কাহারও মৃত্যু হয় না, জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করে মাত্র। কাজেই মৃত্যুজনিত শোক অজ্ঞেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানীর হয় না; তারপর অজ্ঞ জীব মমতার বশে মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বজনের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে; জ্ঞানীদিগের মোহজনিত মমতা নাই, কাজেই তাঁহারা মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না।

এই শ্লোকটিকে গীতার বীজ বলা হয়, কারণ সমগ্র গীতাতে যে শিক্ষা, যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল এই শ্লোকটিতে নিহিত আছে। অজ্ঞ মানুষ অশোচ্য পদার্থের জন্য শোক করে, দেহকেই আত্মা মনে করিয়া দেহের দুঃখে দুঃখিত হয়, দেহের বিনাশে আকুল হইয়া পড়ে। এই অজ্ঞান বা ভ্রম হইতেই মানুষের শোক-দুঃখের উৎপত্তি। অথচ অজ্ঞানী মানুষ তাহার ভ্রম বুঝে না, মনে করে সে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই সত্য। পক্ষান্তরে যে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত আছেন, যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন জগতে মৃত্যু নাই, মৃত্যু আর কিছুই নয়, আত্মার দেহান্তর গ্রহণ। দুঃখযাতনা দেহের বা মনের বিক্রিয়া মাত্র, উহা আত্মাকে স্পর্শ করে না। কাজেই সমস্ত দুঃখশোকের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে আত্মার জ্ঞানলাভ আবশ্যক। যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া, বুদ্ধিকে পরমাত্মায় স্থিত করিয়া সংসারে কর্ম করিবেন তাঁহার সকল শোকদুঃখের অবসান হইবে। তিনি শোকদুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া পরম মোক্ষানন্দ লাভ করিবেন। এই কথাই গীতাতে পরে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

> ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
> ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ অহম্ (আমি শ্রীকৃষ্ণ) জাতু ন আসম্ (কখনও ছিলাম না) ত্বং ন [আসীঃ] (তুমি কখনও ছিলে না) ইমে জনাধিপাঃ ন [আসন্] (এই রাজগণ কখনও ছিলেন না) [ইতি] ন তু এব (ইহা নহে) অতঃপরং চ (ইহার পরেও) সর্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (আমরা সকলে থাকিব না) [ইতি] ন এব (ইহাও নহে)।

শব্দার্থঃ অহং ন আসম্ ন তু এব—আমি ছিলাম না তাহা নহে, পরন্তু ছিলাম। জাতু—কদাচিৎ, এই শব্দটি আসম্, আসীঃ [উহ্য], আসন্ [উহ্য] এই সকল ক্রিয়ার সহিতই যুক্ত হইবে। ইমে জনাধিপাঃ—এই সম্মুখস্থ নৃপতিবৃন্দ। অতঃপরম্—ইহার অর্থাৎ এই জীবনের পরবর্তীকালে। ন ভবিষ্যামঃ ন এব—আমরা সকলে থাকিব না, তাহা নহে, পরন্তু থাকিব।

শ্লোকার্থঃ এই জন্মের পূর্বে আমি শ্রীকৃষ্ণ কখনও ছিলাম না তাহা নহে, তুমি কখনও ছিলে না, এই রাজন্যবৃন্দ ইঁহারা পূর্বে ছিলেন না তাহাও নহে অর্থাৎ তুমি, আমি এবং উপস্থিত রাজগণ—আমরা সকলেই এই জন্মের পূর্বেও ছিলাম। ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না তাহা নহে—বস্তুতঃ আমরা সকলেই এই জন্মের পরেও থাকিব।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে অর্জুন অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য শোক করিতেছেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি কেন অশোচ্য এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে অর্জুন, তুমি, আমি এবং এই রাজগণ—আমরা এই জন্ম অর্থাৎ বর্তমান দেহ গ্রহণের পূর্বেও ছিলাম এবং এই জন্মের পর অর্থাৎ বর্তমান দেহের বিনাশ হইলেও থাকিব। দেহের বিনাশের সঙ্গেই আমাদের বিনাশ হইবে না। কাজেই যুদ্ধে উপস্থিত রাজগণের দেহের বিনাশের পরও যদি তাঁহারা বর্তমান থাকেন তবে তাঁহাদের নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই।' এই শ্লোকে 'আমি', 'তুমি' ও 'রাজগণ'—ইহাদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবমাত্রেরই (শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নিজেকে জীবরূপেই ধরিয়াছেন) জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকে। জীবের দেহের বিনাশ হইলেও আত্মা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালেই নিত্য।

এই শ্লোক হইতেই শ্রীরামানুজাচার্য জীবাত্মা পরমাত্মার পারমার্থিক ভেদ এবং জীবের নিত্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'সর্বেশ্বর পরমাত্মা আমি যেমন নিত্য—ইহাতে সংশয় নাই, সেইরূপ ভগবৎপ্রমুখ জীবাত্মাসকলও নিত্য জানিও। এইরূপে ভগবান সর্বেশ্বর ও জীবাত্মাসমূহের পরস্পর ভেদ পারমার্থিক—ইহাই ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়'।[১]

শ্রীশংকরাচার্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করেন না, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়াই নিত্য। তিনি বলেন—

'আমাদের দেহের বিনাশের পরবর্তী কালেও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কালেই আমরা আত্মস্বরূপে নিত্য। দেহের বিভিন্নতাবশতঃই বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে, আত্মার ভেদপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে নয়'।[২] শ্রীধরস্বামী বলেন—

'এই রাজগণ পূর্বে ছিলেন না তাহা নয়, পরন্তু ছিলেনই; কারণ ইঁহারা আমার অংশ, সেইরূপ পরেও থাকিবেন; অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নিত্য'।[৩]

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইবে যে জীবাত্মার নিত্যত্ব সকলেরই স্বীকার্য। তবে শংকরাচার্যের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, যাহা কিছু ভেদ দেখা যায় তাহা উপাধিগত। উপাধির বিনাশ হইলে জীব ব্রহ্মই হন। দেহ বা উপাধিভেদে জীব বহু, কিন্তু আত্মস্বরূপে সকল জীব এক এবং নিত্য। রামানুজাচার্যের মতে জীব বহু, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন—জীব এক নয়, বহু এবং সোপাধিক জীবই নিত্য। যাহা হউক জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহার বিচার করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। জীবের দেহের পরিবর্তন

---

১ যথাহং সর্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্যঃ ইতি নাত্র সংশয়স্তথৈব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোঽপি নিত্যা এবেতি মন্তব্যাঃ, এবং ভগবতঃ সর্বেশ্বরাদাত্মনাঞ্চ পরস্পরং ভেদঃ পারমার্থিক ইতি ভগবতৈবোক্তমিতি প্রতীয়তে।

২ অতোঽস্মদ্দেহবিনাশাদুত্তরকালেঽপি ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহ-ভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ।

৩ ইমে চ জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি তু ন, অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ তথাতঃপরম্।

সত্ত্বেও জীবের অন্তরস্থ আত্মা অবিনাশী ও নিত্য—তিন কালেই বর্তমান—একথা বলাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে (দেহীর এই দেহে) যথা (যেরূপ) কৌমারং যৌবনং জরা (কৌমার, যৌবন এবং বার্ধক্য) তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (ভিন্ন দেহ ধারণও তদ্রূপ) তত্র (তাহাতে, সে বিষয়ে) ধীরঃ ন মুহ্যতি (জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না)।

শব্দার্থঃ দেহিনঃ—দেহবান আত্মার (শ); দেহাভিমানী জীবের (শ্রী)। কৌমারম্—কুমারভাব, বাল্যাবস্থা। যৌবনম্—যুবার ভাব, মধ্যাবস্থা। জরা—অধিক বয়স প্রযুক্ত জীর্ণাবস্থা (শ); বৃদ্ধত্ব। ধীরঃ—ধীমান, দেহ ও আত্মার স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি। ন মুহ্যতি—মোহপ্রাপ্ত হন না (শ), ভ্রান্ত হন না।

শ্লোকার্থঃ দেহবান জীবমাত্রেরই যেরূপ বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধত্ব—এই তিন অবস্থা ঘটিয়া থাকে, মৃত্যুর পর ভিন্নদেহ ধারণও তদ্রূপ অর্থাৎ ইহাও জীবের একটি অবস্থান্তর মাত্র। এই ভিন্ন দেহ গ্রহণ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ কখনও মোহ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাঁহারা জানেন যে মৃত্যুতে জীবের বিনাশ হয় না, দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র, কাজেই সেইজন্য শোক করেন না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে উপস্থিত রাজন্যবৃন্দ মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকিবেন। কি অবস্থায় থাকিবেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। জীবের মৃত্যুতে দেহেরই বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ হয় না। জীবাত্মা তখন ভিন্নদেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে-যেমন দেহধারী ব্যক্তিমাত্রেরই শৈশবকালে যেরূপ দেহ থাকে, যৌবনে তাহার অনেক পরিবর্তন হয়, আবার যৌবনকালের দেহ বৃদ্ধকালে পরিবর্তিত হয়; কিন্তু দেহের এই ঘোর পরিবর্তন সত্ত্বেও সে জানে যে সে এক ব্যক্তিই আছে। কারণ দেহের পরিবর্তন হইলেও তাহার আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। এইরূপ মৃত্যুর পরেও দেহেরই পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এক দেহের বিনাশ হইয়া নূতন দেহের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। কাজেই জীবিতকালে দেহের পরিবর্তনবশতঃ লোকে যেমন শোক করে না, সেইরূপ মৃত্যুর পর নূতন দেহ ধারণেও কোনও প্রকার শোক করা কর্তব্য নহে।

এখন কথা হইতে পারে যে জীবিতকালে দেহের যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তন সত্ত্বেও দেহধারী মানুষ বুঝিতে পারে যে সর্বাবস্থায় সে এক ব্যক্তিই আছে। কিন্তু এক দেহের বিনাশের পর নূতন দেহধারী পুরুষের পূর্বদেহের কোন অনুভূতি থাকে না। জন্মের পূর্বে সে যে অন্য দেহে বর্তমান ছিল তাহা তো তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় না। তবে কেমন করিয়া বলা যাইবে যে মৃত্যুর পর জীব দেহান্তর গ্রহণ করিয়া বর্তমান থাকে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যদিও জন্মের পূর্বে কোন্ দেহে বর্তমান ছিল অজ্ঞ জীব তাহা স্মরণ করিতে পারে না, তথাপি তাহার একটা অস্ফুট সংস্কার সময় সময় তাহার চিত্তে জাগিয়া উঠে। কবিগুরু কালিদাস 'শকুন্তলা' কাব্যের

একটি শ্লোকে এই অনুভূতি-বিষয় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ হইল: সুন্দর দৃশ্য দর্শন এবং মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী প্রাণীরও চিত্ত যে উৎসুক হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের অস্পষ্ট কিন্তু ভাবস্থির কোনও সৌহৃদ্যের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়।[1]

সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যগ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কার হইতেও পূর্বজন্মের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি, ক্ষীণমেধা বলিয়া সাধারণ লোকে পূর্বজন্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। পূর্বজন্মের কথা দূরে থাকুক এই জীবনেরই তো অনেক কথা স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। কাজেই পূর্বজন্মের অনুভূতি যে লুপ্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? কিন্তু ধীমান ও মেধাবী ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে কোন মোহ জন্মে না—তাঁহারা পূর্বজন্মের কথাও স্মরণ রাখিতে পারেন। জাতিস্মর মহাপুরুষগণ অনেক স্থলে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অভ্রান্তভাবে বলিয়া দিয়াছেন এরূপ কথা শোনা যায় এবং গ্রন্থাদিতেও লিপিবদ্ধ আছে। আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবিতকালে দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র, কিন্তু মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হইয়া থাকে। তবে উভয় অবস্থা একরূপ কি করিয়া বলা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুতেও দেহের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র।[2] আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃঢ় প্রত্যয় নাই বলিয়াই তাহারা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে ধীমান জ্ঞানী ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে কোনও মোহ বা সংশয় না থাকাতে তাঁহারা জীবের মৃত্যুতে শোক করেন না।

এই শ্লোকটিতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মের অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মৃত্যুতে দেহেরই বিনাশ হয় আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মা তখন ভিন্ন দেহে বর্তমান থাকে। এইরূপে জীব স্বকৃত কর্মফল ভোগার্থ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। ইহারই নাম জীবের সংসার। এই সংসার হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। ইহাই জন্মান্তরবাদের মূল তত্ত্ব। এই জটিল তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নয়। স্থানান্তরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

অন্বয়ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়ের সংস্পর্শসকল) শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ (শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রদানকারী) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল) অনিত্যাঃ (সুতরাং অনিত্য) ভারত (হে ভরতবংশীয় অর্জুন) তান্ তিতিক্ষস্ব (উহাদিগকে সহ্য কর)।

শব্দার্থঃ মাত্রাস্পর্শাঃ—যাহাদের দ্বারা বিষয়সমূহ মিত [জ্ঞাত] হয় তাহাদের নাম মাত্রা [ইন্দ্রিয়সমূহ], উহাদের সহিত বিষয়ের স্পর্শ বা সম্বন্ধের নাম মাত্রাস্পর্শ (শ্রী); অথবা মাত্রার [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের] স্পর্শ [অনুভব],

---

[1] রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্ ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদ্যানি ॥

[2] এই অধ্যায়ের ২২শ ও ২৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিষয়ানুভূতি (নী)। শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ—যাহা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রদান করে; যাহা হইতে শীতোষ্ণাদির অনুভূতি হয়। আগমাপায়িনঃ—যাহাদের আগম [উৎপত্তি, বৃদ্ধি] ও অপায় [বিনাশ, ক্ষয়] আছে, উৎপত্তি-বিনাশশীল। অনিত্যাঃ—এই হেতু অনিয়তরূপ (ম), অস্থায়ী। তিতিক্ষস্ব—সহ্য কর, অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া উপেক্ষা কর, তাহাতে হর্ষ-বিষাদ করিও না।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযোগ হইলেই শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়। এই সকল অনুভূতি কখনও উৎপন্ন হয়, আবার বিনাশ পায়—এই আসে এই চলিয়া যায়—ইহারা অনিত্য, অত্যন্ত ক্ষণিক। সুতরাং ইহাদিগকে সহ্য করিতে অভ্যাস কর অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা অভিভূত বা বিচলিত হইও না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর পর আত্মা ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান থাকিবে। কিন্তু পূর্বদেহের বিনাশের দরুনও তো শোক হইতে পারে। কারণ এই দেহের সহিতই মানুষের সুখদুঃখের সম্বন্ধ। ভীষ্মের দেহ দর্শন করিয়া, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াই তো অর্জুনের সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন উক্ত দেহের বিনাশবশতঃ দর্শনাদির অভাব হইলে শোক না হইবে কেন? এই আশংকার উত্তরে বলা হইতেছে যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শজনিত যে সুখদুঃখের অনুভব হয় তাহা অতি ক্ষণিক এবং অকিঞ্চিৎকর, কাজেই উহা সহ্য করাই উচিত। সহ্য করিবার প্রধান উপায় হইতেছে উপেক্ষা করা, অগ্রাহ্য করা। যদি প্রশ্ন হয় কেন উপেক্ষা করিব, কেন সহ্য করিব? তাহার উত্তর এই—(১) এই সকল অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইলে সুখ বা দুঃখের অনুভব হইবেই—ইন্দ্রিয়ের ধর্মই এই। কাজেই উহা সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। (২) এই সকল অনুভূতি দেহেন্দ্রিয় মনেই আবদ্ধ থাকে (মাত্রাস্পর্শাঃ), আত্মাকে স্পর্শ করে না—কাজেই ইহারা অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর সুতরাং উপেক্ষার যোগ্য। (৩) ইহারা অতি ক্ষণিক—এই আছে, এই নাই (আগমাপায়িনঃ)। এই মুহূর্তে যে সুখের অনুভূতি, পরমুহূর্তেই তাহার বিনাশ। কাজেই অতি ক্ষণিক তাহা সহ্য করা বা উপেক্ষা করাই কর্তব্য। (৪) সুখদুঃখ সহ্য করিলে উহাদের অনুভূতির তীব্রতা কমিয়া যায়। ধৈর্যের সহিত সহ্য করিলে সুখ আর সুখ এবং দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই সুখদুঃখে বিচলিত না হইয়া উহা সহ্য করাই কর্তব্য।

দুঃখ যেমন সহ্য করিতে হইবে সুখও তেমনি সহ্য করা দরকার। কিন্তু দুঃখ সহ্য করা বরং সহজ, কিন্তু সুখ সহ্য করা অতি কঠিন। অতি অল্প লোকেই সুখ সহ্য করিতে পারে। অধিকাংশ লোকেই সুখভোগে এমন বিচলিত হয়, এরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে, এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে অনেক স্থলে তাহাদের সদসৎ জ্ঞান বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়সুখের ভোগ দ্বারা অনেকের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়, অহংকার বৃদ্ধি পায়; এই কারণে ধর্মের পথে, মুক্তির পথে সুখ যতটা বিঘ্ন জন্মায় দুঃখ ততটা জন্মায় না। বরং কোন কোন স্থলে দুঃখ মুক্তিপথের সহায়ক হয়। মুক্তিকামী ব্যক্তির সুখ যেমন শত্রু দুঃখ তেমন নয়। তবে কথা হইতে পারে যে মানুষ চিরজীবন কি কেবল সুখ ও দুঃখ সহাই করিবে? সুখের অর্জন কি দুঃখের নিবারণকল্পে সে কোন চেষ্টাই করিবে না? যাহাতে সুখের বৃদ্ধি হয় এবং দুঃখের হ্রাস হয় তজ্জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিবে না? সে কি

কেবল জড়পিণ্ডের মত সুখদুঃখ সহ্য করিয়াই যাইবে? না, তা নয়। সুখদুঃখ সহ্য করিতে হইবে বলিলে একথা বুঝায় না। ইহার অর্থ এই যে সুখের বৃদ্ধি কি দুঃখের নিবারণ মানবজীবনের লক্ষ্য নহে। ধর্মের পথে চলিয়া ক্রমশঃ মুক্তির অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনেই মানুষকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে—ইহাতে যদি সুখ আসে আসুক, দুঃখ আসে আসুক। যথাপ্রাপ্ত সুখ এবং দুঃখকেই বিধাতার আশীর্বাদরূপে বরণ করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলে চলিবে না। সুখদুঃখকে উপেক্ষা করিয়া জীবনের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। সংসারে দুঃখ আছে দেখিয়া অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, আবার কর্মমাত্রই দুঃখকর বিবেচনায় কেহ কেহ কর্মত্যাগের পরামর্শ দেন। কিন্তু এইভাবে দুঃখ হইতে পলায়নের চেষ্টা গীতার অভিমত নহে। এরূপ চেষ্টা নিরর্থক—কাপুরুষতা মাত্র। প্রথম অবস্থায় সুখদুঃখকে সহ্য করিয়া ক্রমশঃ উহাদিগকে জয় করিতে হইবে, পরে সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে উঠিয়া উহাদিগকে সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই গীতার উপদেশ। এই ভাবে সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন পুরুষের কথাই পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

অন্বয় ঃ পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) এতে (ইহারা এই সকল মাত্রাস্পর্শ) সমদুঃখসুখম্ (সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন) ধীরং যং পুরুষম্ (যে ধীর পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (সেই পুরুষ) অমৃতত্বায় কল্পতে (অমৃতত্ব লাভের যোগ্য বা অধিকারী হয়)।

শব্দার্থ ঃ পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ, অর্জুনকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে তিনিও অমৃতত্বলাভের যোগ্য হইতে পারিবেন। ন ব্যথয়ন্তি—বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত করে না (শ); অভিভূত করে না (শ্রী); কোন বিকার উৎপাদন করে না। এতে—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদির এই সকল অনুভূতি। সমদুঃখসুখম্—সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন; সুখদুঃখে হর্ষবিষাদরহিত (শ), অতএব নির্বিকার। ধীরম্—ধীমান, বিবেকবান (শ); ধর্মনিষ্ঠ (ব), স্থিরবুদ্ধি। অমৃতত্বায় কল্পতে—অমৃতভাব বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় (শ); মোক্ষলাভের যোগ্য হয় (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, যে স্থিরচিত্ত জ্ঞানী পুরুষ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি দ্বারা ব্যথিত বা বিচলিত হন না, যিনি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন থাকেন তিনিই অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভের অধিকারী হন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখ সহ্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ যতদিন দেহাত্মবোধ দূর না হয়, যতদিন ত্রিগুণের খেলার মধ্যে থাকা যায়, ততদিন সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কোন প্রকারেই ইহার হাত এড়াইতে পারা যাইবে না। জোর করিয়া চাপিয়া রাখাও অসম্ভব, কারণ প্রকৃতিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা যায় না। কাজেই সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু মুক্তিকামী পুরুষ যখন বিষয়কে ছাড়িয়া আত্মাকে লাভ করিবেন, যখন ত্রিগুণের খেলাকে অতিক্রম করিয়া আত্মাতে অবস্থান করিবেন, যখন জ্ঞানলাভ করিয়া স্থিরচিত্ত

হইবেন, তখন সুখদুঃখে তাঁহার সমজ্ঞান হইবে। সুখেতে হর্ষ হইবে না, দুঃখেও বিষাদ হইবে না। তিনি তখন সুখদুঃখকে জয় করিয়া উভয়ের উপরে উঠিবেন, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব তখন রহিত হইয়া যাইবে। এরূপ ব্যক্তিই অমৃতত্ব লাভের যোগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ

এই যোগ্যতা কিরূপে আসিবে? কে প্রকৃত যোগ্য পুরুষ? যিনি নিজেকে শুদ্ধ শরীর ও প্রাণ বলিয়া মনে করেন না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়াই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয় করেন না, যিনি নিজেকে এবং সকলকেই আত্মা বলিয়া জানেন, যিনি আত্মার মধ্যেই বাস করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীবভাবে নহে আত্মাভাবেই ব্যবহার করেন—তিনিই যোগ্য। মৃত্যুর পর থাকাই অমৃতত্ব নহে—কারণ মন লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে। জন্মমৃত্যুর উপরে উঠাই প্রকৃত অমৃতত্ব। মানুষ যখন কেবল দেহ ও মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আত্মারূপে আত্মার মধ্যেই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হয়। যাহারা শোক-দুঃখের অধীন, চিন্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস, অনিত্য বিষয়সমূহের স্পর্শ লইয়াই যাহারা ব্যস্ত তাহারা অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে না। যতদিন ইহাদিগকে জয় করিতে পারা না যাইতেছে ততদিন ইহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে। শেষে এমন একদিন আসিবে যখন ইহারা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত আত্মা গুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা ও শান্তির সহিত সংসারের সমস্ত ঘটনা গ্রহণ করেন, মুক্ত পুরুষও তেমনি শান্তভাবে সংসারের সুখদুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন (অরবিন্দের গীতা)।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অন্বয় ঃ অসতঃ (অসতের) ভাবঃ (অস্তিত্ব, সত্তা, স্থিতি) ন বিদ্যতে (নাই) সতঃ (সৎ বস্তুর) অভাবঃ (বিনাশ, অবিদ্যমানতা) ন বিদ্যতে (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ কর্তৃকই) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ দৃষ্টঃ (চরম স্বরূপ দৃষ্ট হইয়াছে)।

শব্দার্থ ঃ অসতঃ—অনাত্মধর্মত্বহেতু অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির (শ্রী); পরিণামক বিনাশশীল দেহাদির (ব); অনিত্যত্বহেতু যথার্থ সত্তাবিহীন শীতোষ্ণাদি অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর। ভাবঃ—সত্তা (শ্রী); অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, স্থিতি। সতঃ—সৎস্বরূপ আত্মার (শ); সৎস্বভাব আত্মার (শ্রী); অপরিণামী আত্মার (ব)। অভাবঃ—অবিদ্যমানতা (শ); নাশ (শ্রী); পরিণামিত্ব (ব)। তত্ত্বদর্শিভিঃ—বস্তুর যথার্থ স্বরূপবিদ্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক (ম)। অনয়োঃ—সৎ এবং অসৎ, এই উভয়ের। অন্তঃ—নির্ণয় (শ), চরমতত্ত্ব। দৃষ্টঃ—উপলব্ধ।

শ্লোকার্থ ঃ অসৎ বস্তুর বিদ্যমানতা বা স্থিতি নাই অর্থাৎ অসৎ বস্তু যথার্থ আছে একথা বলা যায় না, সৎবস্তুরও কখনও অভাব বা অবিদ্যমানতা হয় না অর্থাৎ সৎ বস্তু নাই একথাও কখনও বলা যায় না। যথার্থদর্শী জ্ঞানিগণই সৎ এবং অসৎ—এই উভয়ের চরম তত্ত্ব অবগত আছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে সৎ ও অসৎ পদার্থের স্বরূপ নির্দেশপূর্বক উহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি অনুভূতিসমূহ এবং এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই অসৎ, আত্মাই একমাত্র সৎ পদার্থ। অসৎ পদার্থের ভাব নাই, পক্ষান্তরে সৎ পদার্থের অভাব হইতেই পারে না। অভাব চারি প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। অসৎ পদার্থের এই চারি প্রকার অভাবই উপলব্ধি হয়, পক্ষান্তরে সৎ পদার্থ আত্মাতে কোন প্রকারের অভাবই নাই ঃ

(১) উৎপত্তির পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব বলে। ঘট নামক পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা কখনও উৎপন্ন হয় না, উহা সর্বদাই বর্তমান আছে, কাজেই উহার প্রাগভাব নাই।

(২) বস্তুর বিনাশ বা ধ্বংস হইলে উহার যে অভাব হয় তাহার নাম ধ্বংসাভাব। কোনও ঘটকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলে উহার যে অভাব হয়, দেহকে পুড়িয়া ছাই করিলে উহার যে অভাব হয় তাহাই ধ্বংসাভাব। এক্ষণে ঘটপটাদি দৃশ্যমান জাগতিক সকল পদার্থ বিনাশী, কাজেই উহাদের ধ্বংসাভাব আছে, আত্মাই একমাত্র অবিনাশী, সুতরাং উহার ধ্বংসাভাব নাই।

(৩) ঘটের বর্তমান অবস্থাতেই অর্থাৎ যে স্থানে ঘট থাকে সেই স্থান ভিন্ন অন্য সকল স্থানেই ঘটের যে জাতীয় অভাব অনুভূত হয় সেই জাতীয় অভাবকেই ঘটের অত্যন্তাভাব বলে। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই একদেশব্যাপী, সুতরাং অন্য সকল দেশেই উহার অত্যন্তাভাব। পক্ষান্তরে আত্মা অপরিচ্ছিন্ন এবং সর্বব্যাপী বলিয়া উহার অত্যন্তাভাব নাই।

(৪) ঘট পট নহে, কিম্বা পট ঘট নহে—এই প্রকার শব্দ শুনিলে আমরা ঘটের বা পটের যে অভাব বোধ করিয়া থাকি সেই অভাবই ঘটের বা পটের অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব ও ভেদ—এই দুইটি শব্দ একই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। বস্তুর ভেদ ত্রিবিধ—স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। বৃক্ষের অঙ্গগত ফল-পুষ্প-পত্রাদির যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ। আম্রবৃক্ষের সহিত কণ্টকীবৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; বৃক্ষের সহিত গো-মনুষ্যাদির যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। জাগতিক পদার্থের মধ্যেই এই ত্রিবিধ ভেদজনিত অন্যোন্যাভাব আছে—আত্মার কোনরূপ ভেদ বা বস্তু-পরিচ্ছেদ নাই বলিয়াই উহা অন্যোন্যাভাবরহিত।

অন্যপ্রকারেও সৎ এবং অসতের প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে তাহাই অসৎ, পক্ষান্তরে যাহার অস্তিত্ব অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না, যাহা নিজের সত্তায় সত্তাবান তাহাই সৎ। অতএব ঃ

(১) কার্যের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভর করে; সুতরাং কার্যমাত্রই অসৎ। আবার যাহা কোনও কার্যের কারণ তাহাই আবার অপর কারণের কার্য। এই প্রকারে বিশ্বপ্রপঞ্চ কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ—জগতে এমন কোনও বস্তু বা ঘটনা নাই যাহা কোনও পূর্ববর্তী কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং জাগতিক পদার্থমাত্রই অসৎ। আত্মাই কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অতীত, আত্মা কোনও কার্যের কারণ নহে; সুতরাং আত্মাই একমাত্র সৎ পদার্থ।

(২) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতেই সুখদুঃখাদির অনুভূতি হয়। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্বও ইন্দ্রিয় দ্বারাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া

উহারা অসৎ। পক্ষান্তরে আত্মার অস্তিত্ব কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করে না। উহা অপ্রমেয়, স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রকাশ ; কাজেই ইহা সৎ।

প্রকৃতপক্ষে যাহা অনিত্য, চঞ্চল এবং বিনাশধর্মী তাহাই অসৎ। কারণ যাহা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, যাহা ক্ষণেকের জন্যও একভাবে থাকে না, অসংই যাহার স্বভাব তাহার প্রকৃত ভাব বা সত্তা নাই। এরূপ পদার্থ প্রকৃতপক্ষে আছে একথা বলা যায় না। এজন্যই বলা হইয়াছে অসৎ পদার্থের ভাব নাই। পক্ষান্তরে যাহা নিত্য, অবিকারী, সর্বদা একরূপ তাহাই সৎ। এরূপ সৎ পদার্থের অভাব অসম্ভব। মায়াবাদিগণ বলেন—এ জগৎ মিথ্যা, মায়ারচিত ইন্দ্রজাল মাত্র, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অলীক। কিন্তু এই শ্লোকে জগৎ মিথ্যা একথা বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে জগৎপ্রপঞ্চ অসৎ অর্থাৎ স্থিতিবিহীন।

যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হইয়াছেন সেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অনিত্য ও নিত্য বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছেন। তাহারাই কোন্ বস্তু সৎ, কোন্ বস্তু অসৎ, উহাদের প্রভেদ কোথায় তাহা সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অজ্ঞানী অসৎ বস্তুকে সৎ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়, দেহাদি অসৎ পদার্থকেই সৎ মনে করিয়া তাহার জন্য সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অথচ যাহা প্রকৃত নিত্য সৎ বস্তু তাহার অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারে না ; অতএব হে অর্জুন, তুমি অজ্ঞ বলিয়াই ভীষ্মাদির দেহের বিনাশে শোক করিতেছ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং সৎ ও অসৎ পদার্থের স্বরূপ সম্যক্ অবগত হইলে তোমার আর শোকের কোনও কারণ থাকিবে না।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ যেন (যাহাদ্বারা) ইদং সর্বং ততম্ (এই সমস্ত ব্যাপ্ত) তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি (তাহাকেই বিনাশরহিত বলিয়া জানিবে) অস্য অব্যয়স্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং কর্তুম্ (বিনাশ-সাধন করিতে) ন কশ্চিৎ অর্হতি (কেহই সমর্থ হয় না)।

শব্দার্থঃ যেন—যে সৎস্বরূপ আত্মা দ্বারা, যে সদাখ্য ব্রহ্ম দ্বারা (শ)। ইদং সর্বম্—এই নিখিল জগৎ (শ) ; আগমাপায় ধর্মাত্মক দেহাদি (শ্রী)। ততম্—আকাশ দ্বারা যেমন ঘটাদি ব্যাপ্ত সেইরূপ ব্যাপ্ত (শ)। অব্যয়স্য—অব্যয়স্বরূপ আত্মার, যাহার উপচয় অপচয় প্রভৃতি ব্যয় বা বিকার নাই এরূপ বস্তুর। বিনাশম্—বিলোপ, ধ্বংস ; বিনাশ দুই প্রকার, অদর্শন ও অভাব। কশ্চিৎ—কোনও পদার্থ (রা) ; কোনও আশ্রয়, বিষয় বা হেতু (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে সৎস্বরূপ আত্মা এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে সেই আত্মাকে বিনাশহীন বলিয়া জানিও। যাহা অব্যয়স্বরূপ অর্থাৎ যাহার স্বরূপের বিকার বা বিচ্যুতি হয় না তাহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে সৎ বস্তুর অভাব বা বিনাশ নাই। এই সৎ বস্তুটি কি এবং কেন তাহার বিনাশ নাই এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যে পরমাত্মা আধাররূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছে তাহাই সৎ বস্তু, এই সৎ বস্তুকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। কারণ সর্বব্যাপকত্বই যাহার স্বরূপ তাহার

বিনাশ হইবে কিরূপে ? যাহা বিনাশশীল তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। আত্মা ব্যাপক এবং এই জগৎ ব্যাপ্য। ব্যাপক আত্মাই ব্যাপ্য জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ব্যাপকের বিনাশ হইলে ব্যাপ্য থাকিতেই পারে না। সুতরাং সর্বব্যাপী আত্মার বিনাশ অসম্ভব।

এই আত্মা অব্যয়স্বরূপ। ইহার কোনরূপ ব্যয় অর্থাৎ বৃদ্ধি, ক্ষয়, উপচয়, অপচয় প্রভৃতি বিকার বা ব্যভিচার নাই। ইহা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, সর্বদা একরূপ। ইহার বিনাশ অসম্ভব। কারণ আত্মাকে বিনাশী বলিলে ইহার অব্যয়-স্বরূপের হানি হয়। যাহার অবয়ব আছে, যাহা স্থূল, পরিচ্ছিন্ন তাহারই হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ প্রভৃতি বিকার হইতে পারে ; কিন্তু যাহার কোনরূপ অবয়ব বা আকার নাই, যাহা আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ তাহার বিনাশ হইবে কিরূপে ? কেই বা তাহাকে বিনাশ করিবে ? আত্মার যেমন নিজ হইতে বিকার বা বিনাশ হইতে পারে না অপর কর্তৃকও ইহার বিকার বা বিনাশ হইতে পারে না। কারণ আত্মাই একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্তু আর সমস্তই পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তু কি অপরিচ্ছিন্নকে বিনাশ করিতে পারে ? ব্যাপ্য কি ব্যাপককে বিনাশ করিতে পারে ?

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

অন্বয়ঃ অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (প্রমাণের অতীত) নিত্যস্য (নিত্য) শরীরিণঃ (দেহবান আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ উক্তাঃ (অন্তবিশিষ্ট বলিয়া কথিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) ভারত (হে অর্জুন) যুধ্যস্ব (তুমি যুদ্ধ কর)।

শব্দার্থঃ নিত্যস্য—সর্বদা একরূপ (শ্রী)। অনাশিনঃ—দ্বিবিধ বিনাশরহিত (শ)। অপ্রমেয়স্য—যাহা প্রমাণসাপেক্ষ নয় তদ্রূপ (শ) ; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন (শ্রী) ; অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু দুর্জ্ঞেয় (বি)। ইমে—এই সমস্ত সুখদুঃখধর্মাত্মক (শ্রী)। দেহাঃ—স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপ, সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মক শরীরসকল (ম)। অন্তবন্ত—যাহাদের অন্ত [শেষ] আছে, বিনাশশীল। শরীরিণঃ—শরীরবান আত্মার (শ)। উক্তাঃ—ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত। তস্মাৎ—যেহেতু দেহই বিনাশশীল এবং আত্মা অবিনাশী সেইহেতু। যুধ্যস্ব—যুদ্ধ হইতে বিরত হইও না (শ)।

শ্লোকার্থঃ প্রমাণের অতীত, সর্বদা একরূপ, অবিনাশী এই আত্মা যে সকল বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন সেই দেহগুলিই বিনাশশীল বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু সকল দেহে অবস্থিত এই আত্মার বিনাশ নাই। অতএব, হে অর্জুন, তুমি তোমার স্বধর্মোচিত কার্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইও না।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে সর্বব্যাপী অব্যয় আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্লোকে দেহাদি পদার্থের নশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আত্মা নিত্য এবং অবিনাশী। অদর্শন ও পরিবর্তন—এই দ্বিবিধ নাশরহিত বলিয়া আত্মা অবিনাশী এবং সর্বদা একরূপ বলিয়া আত্মা নিত্য। আত্মা অপ্রমেয়—আত্মার উপলব্ধির নিমিত্ত কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই এবং কোনও প্রমাণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ

ও অনুমান। যাহা কখনও থাকে কখনও থাকে না, কখনও জ্ঞাত কখনও অজ্ঞাত, তাহারই অস্তিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ তাহার প্রতিপাদনের জন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই—তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তারপর প্রমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, স্থূল, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের উপলব্ধি হয়; কিন্তু যাহা অপরিচ্ছিন্ন, অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাকে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করা যাইবে কিরূপে? জ্ঞেয় পদার্থকে জ্ঞাতার গোচরে আনাই প্রমাণের কার্য, কিন্তু আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা, আত্মাই প্রমাতা। যে নিজেই জ্ঞাতা, নিজেই প্রমাতা তাহাকে আবার প্রমাণ করিবে কে?

এই সর্বব্যাপী আত্মাই বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোনও শরীর নাই, আত্মা অশরীরী। আত্মা শরীর গ্রহণ করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করেন বলিয়া আত্মাকে শরীরী বলা হয়। এই শরীরী (আত্মা) এক, কিন্তু উঁহার শরীর বহু। এই কারণে 'শরীরিণঃ' শব্দ একবচনান্ত এবং 'দেহাঃ' শব্দ বহুবচনান্ত হইয়াছে। এই শরীরী (আত্মা) যে সকল শরীর গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান সেই সকল শরীরেরই শেষ (অন্ত) আছে। কিন্তু বিভিন্ন শরীরে যে এক আত্মা বর্তমান তাঁহার শেষ বা অন্ত নাই, অর্থাৎ দেহেরই বিনাশ হয় দেহস্থ আত্মার বিনাশ হয় না। এক দেহের বিনাশ হইলে আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া বর্তমান থাকে। আমরা এই সংসারে যাহাকে মৃত্যু বা ধ্বংস বলি তাহা এই দেহেরই ধ্বংস, আত্মার ধ্বংস নহে। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—এক সর্বব্যাপী আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান।[1] অন্যত্র বলা হইয়াছে—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রগণ ও বিদ্যুন্মালা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, অগ্নি আবার তাঁহাকে কি আলোক দান করিবে? তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া জগৎ প্রকাশিত এবং তাঁহার আলোক দ্বারা নিখিল জগৎ আলোকিত।[2]

অতএব হে অর্জুন, তুমি যে মনে করিতেছ এই যুদ্ধে ভীষ্মাদির বিনাশ হইবে তাহা তোমার ভ্রমমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভীষ্মাদির দেহেরই বিনাশ হইবে, আত্মার বিনাশ হইবে না। কাজেই স্বজনবিয়োগের আশঙ্কায় শোকাকুল হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

অন্বয়ঃ যঃ (যে ব্যক্তি) এনম্ (ইহাকে, এই আত্মাকে) হন্তারং বেত্তি (হন্তা বলিয়া জানে) যঃ চ (এবং যে ব্যক্তি) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়া মনে করে) তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (সম্যক্ জানে না) অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হনন করে না) ন হন্যতে (কাহার দ্বারা হত হয় না)।

শব্দার্থঃ যঃ—যে অজ্ঞ ব্যক্তি। এনম্—এই প্রকৃত দেহীকে (শ); আত্মাকে (নী)। বেত্তি—জানে, 'আমি ইহার হন্তা' এইরূপ মনে করে। এনং হতং

১ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।১১

২ ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ কঠ ২।২।১৫

মন্যতে—'দেহের হনন হওয়াতে আমি হত হইলাম' এরূপ মনে করে। ন বিজানীতঃ—সম্যক্ অবগত নহেন, আত্মস্বরূপে অনভিজ্ঞ (শ)।

শ্লোকার্থঃ দেহস্থ এই আত্মা অন্যকে বধ করে এরূপ যিনি জানেন অথবা এই আত্মা অন্যের দ্বারা হত হয় এরূপ যিনি ভাবেন—এই উভয়ের কেহই আত্মার স্বরূপ যথার্থ অবগত নহেন। কারণ এই আত্মা কাহাকেও বধ করে না, কাহারও দ্বারা এই আত্মা হতও হয় না।

ব্যাখ্যাঃ আত্মার অকর্তৃত্ব ও অকর্মত্ব নির্দেশপূর্বক তাহার সমর্থনার্থ এই শ্লোকটি কঠোপনিষৎ হইতে একটু পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়া গীতাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।[1]

এই শ্লোকে দুইটি কথা বলা হইয়াছেঃ

অয়ং ন হন্তি—এই আত্মা কাহাকেও হনন করে না, হনন-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব আত্মাতে নাই। অবশ্য হনন-ক্রিয়া এখানে প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। বাস্তবিক আত্মা কোন কর্মই করে না। আত্মা নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়—আত্মা সাক্ষী, উদাসীন, নির্লিপ্ত। তবে কর্ম করে কে? জীবাত্মা যে শরীর ধারণ করিয়া আছে সেই শরীর—জীবের দেহ মন ইন্দ্রিয়—ইহারাই কর্ম করে। ইহারাই জীবের প্রকৃতি নামে অভিহিত—এই প্রকৃতিই কর্ম করে। তবে যে জীব মনে করে 'আমি কর্তা, আমি কর্ম করিতেছি'—অর্জুন যে মনে করিতেছেন তিনি ভীষ্মাদির হনন করিবেন। তাহার কারণ এই যে জীব অহঙ্কারে বশীভূত হইয়া দেহে আত্মাভিমান করে—মনে করে 'এই দেহই আমি।' আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ বলিয়া দেহের কার্য, প্রকৃতির কার্যকেই সে আত্মার কার্য বলিয়া মনে করে। এইজন্যই তাহার কর্তৃত্ববোধ হয়। আত্মা যদি অকর্তা হয় তবে পাপ পুণ্যও ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীব দেহে আত্মাভিমান করে বলিয়া, নিজেকে কর্তা মনে করে বলিয়াই তাহার পাপ-পুণ্যের বোধ হয়। যতদিন এই আত্মাভিমান থাকিবে ততদিন পাপ-পুণ্যের বোধ দূর হইবে না এবং তাহার ফলভোগও করিতে হইবে। কিন্তু যখন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিবে তখন পাপের ভয় বা পুণ্যের আকর্ষণ উভয়ই দূর হইবে। কাজেই ভীষ্মাদির হননহেতু অর্জুনের চিত্তে যে পাপের আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহা তাঁহার অজ্ঞতারই ফল। আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হইলে আর পাপের আশঙ্কা থাকিবে না।

নায়ং হন্যতে—এই আত্মা হতও হয় না। আত্মা অব্যয়স্বরূপ, অবিনাশী—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আত্মা যদি হত না হয় তবে হত হয় কে? দেহই হত হয়; দেহেরই বিনাশ হয়। আত্মার বিনাশ নাই। তবে যে লোকে বলে 'আমি হত হইলাম', অর্জুন যে বলিতেছেন 'ভীষ্মাদি হত হইবেন'—তাহার কারণ কি? তাহার কারণ অজ্ঞতা, দেহে আত্মাভিমান। জীব দেহে আত্মাভিমান করে বলিয়া দেহ হত হইলেই মনে করে 'আমিই হত হইলাম'। অর্জুনও অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিতেছেন ভীষ্মাদি হত হইবেন। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই অর্জুন বুঝিতে পারিবেন যে ভীষ্মাদির দেহই

১ হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১।২।১৯

হত হইল, আত্মা হত হইল না। তখন শোকেরও কোন কারণ থাকিবে না। এস্থলে 'হনন' ক্রিয়াটি প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। আত্মার উপর কোনও কর্মই হয় না, আত্মার যেমন কোন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নাই, তদ্রূপ কর্মত্বও নাই। আত্মা নির্বিকার, আত্মাতে কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব নিবন্ধন কোন বিকারই উৎপন্ন হইতে পারে না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অন্বয় ঃ অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (কখনও জন্মে না) বা ম্রিয়তে (অথবা মরে না) ভূত্বা বা ন ভূয়ঃ অভবিতা ন (অথবা ইহা একবার হইয়া পুনরায় থাকিবে না—ইহা নয়) [অথবা] ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন (ইহা একবার না থাকিয়া পুনরায় হইবে—ইহাও নয়) অয়ং (ইহা) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (সর্বদা বিদ্যমান, চিরন্তন) পুরাণঃ (পূর্বকালে থাকিয়াও সর্বদা নূতন) শরীরে হন্যমানে (দেহ হত হইলেও) ন হন্যতে (আত্মা হত হয় না)।

শব্দার্থ ঃ ন জায়তে—নূতন উৎপন্ন হয় না, জনন-লক্ষণরূপ বস্তুর বিক্রিয়া আত্মাতে নাই (শ)। ন ম্রিয়তে—মরে না, বিনষ্ট হয় না, মরণরূপ দেহের বিক্রিয়া আত্মার নাই (শ)। ন অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ—ইহার দুই প্রকার পদবিন্যাস হইতে পারে ঃ (১) অয়ং ভূত্বা ন ভূয়ঃ অভবিতা ন—ইহা একবার হইয়া পুনরায় থাকিবে না, তাহা নয়, (২) অয়ং ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন—ইহা পূর্বে না থাকিয়া পুনরায় হইবে, ইহাও নয়। অয়ং—সর্বদেহগত আত্মা। অজঃ—যেহেতু ইহা জন্মে না, অতএব অজ (শ)। নিত্য—যেহেতু ইহা মরে না, অতএব নিত্য (শ) ; সর্বদা একরূপ। শাশ্বতঃ—সর্বদা বর্তমান, অপক্ষয়বিহীন। পুরাণঃ—পুরাকালেই নূতন, বর্তমানে নূতন অবস্থাবিহীন (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ এই আত্মা কখনও নূতন উৎপন্ন হয় না, কখনও বিনষ্ট হয় না। এই আত্মা একবার থাকিয়া পুনরায় থাকিবে না—এরূপ নহে ; অথবা পূর্বে অবিদ্যমান থাকিয়া পরে বিদ্যমান হইল—ইহাও নহে। ইহা জন্মহীন, সর্বদা একরূপ, সর্বদা বর্তমান, পুরাকালে থাকিয়াও সর্বদা নূতন ; কাজেই অপচয় বা বৃদ্ধি রহিত। শরীর বিনষ্ট হইলেও শরীরস্থ আত্মার বিনাশ হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্ম হত হন না, এখন কঠোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র[১] উদ্ধারপূর্বক এই কথা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আত্মা যে কেবল হত হন না তাহা নহে, জন্মাদি ষড়্বিধ বিক্রিয়ার কোন বিক্রিয়াই আত্মাতে নাই।

এই শ্লোকে ষড়্বিধ বিকার আত্মার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ষড়্বিধ বিকার এই ঃ (১) জন্ম (২) অস্তিত্ব (৩) বৃদ্ধি (৪) পরিণাম (৫) অপক্ষয় (৬) বিনাশ।

ন জায়তে—ইহা দ্বারা প্রথম বিকার 'জন্ম' প্রতিষিদ্ধ হইল। নূতন উৎপন্ন হওয়ার নাম জন্ম ; দেহই জন্মাইতেছে, আত্মা কখনও জন্মায় না ; ইহা চিরকালই আছে।

ন ম্রিয়তে—ইহা দ্বারা ষষ্ঠ বিকার 'বিনাশ' প্রতিষিদ্ধ হইল। দেহেরই বিনাশ হইতে পারে, আত্মার বিনাশ হয় না।

১ ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১।২।১৮

ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন—পূর্বে না থাকিয়া পরে হইল, ইহাও নহে। ইহাদ্বারা দ্বিতীয় বিকার 'অস্তিত্ব' নিষিদ্ধ হইল। পূর্বে বিদ্যমান না থাকিয়া পরে বিদ্যমান থাকার নাম অস্তিত্ববিকার।

নিত্যঃ—ইহা দ্বারা তৃতীয় বিকার 'বৃদ্ধি' নিষিদ্ধ হইল। আত্মা নিত্য, অর্থাৎ সর্বদাই একরূপ, কাজেই উহার বৃদ্ধি অসম্ভব।

শাশ্বতঃ—ইহা দ্বারা পঞ্চম বিকার 'অপক্ষয়' নিষিদ্ধ হইল। আত্মা শাশ্বত অর্থাৎ সমভাবে আছেন, তাহার ক্ষয় অসম্ভব।

পুরাণঃ—ইহা দ্বারা চতুর্থ বিকার 'পরিণাম' নিষিদ্ধ হইল। এই আত্মা পুরাতন অথচ নূতন। নশ্বর দেহের ন্যায় ইহা পরিণত বা পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করে না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) যঃ (যিনি) এনম্ (ইহাকে, এই আত্মাকে) নিত্যম্ (নিত্য) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অবিনাশিনম্ (এবং অবিনাশী) বেদ (জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথম্ (কি প্রকারে) কং হন্তি (কাহাকে হত করিবেন) কং ঘাতয়তি (কাহাকেই বা হত করাইবেন)।

শব্দার্থ ঃ এনম্—পূর্বমন্ত্রোক্ত লক্ষণ আত্মাকে (শ)। অজম্—আদ্য-বিকার জন্মরহিত (ম)। অব্যয়ম্—যাহার কোন প্রকার ব্যয় নাই, অবয়ব বা গুণের অপচয় রহিত (ম)। নিত্যম্—বিপরিণাম-রহিত, সর্বদা বিদ্যমান (ম)। অবিনাশিনম্—অন্ত্যবিকার বিনাশরহিত (শ)। বেদ—জানেন, শাস্ত্রাচার্যোপদেশ দ্বারা সাক্ষাৎ করেন (ম)। সঃ পুরুষঃ—সেই বিদ্বান পুরুষ। কথম্—কি প্রকারে, কি উপায়ে। ঘাতয়তি—অপরের দ্বারা হত করাইবেন।

শ্লোকার্থ ঃ হে কুন্তীপুত্র অর্জুন, যিনি এই আত্মাকে নিত্য জন্মরহিত, অব্যয় এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত করিবেন, কাহাকেই বা অপরের দ্বারা হত করাইবেন ? অর্থাৎ তিনি জানেন যে এই আত্মা কাহারও দ্বারা (স্বয়ং বা প্রবর্তকরূপে) কোন উপায়েই হত হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে আত্মার অকর্তৃত্ব ও অকর্মকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে। যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, যিনি জানেন যে আত্মা অজ, অব্যয়, নিত্য ও অবিনাশী, আত্মার উক্তরূপ স্বরূপে যাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে তিনিই বুঝিতে পারেন যে আত্মা নিজেও কাহাকে বধ করিতে পারেন না, অন্যের দ্বারাও বধ করাইতে পারেন না। কারণ, ইহা অব্যয় ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া কাহাকেও হনন করা বা হনন করিতে প্রবৃত্ত-করা-রূপ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব তাহাতে নাই। তিনি আরও জানেন যে আত্মা কিছুতেই হত হইতে পারে না। হনন ক্রিয়ার কর্মত্বও আত্মাতে নাই। তারপর এমন কোন উপায় বা উপকরণ নাই যাহাদ্বারা আত্মা হত হইতে পারে, কারণ শস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা অবয়ববিশিষ্ট জড় পদার্থকেই হনন করা যাইতে পারে। নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে হনন করা যাইবে কি উপায়ে ?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

অন্বয় ঃ যথা (যেরূপ) নরঃ (মনুষ্য) জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় (জীর্ণ বস্ত্রসকল ত্যাগ করিয়া) অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি (অন্য নূতন বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে) তথা (তদ্রূপ) দেহী (দেহস্থ আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় (জীর্ণ শরীরসকল ত্যাগ করিয়া) নবানি সংযাতি (নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়)।

শব্দার্থ ঃ জীর্ণানি—জীর্ণ, পুরাতন, দুর্বলতাপ্রাপ্ত (শ) ; নিকৃষ্ট (ম)। দেহী—আত্মা (শ) ; দেহবান্ আত্মা (ম)। জীর্ণানি শরীরাণি—অধিক বয়স বা রোগাদি হেতু ভগ্ন দেহসকল, বয়স এবং তপস্যা দ্বারা কৃশ ভীষ্মাদির শরীরসকল (ম)। নবানি শরীরাণি—নূতন উৎকৃষ্ট দেহসকল ; কল্যাণ (রা) সর্বোৎকৃষ্ট (ম) দেহসকল।

শ্লোকার্থ ঃ মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে আত্মাও সেইরূপ পুরাতন জীর্ণ দেহসকল ত্যাগ করিয়া নূতন দেহসমূহ প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে আত্মার বিনাশ হয় না, এক্ষণে বলা হইতেছে যে দেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। কাজেই শোকের কোনও কারণ নাই। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে। কেহ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে যেমন তাহা দুঃখের কারণ না হইয়া হর্ষেরই কারণ হয়, সেইরূপ ভীষ্মাদি বীরগণ তাঁহাদের বর্তমান জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিলে তাহাতে শোক না করিয়া হর্ষপ্রকাশ করাই কর্তব্য। বিশেষতঃ সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই রাজন্যবৃন্দ উৎকৃষ্ট দেহই লাভ করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের মহা উপকারই হইবে, কাজেই তাহার জন্য শোক করিও না। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে যে দেহের তুলনায় বস্ত্র যেমন অকিঞ্চিৎকর, আত্মার তুলনায় দেহও অকিঞ্চিৎকর—দেহ আত্মার খোলস মাত্র। এই অকিঞ্চিৎকর খোলসের পরিবর্তনে শোক করা কিছুতেই বিধেয় নহে। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেও পরিধানকারী ব্যক্তি যেমন সর্বদাই এক, তদ্রূপ বিভিন্ন দেহ ধারণ করিলেও দেহী অর্থাৎ আত্মা এক। এই কারণে 'নর' ও 'দেহী' শব্দ একবচনে এবং 'বাসাংসি' ও 'শরীরাণি' শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু কথা হইতে পারে যে পুরাতন বস্ত্র ত্যাগে তো মানুষ কোনও দুঃখ অনুভব করে না, বরং আগ্রহের সহিতই উহা ত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু দেহত্যাগের সময় তো জীবের দুঃখবোধ হয় ; দেহ প্রাচীন হইলেও উহা কেহ ছাড়িতে চায় না। ইহার কারণ দেহের প্রতি জীবের মমতা। দেহের প্রতি অত্যধিক মমতাবশতঃ দেহ জীর্ণ পুরাতন হইলেও মানুষ উহা ছাড়িতে চায় না। এরূপ অজ্ঞ সংসারাসক্ত লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যে জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট অনুভব করে। তারপর অজ্ঞ জীব দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। মৃত্যুর পর আত্মা যে নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া বর্তমান থাকিবে এ বিষয়ে অজ্ঞ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস নাই। কাজেই মৃত্যুর পর কি গতি হইবে ইহাই ভাবিয়া সে আকুল হয়। সে একেবারেই লুপ্ত হইবে অথবা কোন্ অন্ধকার অজানা প্রদেশে চলিয়া যাইবে—ইহা ভাবিয়া বিলাপ করিতে থাকে। আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে মানুষ একবস্ত্র

পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করে। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই নূতন বস্ত্র পরিহিত হয়। কিন্তু মানুষ পার্থিব দেহ ত্যাগের পর কিছুকাল স্বর্গাদি লোকে বাস করিয়া কর্মের ফলভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।[1] আবার কেহ বলেন, জলৌকা যেরূপ এক তৃণ পরিত্যাগ করিয়া অপর তৃণ আশ্রয় করে আত্মাও সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অন্বয় ঃ শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং ন ছিন্দন্তি (এই আত্মাকে ছেদন করে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দগ্ধ করে না) আপঃ চ এনং ন ক্লেদয়ন্তি (জলও ইহাকে সিক্ত করে না) মারুতঃ [এনং] ন শোষয়তি (বায়ু ইহাকে শোষিত করে না)।

শব্দার্থ ঃ ন ছিন্দন্তি—ছেদন করিতে পারে না, অবয়ব বিভাগ দ্বারা দ্বিধা করিতে পারে না (ম) ; নিরবয়ব বলিয়া উহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিতে পারে না (শ)। ন দহতি—ভস্ম করিতে পারে না (ম) ; আত্মা অমূর্ত বলিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে না। ন ক্লেদয়ন্তি—ক্লিন্ন বা সিক্ত করিতে পারে না ; আর্দ্রীকৃত করিয়া অবয়বের বিশ্লেষণ করিতে পারে না (ম)। ন শোষয়তি—শুষ্ক বা নীরস করিতে পারে না (ম)। এনম্—ইহাকে, প্রকৃত দেহীকে (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ এই আত্মাকে শস্ত্রসমূহ ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলরাশি ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ুও ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে অবয়ববিশিষ্ট জড়পদার্থ দেহের সহিত নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রভেদ দেখাইয়া বলা হইতেছে আত্মা যে কেবল হত হয় না, তাহা নহে ; ইহার ছেদন, দহন বা শোষণ—কিছুই হইতে পারে না। কারণ জড়পদার্থের উপরই জড়পদার্থের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। দেহাদি জড়পদার্থ বলিয়া উহারা শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, জলদ্বারা সিক্ত, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং বায়ুদ্বারা শোষিত হয়। কিন্তু আত্মা অজড় চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা উহার কোনও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না। তারপর যাহা মূর্ত, অবয়ববিশিষ্ট শস্ত্রাদি দ্বারা তাহারই অবয়বের বিশ্লেষণ বা বিভাগ হইতে পারে ; কিন্তু আত্মা অমূর্ত এবং নিরবয়ব, কাজেই শস্ত্রাদি দ্বারা উহার অবয়ববিভাগ অসম্ভব।

যদি এই প্রশ্ন হয় যে গৃহদাহ হইলে যেমন গৃহস্থিত মানুষও দগ্ধ হইয়া যায়, সেই কারণে দেহ বিনষ্ট হইলে দেহস্থ আত্মার বিনাশ হইবে না কেন ? ইহারই উত্তরে বলা হইল যে ভীষ্মাদির দেহ বিনষ্ট হইলেও তদাশ্রয়ী আত্মা অমূর্ত, নিরবয়ব, অজড় বলিয়া উহার বিনাশ হইতে পারে না। লোকে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে 'আমি দগ্ধ হইলাম' 'আমি ছিন্ন হইলাম' ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে দেহই দগ্ধ বা ছিন্ন হয়, আত্মা কখনও দগ্ধ বা ছিন্ন হয় না। অর্জুন যদি মনে করেন তাঁহার অস্ত্রে ভীষ্মাদির মৃত্যু না হইলেও তাঁহারা ছিন্ন বা দগ্ধ হইবেন—তবে উহা তাঁহার ভ্রম বলিয়াই মনে করিতে

[1] নবম অধ্যায়ের ২০শ ও ২১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হইবে। কারণ ভীষ্মাদির দেহই দগ্ধ বা ছিন্ন হইতে পারে, তাঁহাদের আত্মা কখনও দগ্ধ বা ছিন্ন হইবে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪

অন্বয়ঃ অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অচ্ছেদ্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অদাহ্যঃ (অদাহ্য) অক্লেদ্যঃ (অক্লেদ্য) অশোষ্যঃ চ এব (এবং অশোষ্য) অয়ম্ (এই আত্মা) নিত্যঃ (নিত্য) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) স্থাণুঃ (স্থিরভাবাপন্ন) অচলঃ (অচল) সনাতনঃ (সনাতন) অয়ম্ অব্যক্তঃ (এই আত্মা অব্যক্ত) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (এই আত্মা অচিন্ত্য) অয়ম্ (এই আত্মা) অবিকার্যঃ (অবিকার্য) উচ্যতে (কথিত হয়)।

শব্দার্থঃ নিত্যঃ—সর্বদা একরূপ। সর্বগতঃ—সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বদেহানুপ্রবিষ্ট। স্থাণুঃ—স্থিরস্বভাব, রূপান্তরপ্রাপ্তিশূন্য (শ্রী)। অচলঃ—চলন বা স্পন্দনবিহীন। সনাতনঃ—চিরন্তন, শাশ্বত (ব)। অব্যক্তঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্রত্যক্ষ (ম)। অচিন্ত্যঃ—অনুমান দ্বারাও যাহাকে জানা যায় না (ম); মনেরও অগোচর (শ্রী)। অবিকার্যঃ—বিক্রিয়া রহিত (ম); কর্মেন্দ্রিয়সকলেরও অগোচর (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ এই আত্মাকে কোন উপায়ে ছেদন করা, দগ্ধ করা, সিক্ত করা বা শোষণ করা যাইতে পারে না। এই আত্মা সর্বদা একরূপ, সর্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব, চলন বা স্পন্দনহীন, সর্বদা বর্তমান। এই আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তার অতীত, সর্বপ্রকার বিকার রহিত বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মাকে শস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় না, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা যায় না ইত্যাদি। এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়া আত্মার স্বরূপ আরও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাকে শস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় না, কারণ উহা অচ্ছেদ্য; অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা যায় না, কারণ উহা অদাহ্য; জলদ্বারা সিক্ত করা যায় না, কারণ উহা অক্লেদ্য; বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না, কারণ উহা অশোষ্য। পূর্বশ্লোকে যাহা বিশেষ ক্ষেত্রে নিষেধ করা হইয়াছিল এই শ্লোকে তাহা সাধারণ ভাবে নিষেধ করা হইল। আত্মার ছেদনাদি অসম্ভব, কারণ উহা নিত্য; যাহা নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ তাহার ছেদনাদি হইতেই পারে না। আত্মা নিত্য—কারণ উহা সর্বব্যাপী। যাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত তাহা অনিত্য বা বিনাশী হইতে পারে না। আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়াই উহা স্থিরস্বভাব; স্থিরস্বভাব বলিয়াই চলন বা স্পন্দনহীন, এবং চলন বা স্পন্দনহীন বলিয়াই উহা চিরন্তন।

আত্মা অব্যক্ত—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর; চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। স্থূল পরিচ্ছিন্ন বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু যাহা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী ও অপরিচ্ছিন্ন তাহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যাইবে কিরূপে?

আত্মা অচিন্ত্য—মনের অতীত, যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই চিন্তার মূল উপাদান। ব্যক্ত বিষয়েরই ধারণা হইতে পারে; আত্মা অব্যক্ত বলিয়া উহা চিন্তারও অতীত। অনুমান দ্বারাও ইহাকে জানা যায় না।

আত্মা অবিকার্য—ষড়্‌বিধ বিকারের অতীত। দধি যেরূপ দুগ্ধের বিকার, আত্মার সেইরূপ বিকার হইতে পারে না। কারণ আত্মার অবয়ব নাই, নিরবয়ব বলিয়া উহার বিকার অসম্ভব।

উপরে আত্মার যে স্বরূপ দেওয়া গেল শ্রুতিতে তাহাই বলা হইয়াছে। যথা—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্।' আকাশের ন্যায় সর্বগত, নিত্য, বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ, অচল, স্বাধীন, অটল, ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত।[১]

পূর্বোক্ত 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে' শ্লোকে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে এই শ্লোকেও তাহার অনেকটা পুনরুক্তি হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপলব্ধি নিতান্ত আয়াসসাধ্য ও সুকঠিন ব্যাপার বলিয়া ভগবান বাসুদেব শিষ্যের হিতার্থ বিভিন্ন শব্দদ্বারা একই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিতেছেন। আত্মতত্ত্বের দুর্বোধ্যতা হেতু পুনরুক্তি দোষাবহ হয় নাই।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ তস্মাৎ (সেই হেতু) এনম্ এবং বিদিত্বা (এই আত্মাকে এইরূপ জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (তোমার শোক করা উচিত নহে)।

শব্দার্থঃ এবম্—পূর্বোক্তরূপ, যথাস্বরূপ, যথোক্তপ্রকারে (শ)। ন শোচিতুম্ অর্হসি—তোমার শোক করা উচিত নহে, অতএব আত্মবিদ হইয়া শোক পরিত্যাগ কর।

শ্লোকার্থঃ অতএব আত্মার পূর্বোক্ত প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া স্বজনবর্গের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যাঃ সপ্তদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্বিংশ শ্লোক পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। যথা— আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; আত্মা কখনও ছিল না বা কখনও থাকিবে না, এরূপ নহে—আত্মা নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ; আত্মা অব্যয়, নির্বিকার; আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন; আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য। দেহের ধ্বংসের সহিত আত্মার ধ্বংস হয় না—দেহী আত্মা জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।

হে অর্জুন, আত্মার উপরোক্ত স্বরূপ অবগত হইলে তোমার শোকের কোনও কারণই থাকিবে না। কারণ ভীষ্মাদি স্বজনগণের এই যুদ্ধে মৃত্যু হইবে এবং তুমিই তাঁহাদের বধের কর্তা—ইহা মনে করিয়াই তো তোমার শোক হইয়াছে। কিন্তু যদি তুমি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাক যে, দেহ আত্মা নহে এবং হননক্রিয়ার কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব আত্মাতে নাই, তবে আর তোমার শোকের কোনও কারণই থাকিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানই জীবের সুখদুঃখের হেতু। দেহাদি পদার্থ অনিত্য, সুতরাং অসৎ, ইহারা অকিঞ্চিৎকর—এই জ্ঞান নাই বলিয়াই ত আমরা ইহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকি। অজ্ঞ লোক মনে করে এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহই তাহার সর্বস্ব—ইহাদের সহিত তাহার জীবনের সমস্ত কারবার। কাজেই ইহাদের সংযোগ বা বিয়োগে সে সুখদুঃখ ভোগ করে। পক্ষান্তরে যে

---

১ শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন তিনি জানেন যে আত্মাই একমাত্র সৎ বস্তু, আর সমস্তই অসৎ—সুখদুঃখ দেহেন্দ্রিয় মনের বিক্রিয়া মাত্র। কাজেই জাগতিক পদার্থের সংযোগে বিয়োগে তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। আত্মার জ্ঞানলাভ করাই জগতের শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হইবে ততদিন মানুষের শোক-দুঃখের নিবৃত্তি কিছুতেই হইবে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—যিনি আত্মজ্ঞ তিনিই শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি আত্মার স্বরূপ সম্যক্ অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ অথ চ (ইহার পরেও) এনং (ইহাকে) নিত্যজাতং (নিত্য নূতন জাত) নিত্যং বা মৃতম্ (অথবা নিত্যমরণশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) মহাবাহো (হে মহাভুজ) ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি (তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না)।

শব্দার্থঃ অথ চ—পক্ষান্তরে (ব); যদিও (শ)। নিত্যজাতম্—(১) নিত্য [নিয়মিতরূপে] জাত, অর্থাৎ দেহের সঙ্গেই আত্মার জন্ম এই নিয়মেই আত্মা নিয়মিত-ভাবে জন্মিতেছে [চার্বাকাদির এই মত], (২) আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিত্য অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই জন্মিতেছে [ক্ষণিকবাদীদের মত]। নিত্যং মৃতম্—নিয়মিতরূপে দেহের মৃত্যুতে মৃত অথবা প্রতিক্ষণেই মৃত। মন্যসে—কল্পনা কর (ম)।

শ্লোকার্থঃ হে বিপুলবাহু অর্জুন, উপরোক্ত প্রসঙ্গের পরেও যদি তুমি মনে কর যে আত্মা দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সর্বদা জন্মিতেছে এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সর্বদা বিনষ্ট হইতেছে তাহা হইলেও আত্মার অবিরত জন্ম-মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে আত্মার স্বরূপ অবগত হইলে কাহারও শোকের কারণ থাকিতে পারে না। তত্ত্বদর্শীর শোক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অর্জুনের যদি তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে, আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যদি প্রাকৃত জনের মত তিনি মনে করেন 'দেহই আত্মা এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়', অথবা যদি মনে করেন 'আত্মা প্রতিক্ষণেই জন্মিতেছে এবং প্রতিক্ষণেই মরিতেছে', তথাপি এই জন্মমরণশীল আত্মার জন্য তাঁহার শোক করা কর্তব্য নহে। যাহারা আত্মাকে দেহেরই ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করে তাহাদের প্রধানতঃ তিনটি মত দৃষ্ট হয়ঃ

(১) দেহই আত্মা অথবা আত্মা দেহেরই পরিণতি মাত্র। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই; যেমন চুণ এবং খয়েরর মিশ্রিত হইলেই লাল রঙের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ হইলেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে। ইহাই চার্বাকাদির মত।

(২) দেহাতিরিক্ত আত্মা থাকিলেও দেহের সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই দেহের সহিত আত্মার জন্ম এবং দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে।

(৩) আত্মা জ্ঞানস্বরূপ—জ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। এই মুহূর্তে যে জ্ঞান জন্মে পর মুহূর্তেই তাহা লুপ্ত হয়—আবার নূতন জ্ঞান জন্মে। এই প্রকারে জ্ঞানপ্রবাহ চলিতে থাকে। এই জ্ঞানই আত্মা; কাজেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিয়তই জন্মিতেছে, নিয়তই বিনষ্ট হইতেছে। ইহাই লোকায়তদিগের মত।

এক্ষণে যদি মনে করা যায় যে আত্মা জন্মমৃত্যুর অধীন, সর্বদাই জন্মিতেছে এবং মরিতেছে, তথাপি আত্মার মৃত্যুর জন্য শোক করা যাইতে পারে না। কারণ যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহার জন্য আবার কিসের শোক? আত্মা মরিলেই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে, কাজেই শোকের কোনও কারণ নাই। তারপর তুমি যে পাপের আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছ তাহারই বা অবসর কোথায়? দেহের বিনাশের সঙ্গেই যদি সমস্ত বিনষ্ট হইল তবে আর পাপের ফল ভোগ করিবে কে? সুতরাং আত্মাকে জন্মমৃত্যুর অধীন বলিয়া মনে করিলেও তোমার শোক পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ হি (যেহেতু) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (জাতের মৃত্যু নিশ্চিত) মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং (মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যে অর্থে (এই অপরিহার্য বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি (তুমি শোক করিতে পার না)।

শব্দার্থঃ জাতস্য—লব্ধজন্ম জীবের (শ); স্বকর্মবশে যিনি স্থূল শরীরাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার (ব)। অপরিহার্যে অর্থে—অবশ্যম্ভাবী জন্মমরণাত্মক বিষয়ে (শ্রী)।

শ্লোকার্থঃ যাহার জন্ম হইয়াছে তাহাকে অবশ্যই একদিন মরিতে হইবে এবং যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহাকেও অবশ্যই জন্মিতে হইবে—ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং হে অর্জুন, এই অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য বিষয়ের জন্য তোমার শোক করা কর্তব্য নহে।

ব্যাখ্যাঃ যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার মৃত্যু হইবেই, আবার যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহারও জন্ম নিশ্চিত। জন্মমৃত্যু প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, জাগতিক কোন পদার্থই এই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। একমাত্র আত্মাই জন্ম-মরণের অতীত—আত্মার জন্মও নাই, সুতরাং মৃত্যুও নাই। আত্মা যে দেহে বিদ্যমান থাকে সেই দেহেরই জন্ম এবং মৃত্যু হয়। জীব যে দেহ নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে দেহের বিনাশ হইবেই, আবার সেই দেহের বিনাশ হইলে জীব নূতন দেহ ধারণ করিয়া জন্ম-গ্রহণ করিবে—ইহাও নিশ্চিত। আর যদি আত্মাকেই জন্মমরণাধীন মনে করা যায় তাহা হইলেও যে আত্মা জন্মিয়াছে সেই আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত আত্মাও আবার জন্মগ্রহণ করিবে—ইহাও নিশ্চিত। 'হে অর্জুন, তোমার সম্মুখে যে রাজগণ উপস্থিত আছেন—ইহারা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহাদের মৃত্যু হইবেই—তুমি যুদ্ধ করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে। তুমি কিছুতেই তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।' শ্রীকৃষ্ণ অন্যস্থলে বলিয়াছেন 'আমি ইহাদিগকে পূর্বেই মারিয়া রাখিয়াছি, হে অর্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। যাহা অপ্রতিবিধেয় যাহা অবশ্যই ঘটিবে তাহার জন্য শোক করিও না। যাহার প্রতিকার অসম্ভব তাহার জন্য শোক করা মূর্খের কার্য।'

এস্থলে কথা হইতে পারে যে জন্মমৃত্যু যদি অপরিহার্য হয় তবে জীবের মুক্তির আশা কোথায় ? ইহার উত্তর এই যে জন্মমৃত্যু প্রকৃতিরই অলংঘনীয় নিয়ম। যাহারা প্রকৃতির খেলার মধ্যে আছে তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির খেলার উপরে উঠিয়াছেন তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

অন্বয় ঃ ভারত (হে অর্জুন) ভূতানি (ভূতসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত) অব্যক্তনিধনানি এব (মরণান্তেও অব্যক্ত) তত্র (তাহাতে, তদ্বিষয়ে) কা পরিদেবনা (বিলাপের কি কারণ আছে)।

শব্দার্থ ঃ ভূতানি—শরীরসকল (শ্রী); পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীরসমূহ (ম)। অব্যক্তাদীনি—যাহাদের আদি [জন্মের পূর্বাবস্থা] অব্যক্ত [অনুপলব্ধ, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর] (শ); অব্যক্ত [প্রধান, মূল প্রকৃতি] আদি [উৎপত্তির পূর্বরূপ] যাহাদের (শ্রী)। ব্যক্তমধ্যানি—যাহাদের মধ্য [মধ্যাবস্থা] ব্যক্ত [প্রকাশিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর]; ব্যক্ত [অভিব্যক্ত] মধ্য [জন্মমরণান্তরকাল] যাহাদের। অব্যক্তনিধনানি—যাহাদের নিধন [মরণের পরের অবস্থা] অব্যক্ত [অনুপলব্ধ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর]; অব্যক্তে [প্রধানে, মূল প্রকৃতিতে] নিধন [লয়] যাহাদের (শ্রী); পরিদেবনা—দুঃখপ্রলাপ (শ); শোক নিমিত্ত বিলাপ (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, ভূতসকল জন্মের পূর্বে ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে, জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, আবার মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া থাকে। অতএব যাহা অল্প সময়ের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় তাহার জন্য শোকের কি কারণ আছে ?

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে জীবের জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্ম হইবে—ইহা অবধারিত। মৃত্যুর পর জন্মের পূর্বে জীব কি অবস্থায় থাকে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত যে অবস্থা তাহাই জীবের ব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় জীব স্থূল পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান থাকে বলিয়া উহা আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর জীব ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—ইহাই জীবের মৃত্যু। এই অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে জীব পুনরায় ব্যক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়—ইহাই জীবের জন্ম। এই অবস্থায় জীব পুনরায় ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। এই প্রকারে জীব ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে পুনরায় ব্যক্ত—এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছে।

জীব যখন ব্যক্ত অবস্থায় স্থূল পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় তখনই উহার সহিত আমাদের বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। তখনই কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বন্ধু বলিয়া অভিহিত হয়। হে অর্জুন, তুমি যে স্বজনবর্গের নিমিত্ত শোক করিতেছ, তাহাদের সহিত তোমার কতদিনের সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ। জন্মের পূর্বেও ইঁহারা তোমার ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিলেন, আবার মৃত্যুর পরেও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেন। জীবিতকালের কয়দিনমাত্র তোমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। কাজেই ইঁহাদের জন্য শোকের আর কি কারণ আছে ?

এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর উপরোক্ত ভাবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] তাহার অর্থ হইল—অদর্শন হইতে আসিয়াছে, পুনরায় অদর্শনে গমন করিয়াছে। সে তোমার নয়, তুমিও তাহার নহ, বৃথা কেন ভাবনা ? আত্মা অবিনাশী, কাজেই সেইজন্য শোক করা উচিত নয়—একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। পাছে অর্জুন দেহের বিনাশের নিমিত্ত শোক করেন—এই আশঙ্কায় বলা হইল যে দেহের প্রকৃতি আলোচনা করিলেও শোকের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কেননা স্থূল দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং উহার সহিত সম্বন্ধও ক্ষণস্থায়ী। তারপর দেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। সুতরাং তাহার জন্য শোক কর্তব্য নহে। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভিন্নরূপ অর্থ করেন। তিনি বলেন যে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ প্রধান বা মূলপ্রকৃতি। প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণ সমভাবে থাকে তখন সৃষ্টি থাকে না। এই অবস্থাকেই মূল প্রকৃতি বলে। প্রকৃতির গুণ-বিক্ষোভ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তৎপর সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে। প্রলয়ে সৃষ্টির অবসান হইলে উহা আবার মূলপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। এই প্রকার সৃষ্টি এবং লয় বার বার ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিতে ভূতগণ একবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, পুনরায় প্রলয়ে ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তে লীন হয়। ইহাই ভৌতিক দেহের পরিণাম, ইহার জন্য আবার শোক কি ?

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

অন্বয় ঃ কশ্চিৎ (কেহ) এনং (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (আশ্চর্য বস্তু বলিয়া দেখেন) তথা এব চ (তদ্রূপ) অন্যঃ (অপর লোক) আশ্চর্যবৎ বদতি (আশ্চর্য বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন) অন্যঃ চ (অন্য কেহ) এনং (ইহাকে) আশ্চর্যবৎ শৃণোতি (আশ্চর্য বস্তু বলিয়া অপরের নিকট শ্রবণ করেন) শ্রুত্বা অপি (শ্রবণ করিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানেন না)।

শব্দার্থ ঃ কশ্চিৎ—কোনও সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি (ম); তপস্যা দ্বারা ক্ষীণপাপ উপচিতপুণ্য পুরুষ (রা)। আশ্চর্যবৎ—অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত অকস্মাৎ দৃশ্যমান বস্তুর ন্যায় (শ), আশ্চর্যান্বিত বিস্মিত লোকের ন্যায়। পশ্যতি—দেখিতে পান, শ্রবণ মননান্তর ধ্যানযোগে দর্শন করেন। এনং শ্রুত্বা অপি—ইহার কথা শুনিয়াও; শ্রবণ, মনন এবং ধ্যানযোগে সাক্ষাৎ করিয়াও (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ আত্মতত্ত্ব এইরূপ দুর্বোধ্য যে আত্মাকে যিনি দেখিয়াছেন তিনি ইহাকে আশ্চর্য কিছু বলিয়াই দেখেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান, আত্মবিষয়ক বক্তা ইহাকে আশ্চর্য কিছু বলিয়াই বিস্মিতের ন্যায় বর্ণনা করেন, আত্মবিষয়ক শ্রোতা ইহাকে আশ্চর্য কিছু বলিয়াই বিস্মিতের ন্যায় শুনিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মাকে দেখিয়া, বলিয়া বা শুনিয়াও কেহই ইহাকে সম্যক্ জানিতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ এ পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে আত্মার স্বরূপ জানিতে না পারিয়াই অজ্ঞ লোক শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার স্বরূপ লোকে জানিতে পারে না কেন ? কেন এই সংসারে জীব আত্মাকে উপলব্ধি করিতে

১ অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥

চেষ্টা না করিয়া চিরজীবন কেবল শোকদুঃখই ভোগ করিয়া থাকে ? তাহারই কারণ এই শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে।

আত্মা আশ্চর্যবৎ। জাগতিক কোন পদার্থের সহিতই আত্মার সাদৃশ্য নাই। এজন্য আত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইঁহা মনেরও ধারণার অতীত, বাক্য দ্বারাও ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। আত্মার এই আশ্চর্য স্বরূপ শ্রুতির বহু বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। যথাঃ আত্মা অণু হইতেও অণু, মহান হইতেও মহান।[1] তিনি চলেন, চলেনও না ; তিনিই নিকটে, তিনিই দূরে।[2] তিনি ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র, অধর্ম হইতে স্বতন্ত্র ; এই কার্য-কারণরূপ জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান হইতেও স্বতন্ত্র।[3] পরস্পরবিরোধী গুণসমূহ আত্মাতে অবস্থিত। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—ইনি বাক্য ও মনের অগোচর।[4] এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতেই বুঝা যায় আত্মা কিরূপ অদ্ভুত আশ্চর্যময় বস্তু। অজ্ঞ ব্যক্তি এই আশ্চর্যময় আত্মার বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সে দেহকেই আত্মা মনে করে। এই জগতের মূলে যে আত্মা আছে তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না। দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার নিয়াই তাহার কারবার। ইহার অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা সে স্বীকার করে না। কাজেই আত্মার বিষয় শুনিবার বা জানিবার নিমিত্ত তাহার কোন ইচ্ছা জন্মে না। অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আত্মা অন্ধকারময়, অস্তিত্বহীন, অসৎ পদার্থ। কিন্তু যখন কোনরূপ সুকৃতিসম্পন্ন ভাগ্যবান ব্যক্তির চিত্তে আত্মাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তখন তিনি আত্মার বিষয় শুনিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু গুরুর নিকট আত্মার বিষয় শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া যান। তাহার মনে হয় 'আহা কি শুনিলাম, একথা ত পূর্বে কখনও শুনি নাই !' গুরুবাক্য শ্রবণান্তর আত্মার মনন করিয়া ধ্যানযোগে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয় তখন বিস্ময়ের সহিত তিনি আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মদর্শনের পর যদি অপরের নিকট আত্মার কথা বলিতে হয় তখনও বিস্মিতের ন্যায়ই তিনি আত্মার কথা বলিয়া থাকেন।

আত্মার শ্রোতা, দ্রষ্টা ও বক্তা সুদুর্লভ। সহস্র লোকের মধ্যে হয়ত একজনের আত্মার কথা শুনিতে আগ্রহ জন্মে। আত্মার কথা শুনিবার অধিকারীও দুর্লভ। কারণ সাধন-সম্পন্ন নির্মলচিত্ত লোক ব্যতীত অপরে আত্মার কথা শুনিবার অধিকারী নহেন। আত্মার দ্রষ্টা আরও দুর্লভ। যাঁহারা আত্মার কথা শুনিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মার দর্শন লাভ করেন। আত্মার বক্তাও সুদুর্লভ, যাঁহারা আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই আত্মার কথা বলিয়া থাকেন বা বলিতে পারেন। আত্মার শ্রোতা, দ্রষ্টা ও বক্তা যেমন সুদুর্লভ তেমনি উহারা অদ্ভুত লোক। ইহাদের সহিত অজ্ঞ জীবের কোনও সাদৃশ্য নাই। অজ্ঞ লোকের যাহাতে আসক্তি ইহাদের তাহাতেই বিরক্তি, অজ্ঞলোকে যেভাবে জীবনযাপন করে উহাদের জীবন তাহার বিপরীত। উহাদের এই অদ্ভুত বিপরীত আচরণ দেখিয়া সাধারণ লোকে উহাদিগকে আশ্চর্য প্রাগল বলিয়া মনে করে। কিন্তু আত্মার কথা শুনিয়া, আত্মাকে দেখিয়া বা আত্মার কথা বলিয়াও কেহ আত্মার স্বরূপ সম্যক

১ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ।। শ্বেতাশ্বতর ৩।২০

২ তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে ।। ঈশ ৫

৩ অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ।। কঠ ১।২।১৪

৪ যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।। তৈত্তিরীয় ২।৪

উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। কারণ অনন্ত, অপার, নিরাকার, নির্বিকার, অণু হইতে অণু, মহান হইতে মহান আত্মার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হওয়া মানব মনের অসাধ্য।

কঠোপনিষদের অনুরূপ একটি শ্লোকের ভাব গীতার এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।[1] তাহার অর্থ—অনেকে যাঁহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না অর্থাৎ অনেকের পক্ষে যাঁহার উপদেশ পাওয়াও সুদুর্লভ, যাঁহাকে শ্রবণ করিয়াও অনেকে বলিতে পারে না, তাঁহার বক্তা সুদুর্লভ। নিপুণ ব্যক্তিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন, নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

অন্বয়ঃ ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য দেহে (সকল প্রাণিজাতের দেহে) অয়ং দেহী (এই আত্মা) নিত্যম্ অবধ্যঃ (নিত্য অবধ্য) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (ভূতসকলের নিমিত্ত) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিতে পার না)।

শব্দার্থঃ অয়ং দেহী—এই শরীরী আত্মা (শ); লিঙ্গদেহোপাধি আত্মা (ম)। নিত্যম্—নিয়ত, সকল সময়ে (ম); সকল অবস্থাতে (শ)। সর্বাণি ভূতানি—স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীজাত (শ); স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ভূত (ম)।

শ্লোকার্থঃ নিখিল প্রাণীজাতের দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে কখনও বা কোন অবস্থাতেই বধ করা যাইতে পারে না। কাজেই কোন প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যাঃ এপর্যন্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এই শ্লোকে তাহার উপসংহার করা হইল। উপরোক্ত শ্লোকের মর্ম এই—জগতে অতিকায় হস্তী হইতে চক্ষুর অগোচর কীটানুকীট পর্যন্ত বিবিধ দেহধারী যে সকল জীব দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের দেহ বিভিন্ন হইলেও অন্তরস্থ আত্মা এক। ইহাদের দেহ হত হইলেও দেহাশ্রয়ী আত্মা অবধ্য। সুতরাং কোন জীবের নিমিত্তই শোক করা কর্তব্য নহে। অর্জুন ভীষ্মদ্রোণাদি স্বজনবর্গের মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক করিতেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ভীষ্মদ্রোণাদি মহাপুরুষগণই যে কেবল অশোচ্য তাহা নহে, জগতের সামান্য কীটানুকীটও অশোচ্য। যে আত্মা ভীষ্মাদির শরীর আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে কীটানুকীটের দেহেও সেই আত্মারই প্রকাশ। কাজেই দেহ মন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা থাকিলেও আত্মস্বরূপে ভীষ্ম এবং কীটানুকীট সকলেই এক। সুতরাং সকলের আত্মাই যখন অবধ্য, তখন স্বজন হউক পরজন হউক, শত্রু হউক মিত্র হউক, মানুষ হউক কি কীটানুকীট হউক, স্থাবর হউক জঙ্গম হউক—কাহারও মৃত্যুতেই শোক করা কর্তব্য নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে ভীষ্মাদি রাজন্যবৃন্দ অশোচ্য, কারণ তাঁহারা জন্মের পূর্বেও ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও থাকিবেন।[2] বিশেষতঃ মৃত্যুর পরে তাঁহারা উৎকৃষ্ট দেহই প্রাপ্ত হইবেন। এই কথায় পাছে অর্জুন মনে করেন যে কেবল ভীষ্মাদি রাজন্য-

১ শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ।। ১।২।৭

২ এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বর্গকেই অশোচ্য বলা হইয়াছে এই আশঙ্কায় বলা হইল—তাহা নহে। জীব যতই ক্ষুদ্র এবং সামান্য হউক তদাশ্রয়ী আত্মা সর্বদা সকল সময়েই অবধ্য, সুতরাং জীবমাত্রই অশোচ্য। যাহা পূর্বে বিশেষ ক্ষেত্রে বলা হইয়াছিল তাহাই এই শ্লোকে সাধারণ ভাবে বলা হইল।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

অন্বয়ঃ স্বধর্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য (স্বধর্মের দিকেও দেখিয়া) বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি (কাঁপিয়া উঠা তোমার উচিত নহে) হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্মযুদ্ধ হইতে) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে (অন্য শ্রেয় নাই)।

শব্দার্থঃ স্বধর্মম্—স্বীয় বর্ণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ (শ)। অবেক্ষ্য—দেখিয়া, শাস্ত্রতঃ আলোচনা করিয়া (ম)। বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি—বিচলিত হওয়া কর্তব্য নহে। ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ—ন্যায়তঃ প্রবৃত্ত যুদ্ধ হইতে (শ্রী), স্বাভাবিক ধর্মযুদ্ধ হইতে; ধর্মার্থ প্রজারক্ষণার্থ যে যুদ্ধ তাহাই ধর্মযুদ্ধ (শ)। শ্রেয়ঃ—শ্রেয়ঃসাধন (ম), পুরুষার্থ।

শ্লোকার্থঃ স্বীয় বর্ণধর্মের বিষয় বিবেচনা করিলেও স্বজনবধ-জনিত পাপের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠা তোমার উচিত নহে। কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেয় আর কিছুই নাই।

ব্যাখ্যাঃ প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সম্মুখস্থ স্বজনগণের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোকে দুঃখে এবং পাপের ভয়ে অর্জুন কাঁপিতেছিলেন (বেপথুশ্চ শরীরে মে)। শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝাইলেন যে আত্মার স্বরূপ অবগত হইলে অর্জুনের শোকের কোনও কারণ থাকিবে না। এখানে বলিতেছেন—হে অর্জুন, তোমার স্বধর্মের বিষয় যদি আলোচনা কর তাহা হইলেও শোকে দুঃখে বা পাপের ভয়ে তোমার কাঁপিয়া বা শিহরিয়া উঠা কর্তব্য নহে। কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম এবং এই স্বধর্ম পালন করিলেই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহার অপর কোন শ্রেয় নাই।

এক্ষণে স্বধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাই দ্রষ্টব্য। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এই তিন গুণের ক্রিয়াতেই জগতের সৃষ্টি। কিন্তু কোথাও এই তিন গুণ সমভাবে দৃষ্ট হয় না। গুণবৈষম্যই সৃষ্টির মূল। মানব-প্রকৃতিও এই তিন গুণের সমবায়েই গঠিত। কিন্তু কোন মানুষেই গুণসকল সমভাবে থাকে না—কোনও গুণের আধিক্য ঘটে। এই গুণবৈষম্য অনুসারে মানব-প্রকৃতি চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান তাহার নাম ব্রাহ্মণপ্রকৃতি, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতির নাম ক্ষত্রিয়প্রকৃতি, তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতি বৈশ্যপ্রকৃতি এবং রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান প্রকৃতির নাম শূদ্রপ্রকৃতি। কোনও বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত লোককে বর্ণ বলে। ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সমস্ত লোক ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সমস্ত লোক ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য-প্রকৃতির লোকেরা বৈশ্যবর্ণ এবং শূদ্র প্রকৃতির লোকেরা শূদ্রবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। মানুষের কর্মও তাহার প্রকৃতি অনুসারেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম প্রকৃতির অনুকূল হইলেই তাহা ব্যক্তি ও সমাজের হিতকর হয়।

প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি এবং তদনুযায়ী কর্মই তাহার স্বধর্ম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্বধর্ম কি তাহা পরে বলা হইবে, এস্থলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মের কথাই বলা হইতেছে।

ক্ষত্রিয়স্বভাব সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান বলিয়া উহাতে শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, দান, ঈশ্বরভাব প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়। এই সকল গুণের অধিকারী বলিয়া রাজ্যশাসন ও রক্ষা, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন, সমাজে শান্তিস্থাপন প্রভৃতি গুরুতর কার্যের ভার ক্ষত্রিয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে রাজ্যরক্ষা, দুষ্টের দমন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিতে হইলে যুদ্ধ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। যুদ্ধ বলিতে যে সৈন্য সমাবেশপূর্বক অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপই বুঝায় তাহা নহে; দুষ্টকে, অন্যায়কারীকে স্বয়ং বা অপরের সাহায্যে শারীরিক বলে পরাভূত করিয়া তাহার দমন বা শাসনকেই যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের সহিত হইতে পারে অথবা কোনও জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের সহিতও হইতে পারে, একজন লোকের বিরুদ্ধে হইতে পারে অথবা একত্রিত বহুলোকের বিরুদ্ধেও হইতে পারে, আভ্যন্তরীণ শত্রুর সহিত হইতে পারে অথবা বৈদেশিক শত্রুর সহিতও হইতে পারে।

দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনার্থ, ধর্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ যখন এই যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তখন সেই যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা বা নিবৃত্ত না হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। কিন্তু যুদ্ধ ধর্মসঙ্গত হওয়া চাই। ধর্মসঙ্গত যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য; অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য নহে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, আত্মরক্ষা, বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য প্রভৃতি কার্যের জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাহাই ধর্মযুদ্ধ; পক্ষান্তরে জিগীষা, জিঘাংসা, অর্থ ও যশের আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থসাধন, অপরের উৎপীড়ন, পরস্বাপহরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ করা হয় তাহা অধর্মযুদ্ধ। তাহাছাড়া যুদ্ধের কতকগুলি শাস্ত্রীয় বিধি আছে তাহা অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ করিলেও তাহা অধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। যুদ্ধের শাস্ত্রীয় বিধি এই—"যুদ্ধক্ষেত্রস্থ শত্রুকে কুটিল অস্ত্রদ্বারা, প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা, কর্ণিদ্বারা হনন করিবে না। স্থলারূঢ়, ক্লীব, কৃতাঞ্জলি, আসনভ্রষ্ট, 'আমি তোমারই' এইরূপ বাক্যরত, নিদ্রিত, ভ্রষ্ট, উলঙ্গ, অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বধ করিবে না। যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছে বা অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় নাই এবং ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও কাতর হইয়াছে বা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, সজ্জনের ধর্ম স্মরণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না।" ক্ষত্রিয় অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হইলে পাপী বলিয়া গণ্য হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় সাধনের নিমিত্তই এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

যুদ্ধ করিতে হইলে রক্তপাত, নরহত্যাদি কার্য অনেক স্থলেই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। নরহত্যা বা রক্তপাতের ভয়ে ক্ষত্রিয়ের শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। এমন কি স্বজন যদি অন্যায়কারী হয়, কি অন্যায়কারীর পক্ষে যোগদান করে এবং ধর্মরক্ষার্থ যদি যুদ্ধে ঐ স্বজনকে বধ করিতে হয় তবে তাহাও ক্ষত্রিয়কে নির্মম হৃদয়ে করিতে হইবে। মমতার বশে সেই কর্তব্য হইতে বিচলিত হইলে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। স্বধর্মপালন দ্বারা যে কেবল সমাজেরই হিত হইয়া থাকে তাহা নহে, তাহা দ্বারা ব্যক্তিরও শ্রেয়োলাভ হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থ লাভই মানবের শ্রেয়ঃসাধন। তন্মধ্যে মোক্ষই পরম শ্রেয়। স্বধর্মপালন দ্বারা যে কেবল অর্থ, কাম ও ধর্মলাভ হয় তাহা নহে মুমুক্ষু মানুষও স্বধর্মপালন দ্বারাই মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—কাজেই ধর্মযুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেয় অর্থাৎ সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়। ইহা ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোনও শ্রেয় নাই। অর্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রেয় কি (যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে), ভগবান এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন। ধর্মযুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র শ্রেয়; এতদ্ব্যতীত আর কোনও শ্রেয় নাই।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্‌ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই) যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্‌ (অপ্রার্থিতরূপে উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্‌ (মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায়) ঈদৃশং যুদ্ধম্‌ (এই প্রকারের যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন) ।

শব্দার্থ ঃ যদৃচ্ছয়া—বিনা যত্নে, অপ্রার্থিতরূপে (শ)। উপপন্নম্‌—উপস্থিত, আগত, প্রাপ্ত (শ্রী)। অপাবৃতম্‌—উদ্‌ঘাটিত (শ); অনিবারণ (শ্রী); অপগতাবরণ (বি)। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে—সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরা লাভ করেন, অথবা যে সকল ক্ষত্রিয় লাভ করেন তাঁহারাই সুখী (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, বিনা প্রার্থনায় আপনা হইতে উপস্থিত মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় অর্থাৎ অনায়াসে স্বর্গলাভের হেতুস্বরূপ এইরূপ নিরতিশয় সুখের উপায়ভূত যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোনও শ্রেয় নাই অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে ; এই শ্লোকে তন্মধ্যে ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য এবং তজ্জনিত স্বর্গলাভের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হও নাই, তোমার কোন অন্যায় কার্যের দরুনও এই যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। এমন কি, এই যুদ্ধ তুমি প্রার্থনাও কর নাই, বরং ইহা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিয়াছ। দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধির ফলেই এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের ফলে ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় হইবে, কাজেই ইহা ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধে যাঁহারা ধর্মের পক্ষে থাকিবেন তাঁহাদের স্বর্গলাভ নিশ্চিত। সুতরাং এই যুদ্ধের দ্বারা তোমার নিকট স্বর্গের দ্বার যেন আপনা হইতেই খুলিয়া গিয়াছে। নিতান্ত সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই এরূপ অপ্রার্থিত ধর্মযুদ্ধ করিবার সুযোগ পায়। ক্ষত্রিয় হইলেই যে সকলের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ করিবার সুযোগ ঘটে তাহা নহে। কত ক্ষত্রিয় বিশেষ প্রার্থনা করিয়াও ধর্মযুদ্ধ করিবার এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গলাভের সুযোগ পায় না, আর তুমি কি না আপনা হইতে উপস্থিত সাক্ষাৎ স্বর্গলাভের সুযোগ পরিত্যাগ করিতেছ—ইহা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

অন্বয় ঃ অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্‌ (তুমি) ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামম্‌ (এই ধর্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা (স্বধর্ম এবং কীর্তি ত্যাগ করিয়া) পাপম্‌ অবাপ্স্যসি (পাপকে প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ ঃ অথ চেৎ—আর যদি, পক্ষান্তরে যদি (ম)। ধর্ম্যম্‌—ধর্মবিহিত ক্ষত্রিয়ের, ধর্মভূত। ন করিষ্যসি—পাপের আশঙ্কায় বা লোকনিন্দার ভয়ে যদি যুদ্ধ না কর। ততঃ—তাহা হইলে, ধর্মবিহিত যুদ্ধ না করার ফলে।

শ্লোকার্থ ঃ পক্ষান্তরে যদি তুমি ধর্মসঙ্গত এই আরব্ধ যুদ্ধ হইতে বিরত হও তাহা হইলে তুমি স্বধর্ম হইতে চ্যুত হইবে এবং তুমি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে কীর্তি

অর্জন করিয়াছ এবং এই যুদ্ধে যে কীর্তি অর্জন করিবে তাহাও তুমি হারাইবে। এরূপে স্বধর্ম এবং কীর্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপভাগী হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই যুদ্ধ করিলে পুণ্যার্জন হইবে এবং সেইহেতু স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত। যুদ্ধ না করিলে কি অনিষ্ট হইবে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে স্বধর্মত্যাগের জন্য পাপ হইবে এবং পাপের ফলও ভোগ করিতে হইবে। এস্থলে পাপ-পুণ্যের একটা মূল সূত্র পাওয়া যাইতেছে। পাপ কাহাকে বলে ? যাহাতে আত্মার অকল্যাণ হয়, সমাজের অহিত হয় তাহাই পাপ। আত্মার নিঃশ্রেয়স্‌ (মোক্ষ) এবং জগতের অভ্যুদয়সাধন—ইহাই মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই পাপ। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রে মানবের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষই স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের কোন না কোনও বর্ণের অন্তর্গত। প্রত্যেক বর্ণের কতকগুলি কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। স্বীয় বর্ণ বা প্রকৃতি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনই মানুষের স্বধর্ম। এই স্বধর্মোচিত কর্ম করিলেই একদিকে যেমন তাহার পুণ্যলাভ হইবে, আত্মার কল্যাণ হইবে, অপরদিকে জগতের অভ্যুদয় হইবে। পক্ষান্তরে স্বধর্মোচিত কর্তব্য ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিলে আত্মার অকল্যাণ হইবে, সমাজের অহিত হইবে ; কাজেই উহা পাপ।

অর্জুন ক্ষত্রিয় ; সুতরাং যাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাহাই অর্জুনের স্বধর্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি ? ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা, অত্যাচারী ও দুর্বৃত্তের দমন করিয়া সমাজে শান্তিস্থাপন—প্রয়োজন হইলে এই ধর্মপালনের নিমিত্ত যুদ্ধ করা এবং নিশ্চিত মরণ জানিয়াও যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা। ইহাই হইল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যখন দুর্বৃত্তের দমন ও দুর্বলের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান আসিবে তখন সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়া ক্ষত্রিয় যদি আত্মীয়-স্বজনের মমতায়, নরহত্যার আশঙ্কায়, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম-যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় তবে কর্তব্য লঙ্ঘনের দরুন সে পাপী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যুদ্ধ ধর্মসঙ্গত হওয়া চাই। ধর্মের বৃদ্ধি অধর্মের ক্ষয়সাধন যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য তাহাই ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেই পাপ জন্মে ; অধর্মযুদ্ধ ত্যাগ পাপ নহে। ধর্মযুদ্ধ ত্যাগ করিলে কেন পাপ হইবে তাহা বোঝা গেল, কিন্তু কীর্তি ত্যাগ করিলে কেন পাপ হইবে তাহাও বোঝা দরকার। মানুষ সংকার্য সম্পাদন এবং স্বধর্ম পালন দ্বারাই কীর্তি অর্জন করিয়া থাকে ; কাজেই ধর্মের এবং কীর্তির একই পথ। যাহাতে ধর্মের বৃদ্ধি হয় তাহাতে কীর্তিও অর্জিত হইয়া থাকে। অর্জুন এপর্যন্ত বহুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ করিয়া বিপুল কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সেই কীর্তি আরও বর্ধিত হইবে। এখন এই কীর্তিকে ত্যাগ করিলে ধর্মকেই ত্যাগ করা হইল। সুতরাং উহাতে পাপই জন্মিবে। অর্জুন বলিয়াছেন—যুদ্ধ করিলে তাঁহার পাপ হইবে (পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌)। তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যুদ্ধ না করাই পাপ।

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্‌ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

অন্বয় ঃ অপি চ (আরও) ভূতানি (লোকসকল) তে অব্যয়াম্‌ অকীর্তিম্‌ (তোমার চিরকালব্যাপী অযশ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে) সম্ভাবিতস্য অকীর্তিঃ (সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি) মরণাৎ চ অতিরিচ্যতে (মরণাপেক্ষাও অধিক হয়)।

শব্দার্থ ঃ ভূতানি—ভূতসকল, এইস্থলে দেব মনুষ্যাদি সমস্ত লোক (ম)। অব্যয়াম্—অবিনাশী, অক্ষয়, সর্বদেশকালব্যাপী (রা); দীর্ঘকালব্যাপী (ম)। অকীর্তিম্—অখ্যাতি, অপযশ ; অর্জুন যুদ্ধে পলায়িত, সুতরাং ভীরু ঃ এইরূপ অখ্যাতি (রা) ; অর্জুন ধর্মাত্মা নয়, বীর নয় ঃ এপ্রকার অখ্যাতি (ম)। সম্ভাবিতস্য —সম্মানিত, বহুমত (শ্রী) অতিপ্রতিষ্ঠিত (ব) ব্যক্তির। মরণাৎ অতিরিচ্যতে— মরণাপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশপ্রদ হয় ; এইরূপ অকীর্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয় (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ আরও দেখ, লোকসকল (দেব ঋষি মনুষ্যাদি) চিরকাল ব্যাপিয়া তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশপ্রদ।

ব্যাখ্যা ঃ তারপর এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে তুমি যে স্বধর্মত্যাগের জন্য পাপী হইয়া কেবল স্বর্গাদি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, ইহকালেই তোমাকে দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। কারণ দেব ঋষি মনুষ্যাদি সমস্ত লোক তোমার অযশ ঘোষণা করিবে। তুমি এতকাল শৌর্যবীর্য প্রদর্শনপূর্বক লোকের নিকট যে সম্মানলাভ করিয়াছ তাহা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অখ্যাতনামা লোকের অপযশ হইলে সে তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সম্মানিত লোকের অযশ মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক কষ্টপ্রদ। কাজেই তোমার অখ্যাতি ঘোষিত হইলে তাহা তোমার নিকট মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখকর হইবে। তোমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে এবং তোমার হয়ত মনে হইবে যে এই অখ্যাত জীবনধারণ করা অপেক্ষা মরণও ভাল ছিল।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অন্বয় ঃ মহারথাঃ (মহারথিগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ (ভয় হেতু যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবে) যেষাং বহুমতঃ ভূত্বা (যাহাদের মাননীয় হইয়াও) ত্বং লাঘবং যাস্যসি (তুমি এক্ষণে লঘুতা প্রাপ্ত হইবে)।

শব্দার্থ ঃ মহারথাঃ—কর্ণদুর্যোধনাদি মহারথগণ। বহুমতঃ—বহুগুণের অধিকারী বলিয়া সম্মানিত ; বহু-সম্মানভাজন। লাঘবম্—লঘুতা, ক্ষুদ্রত্ব, অনাদরের বিষয়ত্ব।

শ্লোকার্থ ঃ কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ মনে করিবে তুমি তাহাদের ভয় হেতুই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। তুমি বহুগুণযুক্ত হওয়াতে এতদিন যাহাদের সম্মানভাজন ছিলে, এখন তাহাদের নিকটই তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তাহারাই তোমাকে তুচ্ছ ও বীর্যহীন বলিয়া মনে করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে অর্জুন সর্বসাধারণের নিন্দাভাজন হইবেন। কর্ণ দুর্যোধনাদি মহারথগণের মনে কি ভাব হইবে এই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, কর্ণ দুর্যোধনাদি মহারথগণ মনে করিবেন তুমি তাঁহাদের ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। তুমি যে স্বজনগণের প্রতি স্নেহবশতঃ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছ একথা শত্রুপক্ষীয় বীরগণ মোটেই বুঝিবেন না। এতকাল তুমি তাঁহাদের সম্মানের পাত্র ছিলে, কারণ বহু যুদ্ধে তাঁহারা তোমার শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাইয়াছেন। যুদ্ধ ত্যাগ করিলে তাঁহারা তোমাকে ভীরু সুতরাং তুচ্ছ বলিয়া অনাদর করিবেন। সাধারণ লোকের নিন্দা বরং সহ্য হয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিগণের উপেক্ষা অসহনীয়। তারপর যাহারা জীবনে কখনও সম্মান ভোগ

করে নাই তাহাদের পক্ষে অপমান সহ্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তুমি পূর্বে বহু সম্মান লাভ করিয়া যদি এখন উহা হারাও তবে তাহা নিশ্চয়ই দারুণ দুঃখের কারণ হইবে।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

অন্বয় ঃ তব অহিতাঃ (তোমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ (তোমার শক্তির নিন্দা করিয়া) বহূন্ অবাচ্যবাদান্ চ বদিষ্যন্তি (অনেক অবক্তব্য কথাও বলিবে) ততঃ (তাহা হইতে) দুঃখতরং নু কিম্ (অধিকতর দুঃখপ্রদ আর কি আছে)।

শব্দার্থঃ অবাচ্যবাদান্—বলিবার অযোগ্য কথাসকল (নী) ; ক্লীব ইত্যাদি কটূক্তি। বদিষ্যন্তি – কীর্তন করিবে, সর্বত্র বলিয়া বেড়াইবে।

শ্লোকার্থ ঃ তোমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শত্রুগণ তোমার শৌর্য-বীর্যের কুৎসা করিয়া অনেক প্রকার অবক্তব্য কথাও বলিবে। এই প্রকার অযথা নিন্দার দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখ আর কি আছে ?

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, তোমার শত্রুগণ তোমার আকস্মিক যুদ্ধবিরতি দর্শন করিয়া কেবল যে তোমাকে লঘু বলিয়া মনে করিবে তাহা নহে, অধিকন্তু তোমার অযথা নিন্দাবাদ প্রচার করিবে। এমন সকল কথা বলিবে যাহা মুখে উচ্চারণ করা যায় না ; কারণ, তাহারা তোমার উপর ঈর্ষাপরায়ণ। কাজেই সত্য-মিথ্যা নানা রকমের কুৎসা প্রচার করিয়া তোমার শক্তিসামর্থ্যের নিন্দা করিতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করিবে না। এই সকল কথা শুনিয়া যে কেবল তোমার চিত্ত ব্যথিত হইবে তাহা নহে, আমাদের প্রাণেও কষ্ট হইবে। ইহা হইতে অধিকতর দুঃখপ্রদ কি হইতে পারে ? অতএব অযশ এবং অযথা নিন্দার দুঃখ হইতে যদি ত্রাণ পাইতে চাও, তবে তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

স্বজনগণকে বধ করিয়া রাজ্যসুখভোগ করিলেও তাহা দুঃখেরই হেতু হইবে—এই কথা বলিয়া অর্জুন স্বজনবধে বিরত হইয়াছিলেন।[১] তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে যুদ্ধ না করিলে তাহা অধিকতর দুঃখের কারণ হইবে। কারণ সম্মানিত কীর্তিমান ক্ষত্রিয়বীরের শক্তিসামর্থ্যের নিন্দা হইলে তদপেক্ষা তাহার অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে ? মানীর অপমান শিরশ্ছেদতুল্য, বীরের জীবনে ভীরুতার অপবাদ মৃত্যু অপেক্ষাও অসহনীয়।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

অন্বয় ঃ কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) হতঃ বা (হত হইলেও) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে) জিত্বা বা (জয়লাভ করিলেও) মহীং ভোক্ষ্যসে (পৃথিবী ভোগ করিবে) তস্মাৎ (সুতরাং) যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ)।

শব্দার্থ ঃ মহীম্—পৃথিবী, পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজত্ব। কৃতনিশ্চয়ঃ—কৃতসংকল্প ;

[১] এই অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

'শত্রু জয় করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব' ঃ এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। উত্তিষ্ঠ—উঠ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, এই ধর্মযুদ্ধে যদি হত হও তাহা হইলেও স্বর্গলাভ হইবে, আর যদি জয়লাভ কর তাহা হইলেও পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করিবে। অতএব শত্রু জয় করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব—এরূপ স্থির সংকল্প করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ব্যাখ্যা ঃ যুদ্ধ না করিলে কি দুঃখ হইবে পূর্বের কয়েকটি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। যুদ্ধ করিলে কি সুখ হইবে এই শ্লোকে তাহা বলা হইতেছে। যুদ্ধ করিয়া যদি জয়লাভ হয় তবে রাজ্যপ্রাপ্তি ; আর যদি মৃত্যু হয় তবে স্বর্গবাস হইবে। অতএব যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে প্রথমে মনে হইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন কাম্য কর্মের ফলভোগের লোভ দেখাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেছেন। ইহা গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের বিরোধী, বিশেষতঃ পরবর্তী শ্লোকের সহিত ইহার বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে কেহ কেহ এই শ্লোক এবং ইহার পূর্ববর্তী কয়েকটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। কারণ অর্জুন বলিয়াছেন যে যুদ্ধ করিয়া স্বজনবধ করিলে ইহলোকে তাহার দারুণ দুঃখ হইবে, পরলোকেও নরকবাস সুনিশ্চিত।[১] এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, সুখদুঃখের মাপকাঠি দ্বারা যদি এবিষয়ের বিচার করা যায় তাহা হইলেও তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য, কারণ যদি যুদ্ধ না কর তবে অকীর্তি ও শত্রুর নিন্দাজনিত দারুণ দুঃখ এ জীবনেই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং স্বধর্ম-ত্যাগ-জনিত পাপের ফলে পরলোকেও তোমার সুখ হইবে না। পক্ষান্তরে যদি যুদ্ধ কর তাহা হইলে হয় ইহলোকে রাজ্যলাভ অথবা পরলোকে স্বর্গবাস হইবে। কাজেই এই শ্লোকে অর্জুনের সুখদুঃখের আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তারপর এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে হয় রাজ্যলাভ নচেৎ স্বর্গলাভ হইবে। কিন্তু অর্জুনকে রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ করিতে বলা হয় নাই। স্বধর্মপালনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ হইবে তাহাও নির্দেশ করা হইয়াছে। আরও কথা এই যে স্বধর্মপালন দ্বারাই মানুষের পুরুষার্থ লাভ হয়। অর্জুন স্বধর্মোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার যে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি পুরুষার্থ লাভ হইবে এই শ্লোক পর্যন্ত তাহাই বলা হইল। পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহাও এই স্বধর্মপালনের দ্বারা পরিণামে কি প্রকারে লাভ করা যাইতে পারে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

> সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
> ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

অন্বয় ঃ সুখদুঃখে (সুখ এবং দুঃখ) সমে কৃত্বা (তুল্য জ্ঞান করিয়া) লাভালাভৌ (লাভ এবং অলাভ) জয়াজয়ৌ (জয় ও পরাজয়) [সমৌ কৃত্বা] (তুল্য জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তারপর) যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (যুদ্ধে নিযুক্ত হও) এবং (এই প্রকারে যুদ্ধ করিলে) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপকে প্রাপ্ত হইবে না)।

১ এই অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শব্দার্থ ঃ সমে কৃত্বা—বিবেক দ্বারা তুল্য বিবেচনা করিয়া (বি) ; তদ্বিষয়ে নির্বিকার-চিত্ত হইয়া, তাহাতে হর্ষবিষাদ না করিয়া (শ্রী)। ততঃ—তৎপর, 'ইহাই আমার স্বধর্ম' এরূপ মনে করিয়া।

শ্লোকার্থ ঃ সুখ এবং দুঃখ, রাজ্যলাভ এবং রাজ্যনাশ, যুদ্ধে জয় এবং পরাজয়—এই পরস্পর দ্বন্দ্বভাবকে তুল্য মনে করিয়া অর্থাৎ ইহাদের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এইরূপে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে তোমার কোনও পাপ হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যলাভ হইবে, আর মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে। কিন্তু ইহা শুনিয়া পাছে অর্জুন মনে করেন যে তাঁহাকে রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই যুদ্ধ করিতে বলা হইতেছে এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, যদিও যুদ্ধ করিলে রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ নিশ্চিত, তথাপি রাজ্য বা স্বর্গলাভের কামনায় তোমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছি না। ইহা অতি নিম্নাধিকারীর কার্য। তুমি নিম্নে নামিও না, আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কর। তুমি সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুল্য মনে করিয়া যুদ্ধ কর ; তাহা হইলে স্বজনবধের দরুন তোমাকে পাপ আশ্রয় করিবে (পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্) বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছ সেই পাপ তোমার হইবে না। কেন হইবে না বলিতেছি। কোন্ কার্য পাপ, কোন্ কার্য পুণ্য তাহা কেবল কর্মের ফল দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। কর্তার মনের ভাব বা অবস্থার দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। একই কার্য শুদ্ধ বুদ্ধিতে কৃত হইলে পুণ্য, আর অশুদ্ধ বুদ্ধিতে কৃত হইলে পাপ হয়। স্বজনবধ কোনও স্থলে পাপ, আবার কোনও স্থলে পাপ নয়। তুমি যদি জিগীষা-প্রণোদিত হইয়া লাভের আশায় অথবা নিজের বা অপরের সুখলাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজনের বধসাধন কর তবে তাহাতে পাপ হইবে, আর যদি কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বধর্ম পালনার্থ যুদ্ধ কর তবে তোমার পাপ হইবে না।

৩৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অর্জুন যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করেন তবে স্বধর্ম ও কীর্তিকে ত্যাগ করার হেতু তাঁহার পাপ হইবে। কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করা যেমন পাপ, গুরুজনের বধ করাও তেমনি পাপ। শাস্ত্রে গুরুবধ মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত আছে। উভয়ই যদি পাপ হয়, তবে যুদ্ধ করা কি না করা, ইহার কোন পথ অবলম্বনীয়—ইহাই অর্জুনের সমস্যা। এই শ্লোকে সেই সমস্যার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি যদি সুখ, জয় বা লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুজনদিগকে বধ কর তাহা হইলে তোমার পাপ হইতে পারে, কিন্তু তুমি যদি জয় পরাজয়, লাভ অলাভ, সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তুল্য মনে করিয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর, তবে গুরুজন-বধজনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই স্থলে ধর্মাধর্ম, কার্যাকার্য, পাপপুণ্যের একটা স্পষ্ট নীতি পাওয়া যাইতেছে। সেই নীতিটি এই—মানুষ যদি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্তব্যবোধে স্বধর্মোচিত কার্য করে তবে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না। মানুষের বুদ্ধি যখন কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত না হইয়া পরমেশ্বরে স্থিত হয় এবং সে যখন সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ অলাভকে তুল্য জ্ঞান করিয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করে তখন সে পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। কারণ প্রকৃতির খেলার মধ্যেই

পাপপুণ্যের বিরোধ, কিন্তু সাধক যখন প্রকৃতির খেলাকে অতিক্রম করিয়া আত্মাকে লাভ করেন এবং বুদ্ধি যখন আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া সম, শান্ত এবং এক হয় তখন তাঁহার পক্ষে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া যায়।[১] 'অতএব হে অর্জুন, তুমি যদি সুখদুঃখ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর তবে তোমার পাপ হইবে না।' এই ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত সমত্ববুদ্ধিযুক্ত স্বধর্মপালনই কর্মযোগ নামে অভিহিত এবং এই শ্লোকটিই কর্মযোগের মূল সূত্ররূপে প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। এই কর্মযোগ কি, উহার উৎকর্ষ এবং পরিণতি কোথায় এবং কিরূপে এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা বিস্তারিতভাবে পরে বিবৃত হইবে।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কথিত হইয়াছে) যোগে তু (কর্মযোগবিষয়ে) ইমাং শৃণু (এই বুদ্ধির কথা শোন) যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (যে বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইয়া) কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি (কর্মের বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে)।

শব্দার্থ ঃ সাংখ্যে—সম্যক্ খ্যাত [প্রকাশিত] হয় বস্তুতত্ত্ব ইহা দ্বারা ইতি সংখ্যা [সম্যক্ জ্ঞান, উপনিষৎ], তাহাতে প্রকাশিত হয় যে আত্মজ্ঞান তাহাই সাংখ্য তাহাতে (শ্রী) ; পরমার্থবস্তু-বিবেক-বিষয়ে (শ)। আত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান তাহার নাম সাংখ্যজ্ঞান। কপিলদর্শনে বস্তুতত্ত্বের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া উহার নাম সাংখ্যদর্শন, বেদান্তে আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে বলিয়া উহাও সাংখ্য। কিন্তু এস্থলে কোনও বিশেষ শাস্ত্র বা দর্শনকে না বুঝাইয়া 'সাংখ্য' শব্দে সাধারণভাবে আত্মতত্ত্বের জ্ঞানকে বুঝাইতেছে।

বুদ্ধি—জ্ঞান, সাক্ষাৎ শোকমোহাদি দোষনিবৃত্তিকারক জ্ঞান (ম)। সর্বানর্থ—নিবৃত্তিকারণ জ্ঞান (ম)। যোগে তু—আত্মজ্ঞানপূর্বক মোক্ষসাধনভূত কর্মানুষ্ঠানে (রা) ; নিষ্কাম কর্মযোগে, আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কর্মযোগে (ম) ; আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ দ্বন্দ্বরহিত নিঃসঙ্গ ঈশ্বরারাধনার্থ কর্মযোগে (শ)। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—যে যোগবিষয়া বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইয়া (শ) ; যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা কর্মে যুক্ত হইয়া (ম)। কর্মবন্ধম্—কর্মজনিত সংসারবন্ধন, কর্মের ফলাফলভোগ, কর্মনিমিত্ত জ্ঞানপ্রতিবন্ধ (ম)। প্রহাস্যসি—প্রকৃষ্টরূপে সম্যক্ ত্যাগ করিতে পারিবে, ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা সম্যক্ ত্যাগ করিতে পারিবে (শ) ; ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা কর্মাত্মক বন্ধন ত্যাগ করিবে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, তোমাকে এ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ববিষয়ক সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছি। এখন নিষ্কাম কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। এই কর্মযোগের জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে তুমি কর্মের বন্ধন অর্থাৎ কর্মের ফলাফল ভোগ এবং তজ্জনিত জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ বস্তুতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান তাহারই সাধারণ নাম সাংখ্য। আত্মতত্ত্ব

১ এই অধ্যায়ের ৫০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিষয়ে যে বুদ্ধি তাহাই সাংখ্যবুদ্ধি। এই সাংখ্যবুদ্ধি দ্বারা মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে আত্মতত্ত্ব বা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের বিচার। সাংখ্যমতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমে স্বধর্মোচিত নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার পর কর্মত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্বের বিচারদ্বারা 'আমি দেহ নহি, আমি আত্মা, আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন'—এই জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এই জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই মুক্তি হয়। গীতার এই অধ্যায়ের ১১শ হইতে ৩০শ শ্লোক পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ বোঝান হইয়াছে। আত্মা সর্বব্যাপী, অবিনাশী, অব্যয়—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন—আত্মার কর্তৃত্ব কর্মত্ব কিছুই নাই ইত্যাদি আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মতত্ত্ব বিচারের পূর্বে স্বধর্মোচিত কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিতে হয়। ৩১ হইতে ৩৮শ শ্লোক পর্যন্ত তাহাও বোঝান হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রথমাবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম আবশ্যক হইলেও পরিণামে কর্মত্যাগ করিতেই হইবে। কারণ এইমতে কর্মদ্বারা মুক্তি হয় না, কর্ম বন্ধনেরই কারণ। কর্মদ্বারা প্রাণিগণ বদ্ধ হয়, জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হয়, এই কারণে পারদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না।[১]

তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে কর্ম যদি বন্ধনেরই কারণ হয়, মুক্তিলাভের নিমিত্ত কর্মত্যাগ করাই যদি আবশ্যক হয় তবে অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা হইতেছে কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, সাংখ্যমতেও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্বধর্মোচিত কর্ম (ধর্মযুদ্ধ) করা আবশ্যক, একথা তোমাকে বলিয়াছি। এপর্যন্ত সাংখ্যবুদ্ধির কথা তোমাকে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। এখন যোগবুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনামূলক নিষ্কাম কর্মযোগের বুদ্ধি তোমাকে বলিতেছি। এই বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে সেই কর্ম তোমার সংসারবন্ধনের হেতু না হইয়া তোমার মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে। এই প্রকার কর্মের ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না—এই কর্মই তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে—তুমি অনাময় পদ প্রাপ্ত হইবে।[২]

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

অন্বয় ঃ ইহ (ইহাতে, এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি (আরম্ভের নাশ নাই) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (কোন পাতক হয় না) অস্য ধর্মস্য স্বল্পম্ অপি (এই ধর্মের অল্পমাত্রও) মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে (মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে)।

শব্দার্থ ঃ ইহ—এই নিষ্কাম কর্মযোগে (শ্রী) ; মোক্ষের পথস্বরূপ এই কর্মযোগে (শ)। অভিক্রমনাশঃ—প্রারম্ভের নাশ (শ), কর্মদ্বারা যে ফলের আকাঙ্ক্ষা করা যায় সেই ফলের নাশ। প্রত্যবায়ঃ—অঙ্গহানিনিবন্ধন বৈগুণ্য (ম), পাতক। অস্য ধর্মস্য—এই যোগধর্মের (শ) ; ঈশ্বরারাধনার্থ কর্মযোগের (শ্রী) ; কর্মযোগাখ্য স্বধর্মের (রা)। মহতঃ ভয়াৎ—জন্মমরণাদিলক্ষণ সংসারভয় হইতে (শ)। স্বল্পম্ অপি—যথাশক্তি ভগবদারাধনার্থ অনুষ্ঠিত কিঞ্চিৎও (ম) ; স্বল্পাংশও (রা)। ত্রায়তে—ভগবৎপ্রসাদ সম্পাদন দ্বারা রক্ষা করে।

শ্লোকার্থ ঃ আমি যে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলিতেছি তাহাতে কোনও কর্ম

১ কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥
২ এই অধ্যায়ের ৫১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

একবার আরম্ভ হইলে তাহার বিফলতা হয় না, অঙ্গহানিবশতঃ ইহাতে কোনপ্রকার বৈগুণ্য বা পাতকও হয় না। এই কর্মযোগাখ্য ধর্ম স্বল্প অনুষ্ঠিত হইলেও সংসারের মহাভয় হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে যোগবুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই কর্মযোগের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইবে। প্রথমেই বলা দরকার যে কর্ম দুই প্রকার —সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। পশু, বিত্ত স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত যে কর্ম করা যায় তাহাই সকাম কর্ম, পরন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম। গীতোক্ত কর্মযোগ বলিতে এই নিষ্কাম কর্মই বুঝায়। এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলিতে যাইয়া প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ কাম্য কর্ম হইতে নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ কোথায় তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

কাম্য কর্মের কতকগুলি ত্রুটি আছে, নিষ্কাম কর্মের তাহা নাই। কাম্য কর্মে কোন কোন স্থলে প্রারম্ভেই নাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম হইতে অভীষ্ট ফল না পাওয়া গেলে প্রারম্ভটি ব্যর্থ হইয়া যায়—যেমন কৃষি প্রভৃতি কর্ম। কৃষি-কার্যের উদ্দেশ্য শস্যলাভ, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়া বীজ-বপনাদি করিলেও অনেক সময় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কারণে শস্যপ্রাপ্তির বাধা ঘটে। কাজেই যে কার্য আরব্ধ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইয়া যায়। পুনরায় কর্মের আরম্ভ করিতে হয়। আবার এমন কতকগুলি কর্ম আছে যাহাতে কেবল যে আরব্ধ কার্য নষ্ট হয় তাহা নহে, অধিকন্তু প্রত্যবায় বা পাতক জন্মে—যেমন চিকিৎসাদি কার্য। চিকিৎসকের অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ রোগীর রোগবৃদ্ধি বা মৃত্যু হইলে তাহাতে যে কেবল আরব্ধ চিকিৎসা নিষ্ফল হয় তাহা নহে, অধিকন্তু চিকিৎসকের পাপ জন্মে। এইরূপ যজ্ঞাদি কার্য যদি বিধিমতে নিষ্পন্ন না হয় তাহাতে যে যজ্ঞের আরব্ধ কার্য নিষ্ফল হয় তাহা নহে, অধিকন্তু যজমানের প্রত্যবায় ঘটে। কামনা-বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে কার্য করা যায় তাহাতেই নিষ্ফলতা বা পাতকের আশঙ্কা থাকে কিন্তু পরমেশ্বরে বুদ্ধি স্থির করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন-পূর্বক যে কর্ম করা যায় তাহাতে নিষ্ফলতা বা প্রত্যবায়ের আশঙ্কা থাকে না। কারণ যেখানে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা আছে সেখানেই ফল না পাওয়া গেলে আরব্ধ কর্ম ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইয়া যায় অথবা অশুভ বাসনায়, অবিধিপূর্বক বা অমনোযোগের সহিত কর্ম কৃত হইলে প্রত্যবায় বা পাতক জন্মে। কিন্তু যেখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই সেখানে ব্যর্থতা বা নিষ্ফলতার কোনও প্রশ্নই হইতে পারে না। তারপর বুদ্ধি পরমেশ্বরে যুক্ত করাই নিষ্কাম কর্মযোগের মুখ্য অংশ, কর্মটি গৌণমাত্র। কাজেই ঈশ্বরপরায়ণা বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে তাহাতে ব্যর্থতা বা পাতক কোনটাই হইতে পারে না। কর্মটি আরম্ভ হইলেই হইল—তাহার কোন ফল হউক বা না হউক, এমন কি কর্ম সম্পূর্ণ হউক বা অসম্পূর্ণ থাকুক তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। কারণ ঈশ্বরের সহিত বুদ্ধির যে যোগ তাহাই কর্মীকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে।

তারপর কাম্য কর্মে অভীষ্ট ফললাভ করিতে হইলে বহু আয়োজন, বহু কর্ম এবং বহু আয়াস করিতে হয়। যজ্ঞাদি ব্যাপার বহু কর্ম ও আড়ম্বর সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া উহা শেষ পর্যন্ত বিধিমতে সম্পূর্ণ হওয়া চাই, নচেৎ অভীষ্ট ফল প্রদান করে না। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে অল্পমাত্র কর্ম করিলেও অথবা তাহা আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইলেও সংসারের বিবিধ ভয় হইতে মানুষকে রক্ষা করিয়া থাকে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য—এই শ্লোকাংশটি বিবিধ অর্থে গৃহীত হইতে পারে। যথা ঃ 'স্বল্পম্' বলিতে (১) সংখ্যার অল্পতা বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হইবে যে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুসরণে যদি অল্পসংখ্যক কর্মও করা যায় তাহাও কর্মীকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিবে। (২) আড়ম্বরহীন, সহজ, সামান্য। বেদোক্ত যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম আড়ম্বরবহুল, কাজেই বহু আয়াস না করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না, পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্মযোগে সহজ, সামান্য কর্ম করিলেও তাহাই যথেষ্ট। (৩) আংশিকভাবে সম্পন্ন কর্ম। কাম্যকর্ম সম্পূর্ণ না হইলে, শেষ পর্যন্ত সম্পাদন না করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইলেও তাহা কার্যকরী হয়। (৪) সাধারণ, ক্ষুদ্র, লঘু কার্য ; নিষ্কাম কর্মযোগে কর্মটি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, লঘু কি গুরু তাহা বিবেচনা করিবার দরকার নাই। রাজা বা মন্ত্রীর কর্ম অথবা শ্রমিকের কর্ম, ব্রাহ্মণের যজনযাজনাদি আর শূদ্রের সেবাকর্ম—সমস্তই তুল্য। শূদ্রও যদি ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে তাঁহার স্বধর্মোচিত কর্ম করেন, তাহাতেই তিনি মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন ; আর রাজা যদি সুখের জন্য যশের জন্য কর্ম করেন, ব্রাহ্মণ যদি কাম্য ফলের আশায় যজনাদি কর্ম করেন তবে তাহাদিগকে সংসারে আবদ্ধ হইয়াই থাকিতে হইবে।

মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে—মহৎ ভয় কি ? প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই বলিয়াছেন—সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর ভয়। কিন্তু 'মহৎ ভয়' বলিতে যে কেবল জন্মমৃত্যুর ভয়ই বুঝায় তাহা নহে। সংসারে যতপ্রকারের ভয় আছে নিষ্কাম কর্মযোগীকে কোনও ভয়ই আক্রমণ করিতে পারে না—বিত্তনাশের ভয়, প্রাণনাশের ভয়, পাপের ভয়, ইহকালে পরকালে দুঃখের ভয়, সংসারের ভয়, জন্মমৃত্যুর ভয় ইত্যাদি সকল প্রকারের ভয় হইতেই তিনি রক্ষা পাইয়া থাকেন।

কর্মের দুইটি অংশ আছে। যে বুদ্ধি হইতে কর্মের প্রেরণা হয় তাহাই মুখ্য অংশ, আর বাহ্যিক কর্মের সম্পাদনটি গৌণ অংশ। বুদ্ধিকে কামনা-বাসনার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া পরমেশ্বরে স্থির করিতে পারাই আসল কথা। বুদ্ধি স্থির হইলে কর্ম অল্প হউক কি অধিক হউক, আংশিক হউক কি সম্পূর্ণ হউক, ক্ষুদ্র হউক কি বৃহৎ হউক—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

অন্বয় ঃ কুরুনন্দন (হে কুরুবংশজাত অর্জুন) ইহ (ইহাতে, এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা (নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি এক) অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ (অনিশ্চিতবুদ্ধি লোকদিগের বুদ্ধিসকল) বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ (বহু-শাখাবিশিষ্ট এবং অসংখ্য)।

শব্দার্থ ঃ ব্যবসায়াত্মিকা—ব্যবসায় [নিশ্চয়] আত্মা [স্বভাব] যাহার, নিশ্চয়-স্বভাবা (শ) ; 'পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারাই নিশ্চয়-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব' ঃ এই প্রকারের নিশ্চয়াত্মিকা (শ্রী, ম) ; যাহাতে আত্মতত্ত্বের যাথার্থ্য নিশ্চিত হইয়াছে তদ্রূপ (রা)। একা—একবিষয়া, একনিষ্ঠা (শ্রী)। অব্যবসায়িনাম্—ঈশ্বরারাধনা বহির্মুখকামী ব্যক্তিগণের (শ্রী) ; অনিশ্চিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের। বুদ্ধয়ঃ—বুদ্ধিসকল, বিভিন্ন বুদ্ধিসমূহ। বহুশাখাঃ—বহুভেদবিশিষ্ট (শ), বহুধা বিভক্ত। অনন্তাঃ—অন্তবিহীন, সীমাশূন্য, অসংখ্য।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগীদিগের বুদ্ধি ভগবৎপরায়ণা বলিয়া নিশ্চিত, সুতরাং একনিষ্ঠ। পক্ষান্তরে অনিশ্চিতবুদ্ধি কাম্য-কর্মানুষ্ঠান-রত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিসকল বহুধা বিভক্ত এবং অসংখ্য।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটিতেও কাম্যকর্ম হইতে নিষ্কাম কর্মযোগের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকটি বুঝিতে হইলে মন ও বুদ্ধির কার্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা দরকার। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই চারিটির সমষ্টির নাম অন্তঃকরণ। ইহারা অন্তঃকরণের বিভিন্ন বিভাগ বা বৃত্তি। তন্মধ্যে সংকল্প ও বিকল্প করাই মনের কার্য, এই সংকল্প বিকল্পের মধ্যে একটিকে স্থির করিয়া দেয় বুদ্ধি। মানবের অন্তঃকরণে যে চিরকাল সঞ্চিত সংস্কার আছে, তাহাই চিত্ত। আর 'আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা'—এই অনুভূতির নাম অহংকার। মানুষের মনে এটা চাই, ওটা চাই, এটা ভাল, ওটা ভাল—ইত্যাদি অসংখ্য সংকল্প বিকল্প উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনের এই সকল সংকল্পের কোনও স্থিরতা নাই—এক মুহূর্তে একটি সংকল্প বা ইচ্ছার উদয় হইতেছে পর মুহূর্তেই তাহা বদলাইয়া যাইতেছে। মনের এই সংকল্প-বিকল্প বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুদ্ধি একটিকে নির্বাচন করিয়া স্থির করিয়া দেয় যে উহাই শ্রেয় এবং তদনুসারে কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে মনকে সংকল্পাত্মক এবং বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা বলা হয়।

মানববুদ্ধির দুইটি গতি আছে—একটি ঊর্ধ্বাভিমুখী, অপরটি নিম্নাভিমুখী। ঊর্ধ্বাভিমুখী বুদ্ধি শান্ত, ব্যবস্থিত, সম এবং একাগ্র। ইহার লক্ষ্য এক এবং স্থির। বুদ্ধি যখন সংসারপরায়ণা না হইয়া মোক্ষপরায়ণা হয়, আত্মাই একমাত্র সৎ বস্তু—ইহাই যখন বুদ্ধির নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে, আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভই যখন ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধি যখন বিষয়ে যুক্ত না হইয়া পরমেশ্বরে যুক্ত হয়, তখনই উহাকে ঊর্ধ্বাভিমুখী বলা যাইতে পারে। এই বুদ্ধি মনের কামনা-বাসনা দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত বা বিক্ষিপ্ত হয় না। মনের বিবিধ সংকল্প বা বিকল্পের নিকট আত্মসমর্পণ করে না, পরন্তু ইন্দ্রিয় মনের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় স্বভাবে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকারের বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মনে কোন সংকল্প বিকল্প উপস্থিত হইলে, কোন কার্য কর্তব্য কি অকর্তব্য এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া দেখে উহা মোক্ষের অনুকূল কি না, ভগবানের অভিপ্রেত বা আদিষ্ট কি না। যদি তাহাই হয় তবেই উহাকে কর্তব্য বলিয়া নিশ্চিত করিয়া দেয়, অন্যথা উহাকে অগ্রাহ্য করে। এ প্রকারের বুদ্ধিকেই প্রকৃত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বিষয়কামীর বুদ্ধির কোনও নিশ্চয়তা নাই, কোনও স্থির লক্ষ্য নাই। যখন মনে যে সংকল্প বা কামনার উদয় হয়, অথবা বিভিন্ন বাসনার মধ্যে যেটি প্রিয় মনে হয় বা প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধি তাহারই অধীন হইয়া উহাকেই শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করে, বুদ্ধির তখন স্বাধীনতা এবং মনের উপর প্রভুত্ব থাকে না, বুদ্ধি মনের অধীন হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়া পড়ে। কাজেই কামনার প্রকারভেদে বুদ্ধি বহুপ্রকারের হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রকারের বাসনার আবার বহু শাখা আছে এবং প্রত্যেক শাখার আবার ভেদ আছে, কাজেই অসংখ্য বাসনার পশ্চাদ্ধাবিত এবং তৎসঙ্গে একীভূত বুদ্ধিও অসংখ্য।

'বুদ্ধি' শব্দটি যে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার সঠিক অর্থ হইতেছে মনের বোধ-শক্তি; কিন্তু গীতায় ইহা ব্যাপক দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বিচার করি এবং নির্ধারণ করি যে আমাদের চিন্তা

কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম কিরূপ হইবে—এই সমগ্র ক্রিয়াকেই গীতাতে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। চিন্তা (thought), বুদ্ধি (intelligence), বিচার (judgement), প্রত্যক্ষ নির্বাচন (perceptive choice) এবং লক্ষ্যস্থির (aim)—এই সমস্তকেই বুদ্ধিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কারণ, শুধু জ্ঞানলাভ ব্যাপারে মনের নিশ্চয়াত্মিকতাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ নহে, কিন্তু কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই নির্ধারণেই অবিচলিত থাকা (ব্যবসায়) বিশেষ করিয়া ইহাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ; অন্যদিকে চিন্তার বিক্ষিপ্ততা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ নহে—যাহাদের লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, 'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনার' পশ্চাতে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, বিশেষ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিই বিক্ষিপ্ত। অতএব ইচ্ছা (will) এবং জ্ঞান (knowledge)—এই দুইটিই বুদ্ধির ক্রিয়া। ব্যবসায়াত্মিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি আত্মার আলোকে নিবদ্ধ, ইহা আভ্যন্তরীণ আত্মজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে অব্যবসায়ীদের অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত বুদ্ধি—যেটি একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটিকেই ভুলিয়া চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনের বশ হয়—বাহ্যজীবনের কর্ম এবং কর্মফলে 'শতখানে ধায়, শত স্বার্থের মাঝখানে।' (অরবিন্দের গীতা)।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে অনুরক্ত) অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ (ইহা ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এরূপ মতবাদী) কামাত্মানঃ (কামাত্মা) স্বর্গপরা (স্বর্গাভিলাষী) অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন মূঢ়গণ) জন্মকর্মফলপ্রদাং (জন্ম ও কর্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্যলাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্‌ (ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যবিশিষ্ট) ইমাং যাম্‌ (এই যে) পুষ্পিতাং বাচম্‌ (পুষ্পিত অর্থাৎ আপাতরমণীয় বাক্য) প্রবদন্তি (বলেন) তয়া (তাহা দ্বারা) অপহৃতচেতসাম্‌ (বিমূঢ়চিত্ত) ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাম্‌ (ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে) ব্যবসায়াত্মিকা ন বিধীয়তে (নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া নিবিষ্ট হয় না)।

শব্দার্থ ঃ অবিপশ্চিতঃ—অল্পমেধা অবিবেকী ব্যক্তিগণ (শ); বিচারজনিত যথার্থ-জ্ঞানশূন্য (ম) মূঢ় লোকসকল। বেদবাদরতাঃ—বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলপ্রাপক বাক্যসমূহের অনুষ্ঠানে যাহারা রত, বেদোক্ত বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া উহার অর্থবাদেই যাহারা অনুরক্ত। ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ—'স্বর্গাদির অধিক ঈশ্বরতত্ত্ব বা মোক্ষ নাই' একথা যাহারা বলে (শ্রী)। কামাত্মানঃ—কাম [কাম্যবস্তু লাভের বাসনা] আত্মা [স্বভাব, প্রকৃতি] যাহাদের, বৈষয়িক সুখ-বাসনাগ্রস্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ (ব)। স্বর্গপরাঃ—স্বর্গলাভই যাহারা উৎকৃষ্ট গতি বলিয়া মনে করে (ম), স্বর্গপরায়ণ ব্যক্তিসকল। ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি—স্বর্গের বিবিধ ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ। জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌—যাহা কর্মের ফলস্বরূপ পুনঃপুনঃ জন্মদান

করে, জন্মরূপ কর্মফলপ্রদায়িনী (শ); জন্ম, কর্ম ও তৎফল প্রদায়িনী (শ্রী)। ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্‌—যাহাতে জ্যোতিষ্টোমাদি প্রচুর ব্যয় ও বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞ-কর্মাদির বাহুল্য বিদ্যমান। পুষ্পিতাম্‌—পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় দূর হইতে দেখিতে মনোরম (নী), কিন্তু নিষ্ফল (ব)। অপহৃতচেতসাম্‌—যাহাদের বিবেকপ্রজ্ঞা আচ্ছাদিত হইয়াছে তাহাদের (শ), ঐরূপ বাক্যদ্বারা বিমোহিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের। ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্‌—বিষয়ভোগ ও ঐশ্বর্যে অভিনিবিষ্ট বহির্মুখ ব্যক্তিদিগের (শ্রী)। ব্যবসায়াত্মিকা,—নিশ্চয়াত্মিকা, একনিষ্ঠা। সমাধৌ ন বিধীয়তে—পরমাত্মায় সমাহিত হয় না, সমাধিতে একাগ্র হয় না। সমাধি—অন্তঃকরণ (শ); চিত্তৈকাগ্র্য, পরমেশ্বরা-ভিমুখত্ব (শ্রী); পরমাত্মা (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যাহারা বেদোক্ত বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কেবল অর্থকামপ্রদ কর্মসকলের অনুষ্ঠানে রত, কামনাই যাহাদের প্রকৃতি, স্বর্গপ্রাপ্তিই যাহাদের পরমলক্ষ্য, স্বর্গাদির অধিক আর ঈশ্বরতত্ত্ব বা মোক্ষ নাই—ইহাই যাহারা মনে করে, সেইসকল বিচারহীন মূঢ়গণ জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির সাধনভূত, নানাবিধ বহু আয়াসসাধ্য, আড়ম্বরপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বাহুল্যবিশিষ্ট, পুষ্পিত ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় আপাতরমণীয় বাক্যসকল বলে। এরূপ অবিবেকী ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত বহির্মুখচিত্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া পরমাত্মায় সমাহিত হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের দুই শ্লোকে কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে বেদের কর্মকাণ্ডে যে সকল যজ্ঞাদি কর্মের বিধান আছে তাহাও ত কাম্যকর্ম—কোন যজ্ঞে পশুলাভ, কোন যজ্ঞে বিত্তলাভ, কোন যজ্ঞে স্বর্গলাভ নির্দিষ্ট আছে এবং এই প্রকারের বিবিধ কাম্যফল লাভের নিমিত্তই ঐ সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে কাম্যকর্ম নিকৃষ্ট বা অননুষ্ঠেয়—ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ বলা হইতেছে বেদের কর্মকাণ্ডে যে সকল কাম্যকর্মের উল্লেখ আছে তাহাতে পশু, বিত্ত, স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয় না। এই কারণে মোক্ষলাভের উপায় নির্ধারণার্থ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাতা, প্রধানতঃ মীমাংসকগণ, বলেন যে বিধিমত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লাভ হইতে পারে এবং ব্রহ্মলোকেই মুক্তি—ইহার অতিরিক্ত আর কোনও মুক্তি নাই। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, যাহারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বর্গাদি ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত থাকে (বেদবাদরতাঃ) এবং মনে করে যে ইহাই সব, ইহার অতিরিক্ত কোনও পুরুষার্থ বা মোক্ষ নাই (নান্যদস্তীতিবাদিনঃ), তাহারা নিতান্ত জ্ঞানহীন মূঢ় (অবিপশ্চিতঃ)। কাম্যফল-লাভের বাসনাই তাহাদের প্রকৃতিগত (কামাত্মানঃ) এবং স্বর্গলাভই ইহাদের পরম পুরুষার্থ (স্বর্গপরাঃ)। ইহারা এরূপ ভ্রমান্ধ এবং ইহাদের অন্তঃকরণ এরূপ বিবেকবৈরাগ্যহীন যে স্বর্গলাভের অতিরিক্ত মুক্তির বিষয় ইহারা ধারণাই করিতে পারে না। ইহারা যে সকল কাম্যকর্মের উপদেশ দেয় তদ্দ্বারা কর্মের ফলস্বরূপ পুনঃপুনঃ জন্মলাভ হইয়া থাকে (জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌), কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। বিবিধ সুখভোগ ও ঐশ্বর্য লাভই উহাদের লক্ষ্য। তারপর ঐসকল যজ্ঞাদি কর্মে বহুবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। উহা প্রচুর ব্যয় ও আয়াসসাধ্য। উহারা পুষ্পিত বিষলতার ন্যায় আপাতরমণীয় ; কারণ ঐ সকল বাক্যের যাহারা অনুসরণ করে

তাহারা কিয়ৎকালের জন্য নশ্বর সুখভোগ করে বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষধর্মের বিরোধী বলিয়া পরিণামে উহা হইতে অনিষ্টই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আপাত-মধুর বাক্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহাদের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এইরূপ সকাম কর্মানুষ্ঠানরত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কখনই নিশ্চয়াত্মিকা এবং একনিষ্ঠা হইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত হইতে পারে না, কেবল কামনা-বাসনা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে চালিত হয়।

উল্লিখিত কথাগুলি বেদের নিন্দাবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা বেদের নিন্দা নয়। বেদের দুইটি ভাগ—একটি কর্মকাণ্ড, অপরটি জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড নিম্নাধিকারীর জন্য উদ্দিষ্ট—যাহারা ইহকালে পশু-বিত্তাদি এবং পরকালে স্বর্গলাভের অভিলাষী তাহাদের নিমিত্তই কর্মকাণ্ডের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা মুক্তিলাভে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ উপদিষ্ট। কাজেই এই শ্লোকে বেদের নিন্দা করা হয় নাই ; যাহারা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে এবং তদতিরিক্ত মোক্ষ বা ঈশ্বরতত্ত্ব নাই—একথা বলে, সেই ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণকেই নিন্দা করা হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম ব্যতীত কামনামূলক কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কখনও আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয় না। কাজেই বৈদিক কর্মকাণ্ড মোক্ষ লাভের সাধন নহে। মোক্ষলাভার্থীকে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সমচিত্ত হইয়া নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সুতরাং বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই উহা মোক্ষের সাধন হইতে পারে, নচেৎ নহে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫

অন্বয় ঃ অর্জুন (হে অর্জুন) বেদাঃ (বেদসকল) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণবিষয়ক) [ত্বম্‌] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণভাবের অতীত) নির্দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বরহিত) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমে অনাসক্ত) আত্মবান্‌ (আত্মাকে প্রাপ্ত) ভব (হও)।

শব্দার্থ ঃ বেদাঃ—কর্মকাণ্ডাত্মক বেদসকল (ম); বেদোক্ত কর্মকাণ্ড (ব)। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—ত্রিগুণাত্মক সংসারের প্রকাশক (শ); সকাম অধিকারীদের কর্মফল প্রতিপাদক (শ্রী); ত্রিগুণের কর্ম ত্রৈগুণ্য [কামমূলক সংসার] তাহাই প্রকাশিতব্য বিষয় যাহাদের (ম)। নিস্ত্রৈগুণ্যঃ—ত্রিগুণাত্মক কর্মফলত্যাগী, ত্রিগুণের ক্রিয়ার অতীত, নিষ্কাম (শ)। নির্দ্বন্দ্বঃ—সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত (শ্রী); সর্বত্র সমবুদ্ধি (নী)। নিত্যসত্ত্বস্থঃ—সর্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিত (শ); সর্বদা অচঞ্চল, ধৈর্যশীল (ম); মদ্ভক্ত নিত্য প্রাণীদের সহিত স্থিত (বি); নিত্য বস্তু বা সত্তাতে স্থিত নির্যোগক্ষেমঃ—যোগ [অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ] ও ক্ষেম [প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা], এই দ্বিবিধ ব্যাপারে অনাসক্ত ; অভিনব বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণে প্রযত্নবিহীন; চিত্তবিক্ষেপকারী পরিগ্রহরহিত (ম)। আত্মবান্‌—অপ্রমত্ত (শ); আত্মাকে প্রাপ্ত বা অধিগত, পরমেশ্বরে নির্ভরশীল।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক কাম্যফলসমূহের প্রতিপাদক। তুমি এই তিন গুণের অতীত অর্থাৎ নিষ্কাম হও। সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব দ্বারা অভিভূত হইও না অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সমভাবাপন্ন থাকিও। সর্বদা

সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি কি প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষায় যত্নশীল না হইয়া আত্মাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিও।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে হইলে ত্রিগুণের কার্য কি তাহা প্রথমে বোঝা দরকার। সত্ত্ব, রজ, তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণের ক্রিয়াতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। প্রকৃতিতে এমন কোনও সৃষ্ট পদার্থ নাই যাহা ত্রিগুণের ক্রিয়া বর্জিত—মানব-মনের সমস্ত ভাব, চিন্তা, বাসনা ও কামনা, মানুষের সমস্ত কর্ম ও কর্মফল, সমস্ত সংসার এই ত্রিগুণের ক্রিয়াপ্রসূত। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ফল—ইহলোকে নানাবিধ সুখ ও ঐশ্বর্যভোগ এবং পরকালে স্বর্গলাভ। কাজেই ইহা ত্রিগুণাত্মক সংসারেরই প্রকাশক এবং সকাম ব্যক্তিগণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশে বিবিধ সুখভোগের নিমিত্তই এই সকল কর্ম করিয়া থাকে। এইজন্যই বেদকে ত্রৈগুণ্যবিষয় বলা হইয়াছে। যতদিন মানুষ চিত্তের কামনা দ্বারা চালিত হইয়া সাংসারিক সুখভোগের নিমিত্ত কর্ম করিবে ততদিন তাহার মুক্তি নাই, ততদিন তাহাকে এই সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। মুক্তিলাভের অর্থই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে উঠিয়া পরমাত্মাকে লাভ করা।

অতএব হে অর্জুন, তুমি যদি মোক্ষলাভ করিতে চাও, তবে তোমাকে কামনা-মূলক বৈদিক কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, কারণ কাম্যফল লাভের বাসনায় এই সকল কর্ম করিলে তুমি সংসারেই আবদ্ধ থাকিবে, কখনও মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণজাত ভাব ও কর্মের অতীত হও। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশে থাকিও না। চিত্তের কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হও এবং কাম্যফলপ্রদ বৈদিক কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠিয়া পরমাত্মাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর।

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি এবং কি প্রকারেই বা ত্রিগুণাতীত হওয়া যাইবে তাহাই বলিতেছি। হে অর্জুন, তুমি সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ কর। সুখে হর্ষ, দুঃখে বিষাদ, অনুকূল বিষয়ে রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করিও না। তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া তোমার স্বধর্মোচিত কর্ম সম্পাদন কর। কারণ যতদিন তোমার চিত্তে দ্বন্দ্বভাব থাকিবে ততদিন উহা শান্ত সমাহিত হইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে না। তুমি সর্বদা সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিও। কারণ সত্ত্বগুণের দ্বারা রজ ও তমকে অভিভূত করিতে পারিলেই ত্রিগুণের মধ্যে যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব আছে তাহা রহিত হইয়া যাইবে এবং তখন চিত্ত সম, শান্ত ও নির্মল হইবে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক ; এই প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলেই আত্মার স্বরূপ তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে এবং ক্রমে তুমি ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিবে। সাংসারিক কাম্যবস্তুর মধ্যে যাহা তোমার নাই, তাহা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না ; যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্যও ব্যগ্র হইও না। কারণ, সংসারে কাম্যবস্তুর লাভ বা রক্ষা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং কি পাইলে কি না পাইলে, কি রহিল, কি রহিল না—তাহার প্রতি তুমি মোটেই লক্ষ্য করিও না। তুমি আত্মবান হও—আত্মাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরে নির্ভরশীল হও এবং তিনিই তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন—এরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

এই শ্লোকে 'নিত্যসত্ত্বস্থঃ' শব্দের অর্থ কেহ বলেন 'সর্বদা ধৈর্যশীল'। এই অর্থও সুসঙ্গত, কারণ ধৈর্যশীল না হইলে কেহ নির্দ্বন্দ্ব, ত্রিগুণাতীত হইতে পারে না।

'আত্মবান্' শব্দের অর্থ কেহ কেহ বলেন 'অপ্রমত্ত'। বাস্তবিক যিনি ত্রিগুণের বিরোধকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রলোভনে অপ্রমত্ত, অচঞ্চল থাকিতে পারেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬

অন্বয় ঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে (সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে) উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ অর্থঃ (যতটুকু প্রয়োজন) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (জ্ঞানবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির) সর্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) তাবান্ [অর্থঃ] (ততটুকু প্রয়োজন)।

শব্দার্থ ঃ উদপানে—উদক্ [জল] পীত হয় যে স্থানে, বাপী কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে (শ্রী)। যাবান্ অর্থঃ—যে পরিমাণ প্রয়োজন (শ) ; স্নান পানাদিরূপ প্রয়োজন। সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে—(১) সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হইলে, (২) মহৎ জলাশয়ে (ম) ; মহাহ্রদে (শ্রী) ; সমুদ্রে (আ)। সর্বেষু বেদেষু—বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে (শ) ; কাম্যকর্মসমূহে (ম) ; সমস্ত বেদে। বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ; পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মার্পিতহৃদয় পুরুষের ; ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারীর (ম)। তাবান্ অর্থঃ—সেই পরিমাণ প্রয়োজন (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হইলে কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ যেমন কোন প্রয়োজন থাকে না) সেইরূপ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বেদসমূহের ততটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই)।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে আর কোনও প্রয়োজন থাকে না, কারণ ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি সেই বৃহৎ জলরাশিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং ক্ষুদ্র জলাশয়সমূহে যে সকল কার্য সম্পন্ন হইত বৃহৎ জলরাশিতেও সেই সকল কার্য সম্পন্ন হয়। অধিকন্তু তাহাতে আর এমন অনেক কার্য হয় যাহা ক্ষুদ্র জলাশয়ে হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ যে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহার সমস্ত বেদে আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। এস্থলে 'সর্বেষু বেদেষু' বলিতে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বেদের কর্মকাণ্ডের কোনও প্রয়োজনই নাই। কারণ বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ হয়, যে ভোগসুখাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহা অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে পরমানন্দ অনুভব করেন তাহার তুলনায় স্বর্গাদি সুখভোগ অকিঞ্চিৎকর, ঐ সকল ক্ষুদ্র সুখ ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত কণিকামাত্র। যিনি সমগ্রের আস্বাদ পাইয়াছেন অকিঞ্চিৎকর অণুতে তাঁহার আর কি প্রয়োজন আছে? তারপর বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে জানাইয়া দেওয়া। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন উপনিষৎ আর তাঁহাকে কি জানাইবে ?

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকের ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বাপী-কূপ-তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নান-পানাদি যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় একটি বৃহৎ জলাশয়ে সেই সমস্তই সিদ্ধ হয়। সেইরূপ বেদোক্ত কাম্যকর্মসমূহ দ্বারা যে ফল লাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহা সমস্তই লাভ হইয়া থাকে, কারণ ক্ষুদ্র আনন্দসকল ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই অর্থ করিতে হইলে মূল শ্লোকের একটু কষ্ট-কল্পিত অন্বয় করিতে হয়। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ

কেহই প্রাচীন মতের অনুসরণ করেন নাই। এই শ্লোকেও বেদোক্ত কর্মকাণ্ড অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগের উৎকর্ষ একটি উপমা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদোক্ত কর্মকাণ্ড কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায়। ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেরূপ বহু আয়াসে সামান্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেইরূপ বহু আয়াসে বেদোক্ত কর্ম করিয়া ক্ষণিক তুচ্ছ ভোগসুখ লাভ হয়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্র বা জলপ্লাবনের ন্যায়। জলপ্লাবন হইলে যেমন সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত হয়, মানুষের সমস্ত প্রয়োজন বিনা আয়াসেই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে চিত্ত আনন্দে ভরিয়া যায়, মানুষের সর্বার্থ সিদ্ধ হয়।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ কর্মণি এব (কর্মেই) তে অধিকারঃ (তোমার অধিকার) কদাচন (কখনও) ফলেষু মা [অভূৎ] (কর্মফলসমূহে না হউক) কর্মফলহেতুঃ (কর্মফলদ্বারা প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হইও না) অকর্মণি (কর্মের অকরণে) তে সঙ্গঃ (তোমার প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক, অর্থাৎ যেন হয় না)।

শব্দার্থঃ কর্মণি এব অধিকারঃ—কর্মেতেই তোমার অধিকার, অন্তঃকরণ-শোধক কর্মেই অধিকার, জ্ঞাননিষ্ঠারূপ বেদান্ত বিচারাদিতে অধিকার নাই (ম)। ফলেষু—কর্মের ফল স্বর্গাদিতে, একই কর্মের বহু ফল হইতে পারে বলিয়া 'কর্মণি' শব্দ একবচনে এবং 'ফলেষু' শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। মা [অভূৎ]—না হউক, 'ইহা আমার ভোক্তব্য': এই বোধ না হউক [যেন হয় না] (ম)। কর্মফলহেতুঃ—কর্মের ফলই হেতু [কর্মের প্রবর্তক] যাহার। সঙ্গঃ—প্রীতি (ম), আসক্তি।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, কর্মেতেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে যেন অধিকার না হয় অর্থাৎ ফলকে অধিকার করিয়া তুমি কোনও কর্ম করিও না। ফললাভের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইও না। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম না করিবার প্রবৃত্তিও যেন তোমার না জন্মে।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বের কয়েকটি শ্লোকে বেদোক্ত কাম্যকর্ম অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে নিষ্কাম কর্ম কিরূপে সম্পাদন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকের প্রথমাংশের তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকেঃ

(১) কর্মণি এব তে অধিকারঃ [অস্তি] ফলেষু কদাচন [অধিকারঃ] মা [অস্তু]—অর্থাৎ হে অর্জুন, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্ম করা না করা তোমার আয়ত্ত। কিন্তু ফলের উপর তোমার অধিকার নাই, কারণ ফললাভ তোমার আয়ত্ত নহে, এমন কি ফল কি হইবে তাহাও তুমি জান না। সুতরাং কর্ম করিয়া যাও, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই অর্থ সম্যক্ সঙ্গত মনে হয় না, কারণ ফলের উপর কর্তৃত্ব নাই বলিয়া যে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। তাহা হইলে যেস্থলে কর্তৃত্ব আছে সেস্থলে তো ফলাকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে।

(২) অন্তঃকরণশোধক কর্মেই তোমার অধিকার, জ্ঞাননিষ্ঠাতে তোমার অধিকার নাই; সুতরাং তুমি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন কর। এই অর্থও সুসঙ্গত নহে। কারণ এই শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার

কোনও প্রসঙ্গ নাই। কর্মের সহিত জ্ঞানের তুলনা করা হয় নাই, কর্মের এবং কর্মফলের কথাই বলা হইয়াছে।

(৩) কর্মণি এব তে অধিকারঃ [অস্তি] ফলেষু কদাচন [অধিকারঃ] মা [অভূৎ, অস্তু]—হে অর্জুন, কর্মেতেই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার না হউক [যেন না হয়]। অর্থাৎ তুমি কর্ম করিয়া যাও, ইহাই তোমার অধিকার, কিন্তু কখনও ফলকে অধিকার করিয়া অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম করিও না। ফললাভই যেন তোমার কর্মের হেতু বা প্রবর্তক না হয়, 'মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ'।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ফলের আকাঙ্ক্ষাই যদি না রহিল তবে কর্মের প্রয়োজন কি? কর্ম না করিলেও চলে অথবা কর্ম না করাই ভাল। এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে—না, তা নয়। কর্ম ত্যাগ করিলে চলিবে না, কর্ম না করার দিকে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। এ বিষয়টি পরে আরও বিস্তৃতভাবে বলা হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা (সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে তুল্য মনে করিয়া) যোগস্থঃ [সন্] (যোগস্থ হইয়া) কর্মাণি কুরু (কর্মসকল কর) সমত্বং যোগ উচ্যতে (সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়)।

শব্দার্থঃ সঙ্গম্—ফলতৃষ্ণা (ম); ফলাভিলাষ ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ (শ্রী)। যোগস্থঃ—কেবল ঈশ্বরার্থ কর্মপরায়ণ (শ); কেবল ঈশ্বরারাধনা-বুদ্ধি-যুক্ত (ম); ঈশ্বরের সহিত যুক্ত; সমত্ববুদ্ধিযুক্ত। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ—সিদ্ধি [ফললাভ] ও অসিদ্ধি [নিষ্ফলতা] তাহাতে। সমঃ—সমান, তুল্যভাবাপন্ন, হর্ষ-বিষাদশূন্য (নী)। কর্মাণি—বৈদিক ও লৌকিক কর্মসকল, যুদ্ধাদি কার্যসমূহ (ব)। সমত্বম্—এইপ্রকার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া সমস্ত কর্ম (লৌকিক ও বৈদিক) সম্পাদন কর। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্ম কখনও ত্যাগ করিবে না, অথচ ফলের আকাঙ্ক্ষাতেও কর্ম করিবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে ফলাকাঙ্ক্ষাই যদি কর্মের প্রবর্তক না হয় তবে কর্মের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? কি ভাবেই বা লোকে কর্ম করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে অর্জুন, তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম কর।

এস্থলে 'যোগস্থ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হইয়া থাকেঃ (১) কেবল ঈশ্বরার্থে অর্থাৎ 'ঈশ্বর তুষ্ট হউন'—এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কর্ম কর, (২) নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হইয়া কর্ম কর, (৩) সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম কর।

উপরের অর্থগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। পরমেশ্বরে বুদ্ধি সমাহিত করিয়া ভগবদিচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়া কর্ম করাই নিষ্কাম কর্মযোগ এবং

ঈশ্বরে যে বুদ্ধি যুক্ত তাহাই সম এবং শান্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে তিনটি কথা বলা হইয়াছে। এই কথা কয়টি কর্মযোগের সার কথা :

(১) যোগস্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, বুদ্ধিকে পরমেশ্বরে নিহিত করিয়া কর্ম করিবে। প্রত্যেক কর্ম করিবার সময় মনে করিবে যেন ভগবানের কাজই করিতেছ। তোমার নিজের কোনও ইচ্ছা বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ভগবদিচ্ছাই তোমার ইচ্ছা হইবে এবং ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করাই তোমার কর্মের প্রবর্তক হইবে।

(২) কর্মফলে আসক্তি রাখিবে না এবং 'আমি কর্তা' এরূপ অভিমানও করিবে না। এই কর্মের এই ফল পাওয়া চাই—এরূপ আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে।

(৩) কর্মের সফলতা বা নিষ্ফলতাকে তুল্য মনে করিবে। কর্ম সফল হইলেও হৃষ্ট হইবে না, বিফল হইলেও তাহাতে বিষণ্ণ হইবে না। এই প্রকারের যে সমত্বভাব তাহাই যোগ নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ তাহাই যোগের প্রকৃত লক্ষণ।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি—এইটিই নিষ্কাম কর্মযোগের গোড়াকার কথা। কর্ম-মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়াই লোকে কর্ম করে। এই উদ্দেশ্য দ্বিবিধ হইতে পারে—নিজের ইচ্ছা বা কামনার পূরণ অথবা নিজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশ পালন। নিষ্কাম কর্মীকে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া, নিজের ইচ্ছাকে ভগবদিচ্ছার সহিত একীভূত করিয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম করিতে হইবে। ইহারই নাম বুদ্ধিযোগ। এই যোগ সংঘটিত না হইলে নিষ্কাম কর্ম করা অসম্ভব। এইজন্য বলা হইয়াছে 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'। পরমেশ্বরের সহিত বুদ্ধিকে যুক্ত করিলে কর্মফলে আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে এবং সমত্ববুদ্ধিরও উদয় হইবে। সুখ-দুঃখ, রাগদ্বেষকে তুল্য জ্ঞান করা সহজ কথা নয়। ভগবানের সহিত যাঁহার নিবিড় যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে, যিনি মনে করেন আমি যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী, পরমাত্মাতে যিনি অহংভাবকে বিলীন করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং সাধকের সর্বপ্রথম কর্তব্য যোগস্থ হওয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত বুদ্ধির যোগস্থাপন করা।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

অন্বয় : ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধিযোগ হইতে) কর্ম (কাম্যকর্ম) দূরেণ হি অবরম্ (অত্যন্ত নিকৃষ্ট) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিযোগে) শরণম্ অন্বিচ্ছ (আশ্রয় গ্রহণ কর) ফলহেতবঃ কৃপণাঃ (ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দীন)।

শব্দার্থ : কর্ম—ফলার্থী কর্তৃক ক্রিয়মাণ কর্ম (শ); কাম্যকর্ম (শ্রী); ফলাভি-সন্ধিতে কৃত কর্ম (ম)। বুদ্ধিযোগাৎ—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম হইতে (শ); ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা কৃত কর্মযোগ হইতে (শ্রী); আত্মবুদ্ধিসাধনভূত নিষ্কাম কর্মযোগ হইতে (ম)। অবরম্—নিকৃষ্ট, জন্মমরণাদিহেতু অধম (শ)। বুদ্ধৌ—যোগবিষয়া বুদ্ধিতে (শ); জ্ঞানে অথবা পরিত্রাতা ঈশ্বরে (শ্রী); পরমার্থবুদ্ধিতে (ম)। শরণম্—অভয়-প্রাপ্তিকারণ আশ্রয় (শ)। অন্বিচ্ছ—প্রার্থনা কর (শ)। ফলহেতবঃ—ফললাভই যাহাদের কর্মের হেতু [প্রবর্তক], ফলতৃষ্ণাযুক্ত (শ)।

শ্লোকার্থ : ঈশ্বরার্পিত এবং সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম অনেক নিকৃষ্ট। অতএব এই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর অর্থাৎ সর্বদা ফলতৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরাশ্রিত হইয়া সকল কর্ম সম্পাদন কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে তাহারা অত্যন্ত দীন, কারণ তাহারা তুচ্ছ কাম্যফলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে হইলে বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বোঝা দরকার। ৪১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে মানুষের বুদ্ধি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একটি ব্যবসায়াত্মিকা, অপরটি বাসনাত্মিকা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ঊর্ধ্বাভিমুখী। ইহা একমাত্র পরমেশ্বরকে নিশ্চয় করিয়া তাহাতেই নিবিষ্ট থাকে।

এইপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত কর্ম ঈশ্বরার্থই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করাই তাঁহার সমস্ত কর্মের মূল এবং সেখান হইতেই তাঁহার সমস্ত কর্মের প্রেরণা আসিয়া থাকে। তাঁহার নিজের কোনও কর্ম থাকে না, নিজের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছাও থাকে না। থাকিলেও বুদ্ধি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দেয়। সমস্ত কর্মই তিনি ভগবানের কর্ম বলিয়া মনে করেন। ইহাই বুদ্ধিযোগ। পক্ষান্তরে মনের বাসনার অনুবর্তী বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহারই নাম কাম্যকর্ম। এই কাম্যকর্মে কোনও উচ্চ সত্তার সহিত বুদ্ধির যোগ থাকে না, মনের বাসনা-কামনা দ্বারাই বুদ্ধি চালিত হইয়া থাকে। এখন এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম নিকৃষ্ট এবং হীন। কেন নিকৃষ্ট তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

(১) কাম্যকর্মে বুদ্ধি মনের অসংখ্য কামনা-বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিযোগস্থ ব্যক্তির বুদ্ধি পরমেশ্বরে যুক্ত থাকে। এই কারণে বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি এক, পরন্তু সকাম কর্মীর বুদ্ধি বহুশাখা এবং অসংখ্য (২।৪১)। বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্মের মধ্যে একটা ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য থাকে ; পক্ষান্তরে বাসনাচালিত ব্যক্তির কর্মে কোনও ঐক্য বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যে বাসনা প্রবল হয় তখনই তদনুযায়ী কর্ম হইয়া থাকে।

(২) বুদ্ধিযোগস্থ ব্যক্তির চিত্ত কোন সন্দেহ বা সংশয় দ্বারা আন্দোলিত হয় না। কারণ ইহাতে নিশ্চয় বা দৃঢ়প্রত্যয় আছে, পক্ষান্তরে বাসনাযুক্ত ব্যক্তির চিত্তের কোনও স্থিরতা নাই, ইহা কোনও বিষয় নিশ্চয় করিয়া অবলম্বন করিতে পারে না। সর্বদা সংশয়-সন্দেহে আন্দোলিত হয়।

(৩) বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি শান্তি ও সমতার সহিত সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন। তিনি রাগদ্বেষের অধীন নহেন। পক্ষান্তরে কাম্যকর্মানুষ্ঠানকারীর চিত্ত সর্বদাই অশান্ত।

(৪) তাঁহার কর্মে কখনও কোন ভ্রম হয় না। কারণ তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে বাসনাচালিত ব্যক্তি প্রায়শঃ ভ্রমে পতিত হয়।

(৫) বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা পরমানন্দ লাভ করেন, কাম্যকর্মানুষ্ঠানকারী তাহার কণিকারও আস্বাদ পায় না।

(৬) বুদ্ধিযোগ মানুষকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়, পক্ষান্তরে কামনাবাসনা-প্রসূত কর্ম তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করে।

অতএব হে অর্জুন, তুমি বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে তাহারা অতি কৃপণ, অতি দীন। যে ব্যক্তি অল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না লৌকিক অর্থে তাহাকে কৃপণ বলা হয়। সকাম ব্যক্তি কর্মফল-জনিত সামান্য সুখের জন্য লালায়িত। সে সুখের অভাব সহ্য করিতে পারে না পরন্তু ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্মযোগে যে প্রচুর আনন্দ তাহার আস্বাদও পায় না। কাজেই সে কৃপণ। যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই সংসার হইতে প্রয়াণ করে বৈদিক অর্থে সেই কৃপণ। সকাম কর্মী কামনা-বাসনা দ্বারা এই সংসারে আবদ্ধ থাকার ফলে পরমাত্মাকে না জানিয়াই তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং সে কৃপণ।

অন্যভাবেও এই শ্লোকটির অর্থ করা যাইতে পারে। কর্মযোগের দুইটি অংশ—প্রথম, বুদ্ধিকে পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত করা; দ্বিতীয়, উক্তরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বাহ্যিক কর্ম সম্পাদন করা। উভয়ের মধ্যে বুদ্ধিযোগই মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠ, কর্ম গৌণ এবং নিকৃষ্ট। হে অর্জুন, কর্ম গৌণ বলিয়া কর্মের সিদ্ধি বা ফলের বিষয় বিচার করিও না। তুমি শুদ্ধ সাম্যবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া কর্ম কর, তাহা হইলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগে অবস্থিত ব্যক্তি) ইহ (এই লোকে) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ) উভে জহাতি (উভয়ই ত্যাগ করেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগায় যুজ্যস্ব (নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হও) যোগঃ (যোগ) কর্মসু কৌশলম্‌ (কর্মের কৌশল)।

শব্দার্থঃ বুদ্ধিযুক্তঃ—বুদ্ধিযোগে অবস্থিত, যিনি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেন। সুকৃতদুষ্কৃতে—সুকৃত [স্বর্গাদিপ্রাপক পুণ্যকর্ম] এবং দুষ্কৃত [নরকাদি পাপকর্ম], পুণ্য ও পাপজনক কার্য। জহাতি—ত্যাগ করেন, (১) পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হন অর্থাৎ তিনি কাম্যকর্মযুক্ত লোকের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া কোন কর্ম করেন না, (২) পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যোগায় যুজ্যস্ব—সমত্ববুদ্ধিপূর্বক নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যোগঃ—ঈশ্বরার্পিতচিত্তে সমবুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান। কর্মসু কৌশলম্‌—(১) কর্ম সম্পাদনের কৌশল বা চাতুর্য, (২) সুন্দররূপে কর্ম সম্পাদনের উপায়।

শ্লোকার্থঃ এইরূপে ঈশ্বরার্পিত সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই সংসারে সুকৃত ও দুষ্কৃতকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ তিনি পাপ-পুণ্য উভয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হন এবং তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া কোনও কর্ম করেন না। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি সমত্ববুদ্ধিতে সম্পাদিত নিষ্কাম কর্মযুক্ত হও। এইপ্রকার যোগই সুন্দররূপে কর্ম সম্পাদনের উপায়।

ব্যাখ্যাঃ বুদ্ধিযোগাশ্রিত ব্যক্তি পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করেন। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম করে তাহারাই পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শুভ বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সুফল লাভের নিমিত্ত যে কর্ম করা হয় তাহাই সুকৃত। সুকৃতের ফলে

লোক ইহকাল ও পরকালে সুখলাভ করে। পক্ষান্তরে অশুভ বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কর্ম করা হয় অথবা যে কর্মের ফলে মানুষের দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাই দুষ্কৃত। দুষ্কৃতের ফল ইহকালে দুঃখ এবং পরকালে দুর্গতি। সুকৃতই হউক কি দুষ্কৃতই হউক—সমস্তই ফলাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত কর্ম, কাজেই সংসার-বন্ধনের হেতু। কিন্তু সুকৃত-দুষ্কৃতের বা পাপপুণ্যের কোনও মাপকাঠি দ্বারা বুদ্ধিযোগাশ্রিত কর্মের বিচার করা যায় না। কারণ যাহাতে কোন ফলেরই আকাঙ্ক্ষা নাই, শুভ বা অশুভ কোন প্রকার কামনা নাই, যাহা ঈশ্বরাশ্রিত বুদ্ধিতে কৃত হইয়া থাকে, তাহা পাপপুণ্য বিচারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

তারপর ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পুণ্যের লোভে শুভকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপের ভয়ে অশুভ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি পুণ্যের লোভে কোন কর্মে প্রবৃত্ত বা পাপের ভয়ে কোন কর্ম হইতে নিবৃত্ত হন না। তিনি ঈশ্বরাশ্রিত বুদ্ধিতে সর্বদা কর্ম করিয়া থাকেন, পাপ-পুণ্যের বিচার দ্বারা তাহার কোনও কর্ম নিয়মিত হয় না। বাসনা-কামনা-চালিত ব্যক্তিকে সর্বদাই পাপ-পুণ্যের সংশয়দোলায় দোলিত হইয়া কর্ম করিতে হয়। প্রতি কর্মেই দেখিতে হয় উহা পাপ কি পুণ্য—প্রতি পদে সে সংশয়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহার পাপ-পুণ্য বিচারের কোনও নির্দিষ্ট নীতি না থাকাতে কোনটা পাপকর্ম, কোনটা পুণ্যকর্ম তাহাও সে অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারে না। কাজেই কখনও পাপকে পুণ্য, কখনও পুণ্যকে পাপ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিযোগাশ্রিত ব্যক্তির এরূপ কোনও সংশয় বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহার বুদ্ধি পরমেশ্বরে সমাহিত হওয়াতে এবং ভগবদিচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে তাঁহার কর্মে কোন প্রকার সংশয় বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব হে অর্জুন, তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হও। এরূপ যোগই সুকৌশল কর্মসম্পাদনের একমাত্র উপায়। যোগীর কর্মই সর্বাপেক্ষা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম, শান্ত এবং নিশ্চিত বুদ্ধিতে যে কর্ম করা যায় তাহা নানা বাসনাবিক্ষুব্ধ, অস্থির, চঞ্চল বুদ্ধির কর্ম হইতে যে উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইবে তাহাও সহজেই বোঝা যাইতে পারে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'যোগই হইতেছে কর্মের কৌশল, সুকৌশল কর্মসম্পাদনের একমাত্র উপায়।' এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ

> প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ কামনাশূন্য কর্মের স্থিরনিশ্চয়তা বা সাফল্য হইতে পারে না। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম না করিলে সে কর্ম ভাল হইবে না, উদ্ভাবনী শক্তিরও সম্যক্‌ বিকাশ হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে—যোগস্থ হইয়া যে কর্ম করা যায় তাহা শুধু সর্বোচ্চ নহে তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসঙ্গত। সাংসারিক ব্যাপারেও এরূপ কর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন ও কার্যকরী, কারণ সর্ব কর্মের যিনি অধীশ্বর তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম আলোকিত 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌'।

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকটি একটু ভিন্ন অর্থে বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ

> কর্মের স্বভাবই বন্ধন। ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম করিলে তাহাতে সংসারবন্ধন হয় না; ঈশ্বরের আরাধনা হেতু তাহা মোক্ষের অনুকূল হইয়া থাকে। সুতরাং এই উপায়ে বন্ধনাত্মক কর্ম মুক্তির সহায় বলিয়া ইহাকে কর্মের কৌশল বা চাতুর্য বলা

হইয়াছে। যিনি অনিষ্ট বস্তুকেও কৌশল দ্বারা ইষ্ট বস্তুতে পরিণত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত চতুর।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌॥ ৫১

অন্বয়ঃ বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিযোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা (কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া) মনীষিণঃ [ভূত্বা] (জ্ঞানী হইয়া) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ [সন্তঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে সম্যক্‌ মুক্ত হইয়া) অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি (নিরুপদ্রব পরমপদ নিশ্চয় লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ বুদ্ধিযুক্তাঃ—বুদ্ধিযোগপরায়ণ, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত (শ) ব্যক্তিগণ। কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা—কর্মের ফল ত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম করিয়া (শ্রী, ম)। মনীষিণঃ—জ্ঞানী হইয়া, জ্ঞান লাভ করিয়া। জন্মবন্ধবিনির্মুক্তা জীবনকালেই জন্মরূপ বন্ধন হইতে সম্যক্‌ মুক্ত হইয়া (শ)। অনাময়ম্‌—ক্লেশশূন্য (ব); সর্বোপদ্রবরহিত (শ্রী); অভয় (ম)। পদম্‌—মোক্ষাখ্য বৈষ্ণবপদ, মোক্ষাখ্য পুরুষার্থ (ম)।

শ্লোকার্থঃ যে সকল বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের যোগে কর্ম করেন তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া জন্মের বন্ধন হইতে সম্যক্‌ মুক্ত হইয়া সেই শান্তিময় পরমপদ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে বুদ্ধিযোগের ফল কি তাহাই বলা হইয়াছে। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে তাহাদিগকে কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। কাম্যকর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ—তা সে সুকৃতই হউক আর দুষ্কৃতই হউক। এই প্রকার কর্মীকে পুনঃপুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করিতে হয়। পুণ্যফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হইলেও তাহাকে পুনরায় মর্ত্যধামে আসিতে হয়।

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি পাপপুণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তিনি পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে উত্থিত হন। এই শ্লোকে বলা হইল যে তিনি জন্মজনিত যে সংসারের বন্ধন তাহা হইতেও মুক্ত হন। কিন্তু কথা হইতে পারে যে জ্ঞান ব্যতীত তো মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে পরমেশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে ঐ কর্মদ্বারাই ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে কর্মত্যাগ করিতে হইবে না। জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ কর্মী জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন এবং জন্মজনিত সংসারে যে দুঃখ, অশান্তি ও উপদ্রব—ঐ সকল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে না এবং তাঁহাকে পুনরায় সংসারেও জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরম শান্তিময় বিষ্ণুপদ লাভ করিবেন। তিনি যে পদলাভ করিবেন তথায় শোকদুঃখময় মানব-জীবনের যন্ত্রণাভোগ নাই, তথায় চিরশান্তি, চির আনন্দ। ইহারই অপর নাম ব্রাহ্মী স্থিতি।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

অন্বয়ঃ যদা (যে সময়ে) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহকলিলম্‌ (মোহরূপ গহন) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে) তদা (সেই সময়ে) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ে) নির্বেদং গন্তাসি (তোমার ঔদাসীন্য জন্মিবে)।

শব্দার্থঃ বুদ্ধিঃ—বিবেকবুদ্ধি, অন্তঃকরণ (ম)। মোহকলিলম্‌—মোহাত্মক অবিবেকরূপ কলুষতা (শ); 'ইহা আমি, ইহা আমার': এই প্রকারের অজ্ঞান-বিলাস (ম); দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ গহন (শ্রী); তুচ্ছ ফলাভিলাষহেতু অজ্ঞানগহন (ব)। ব্যতিতরিষ্যতি—বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে, অতি শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে (শ), রজস্তমোমল পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে (ম); বুদ্ধি প্রসন্ন হইবে (নী)। শ্রুতস্য—অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্ত শ্রুতবিষয়ে, বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে। শ্রোতব্যস্য—যাহা পরে শুনিতে পাইবে। নির্বেদম্‌—বৈরাগ্য (শ); বিতৃষ্ণা (ম)। গন্তাসি—শ্রুত এবং শ্রোতব্য বিষয় নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে (শ); তুচ্ছ ফলপ্রদ বলিয়া ত্যাগ করিবে।

শ্লোকার্থঃ হে অর্জুন, এইরূপ যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি অবিবেকরূপ গহন (বন) সম্যক্‌ অতিক্রম করিবে অর্থাৎ মোহান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইবে অথবা অজ্ঞানজনিত মালিন্য ত্যাগ করিয়া অতি শুদ্ধভাব ধারণ করিবে, তখন সকাম কর্মের ফল সম্বন্ধে বেদে বা অন্যত্র যাহা শুনিয়াছ বা পরে শুনিবে সেই সকল কথায় তোমার ঔদাসীন্য জন্মিবে অর্থাৎ ঐ সকল কথায় তুমি আর আকৃষ্ট হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে যোগযুক্ত নিষ্কাম কর্মী জ্ঞানলাভ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ করিবেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কখন এবং কি প্রকারে সেই পদ লাভ হইবে। এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকে তাহারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধি যখন মোহাচ্ছন্ন হয় তখন সে অনিত্য অসৎ পদার্থকে সৎ বলিয়া মনে করে, দেহেতেই তাহার আত্মবুদ্ধি জন্মে—'দেহই আমি' এরূপ মনে করিয়া দেহের সুখদুঃখেই সে আকুল হইয়া পড়ে। অথচ সৎ পদার্থ যে আত্মা তাহার কোনও সন্ধানই পায় না। ইহাই মোহ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানবশতঃ সে দেহ ও মনেন্দ্রিয়ের যে সুখ তাহারই পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহার বুদ্ধি মনের তীব্র বাসনাকামনার অধীন হইয়া পড়ে এবং আত্মাকে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, আত্মানন্দের কোনও অনুভূতি না পাইয়া সে অনিত্য ভোগসুখের পশ্চাতে ছুটাছুটি করে। মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানীর মন কামনাবাসনা দ্বারা সর্বদা মলিন ও কলুষিত থাকে বলিয়া সে নানা বৈদিক ও লৌকিক কাম্যফলপ্রদ কর্মের কথা শুনিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের আশায় মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল অনুষ্ঠানেই রত থাকে।

কিন্তু হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা দ্বারা তোমার বুদ্ধি যখন মোহজনিত মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ এবং নির্মল হইবে, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া আত্মস্থ হইবে, তখন ঐহিক বা পারত্রিক সুখভোগের নিমিত্ত তোমার মনে আর কোনও আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না। কাজেই তুমি বেদে বা অন্যত্র শাস্ত্রমুখে বা লোকমুখে যে সকল কাম্যফলপ্রদ কর্মের কথা শুনিয়াছ অথবা ভবিষ্যতে শুনিতে পাইবে সেই সকলের প্রতি তোমার আর কোনও আকর্ষণ থাকিবে না। তুমি ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারিবে। আত্মাকে লাভ করিতে পারিলে, নিত্যপদার্থের জ্ঞান জন্মিলে অনিত্য বস্তুর লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমার চিত্ত হইতে আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে।

শ্রীধরস্বামীর মতে 'কলিল' শব্দের অর্থ গহন (কলিলং গহনং বিদুঃ)। মোহের সহিত গহন কাননের তুলনা যুক্তিযুক্তই বটে। গহন কানন অন্ধকারময়, উহাতে প্রবেশ করিলে লোক দিশাহারা হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকে, প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না। সেইরূপ বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইলে মানুষ দিশাহারা হইয়া যায়, মনের অসংখ্য কামনাবাসনার মধ্যে ঘুরিতে থাকে ; কোনটি প্রকৃত শ্রেয় তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। আবার পথিক যখন গহন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসে, তখন সে আলোকে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায়। সেইরূপ মোহান্ধকার দূর হইলে বুদ্ধি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া প্রকৃত শ্রেয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। এই শ্লোকে মোহ অতিক্রমপূর্বক যে জ্ঞানলাভের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুদ্ধিযোগাশ্রিত নিষ্কাম কর্মদ্বারাই লাভ করা যাইবে ; তার কর্মত্যাগের প্রয়োজন হইবে না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অন্বয় ঃ যদা (যে সময়ে) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিবাক্য দ্বারা বিক্ষিপ্ত) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (ঈশ্বরে) নিশ্চলা (নিশ্চল হইয়া) অচলা স্থাস্যতি (স্থির থাকিবে) তদা (সেই সময়ে) যোগম্ অবাপ্স্যসি (যোগফল বা যোগের চরমাবস্থা লাভ করিবে)।

শব্দার্থ ঃ শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—নানা লৌকিক ও বৈদিকার্থ শ্রবণ দ্বারা (শ্রী); অজ্ঞাত-তাৎপর্য নানাবিধ ফলশ্রবণ দ্বারা (ম)। বিপ্রতিপন্না—সংশয়বিক্ষিপ্তা (শ)। নিশ্চলা—বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্টা (শ্রী); বিক্ষেপচলনবর্জিতা (শ)। অচলা—অভ্যাসপটুতাবশতঃ স্থিরা (শ্রী)। যোগম্—যোগফল, তত্ত্বজ্ঞান (শ্রী); বিবেকপ্রজ্ঞা, সমাধি (শ); আত্মাবলোকন (রা)। সমাধৌ—সমাহিত হয় চিত্ত ইহাতে ইতি সমাধি [আত্মা] তাহাতে (শ); পরমাত্মাতে (ম); পরমেশ্বরে (শ্রী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সময়ে নানা বৈদিক ও লৌকিক কর্মফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া পরমেশ্বরে স্থির অবিচলিতভাবে সমাহিত হইবে সেই সময় তুমি যোগফল (বিবেকপ্রজ্ঞা) বা যোগের চরমাবস্থা লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই শ্লোকে যোগের চরম ফল যে স্থিতপ্রজ্ঞতা তাহারই কথা বলা হইয়াছে। নানা লৌকিক ও বৈদিকার্থ শ্রবণ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। বেদের বাক্যসমূহে নানাবিধ কাম্যকর্মের ব্যবস্থা আছে, উহাদের আবার নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। এমন কি উপনিষদের বাক্যাবলিও বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, মুনিদের মতও বিভিন্ন, লৌকিক ব্যবস্থার তো অন্তই নাই। এইসকল বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের কথা শ্রবণ করিয়া মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, কোনটা গ্রহণীয় তাহা স্থির করিতে পারে না। নানা কামনাবাসনা দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি মনের অসংখ্য কামনাবাসনা দ্বারা চালিত না হইয়া যখন স্থির হইবে, নিশ্চলা হইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখনই যোগের প্রকৃত এবং চরম ফল পাওয়া যাইবে।

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধির মালিন্য দূর হইলে বিবিধ কাম্যফলপ্রদ কর্মের প্রতি চিত্তের আর আকর্ষণ থাকিবে না। কিন্তু মানুষের মন বড়ই চঞ্চল ; এক সময়ে বুদ্ধি স্থির হইলেও আবার অপর সময়ে উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু

এই প্রকারে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিকে স্থির অচঞ্চল করিতে হইলে বিষয়ান্তর হইতে উহাকে সরাইয়া লইয়া পরমেশ্বরে সমাহিত করিতে হইবে। এজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। বারংবার বুদ্ধিযোগের অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির এই চঞ্চলতা দূর করিতে হইবে ; এবং বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইবে, আর যখন বিষয়ান্তরে উহা আকৃষ্ট হইবে না, তখনই যোগের চরমফল যে স্থিতপ্রজ্ঞতা—তাহাই লাভ হইবে।

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

অন্বয় ঃ অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কেশব (হে কেশব) সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) কা ভাষা (লক্ষণ কি) স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত (স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন) কিম্ আসীত (কি ভাবে অবস্থান করেন) কিং ব্রজেত (কিরূপ চলেন)।

শব্দার্থ ঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা [প্রতিষ্ঠিতা] প্রজ্ঞা ['আমিই পরব্রহ্ম' ঃ এই প্রকারের প্রজ্ঞা] যাঁহার (শ); স্থিতা [নিশ্চলা] প্রজ্ঞা [বুদ্ধি] যাঁহার (শ্রী), তদ্রূপ ব্যক্তির। সমাধিস্থস্য—সমাধিতে স্থিত ব্যক্তির (শ)। কা ভাষা—বাক্য কি প্রকারে অপর কর্তৃক ভাষিত হয় (শ); তাহার লক্ষণ কি (শ্রী); তাহার স্বরূপ কি (রা)। কিং প্রভাষেত—কি কি কথা বলেন (শ); স্তুতিনিন্দা স্নেহদ্বেষপ্রাপ্ত হইয়া স্পষ্ট বা স্বাগত কি বলেন (ব)। কিম্ আসীত—কিরূপ আসন করেন (শ্রী) ; বাহ্যবিষয়ে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন (ব)। কিং ব্রজেত—কি প্রকারে চলাফেরা করেন (শ্রী) ; কি প্রকারে বিষয়ে বিচরণ করেন, কিরূপে বিষয়ভোগ করেন (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে কেশব, ঈশ্বরে যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি স্থির এবং এবং অবিচলিত—এরূপ ব্যক্তির লক্ষণ কি ? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপ কথা বলেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে বা বিষয়ে বিচরণ করেন ?

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে মানুষের বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি অচলা হইয়া আত্মাতে স্থির হইলে যোগপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এপ্রকার স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলে। একথা শুনিয়া অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, তিনি কি কথা বলেন, কি ভাবে চলেন ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিলেন।

প্রাচীন টীকাকারগণের মতে এই শ্লোকে 'সমাধিস্থ' শব্দের অর্থ—যিনি বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানসমাধিতে মগ্ন আছেন। এইরূপ সমাধিমগ্ন ব্যক্তির লক্ষণ কি এবং সমাধিভঙ্গে উত্থিত হইয়া কিরূপ বলেন, কিরূপ থাকেন এবং কিরূপ চলেন ?—ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন কি না বিবেচ্য। কারণ এস্থলে ধ্যানসমাধির কোনও প্রসঙ্গ নাই। আর ধ্যানসমাধিতে কি অবস্থা হয় তাহা অর্জুনের জিজ্ঞাস্য বলিয়া মনে হয় না। এই শ্লোকে 'সমাধিস্থ' শব্দের অর্থ—যাঁহার বুদ্ধি বাহ্যবিষয়ে স্থিত না হইয়া আত্মাতে স্থিত হইয়াছে। এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি লোকের লক্ষণই অর্জুন জানিতে চাহিয়াছেন। পূর্ব শ্লোকেও 'সমাধি' শব্দের অর্থ 'আত্মা'ই করা হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন ঃ

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে তাঁহার বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাঁহার শরীর মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে, এমন কি তাঁহার শরীর দগ্ধ করিলেও তাঁহার জ্ঞান হইবে না। সাধারণত সমাধি বলিতে এই অবস্থাই বুঝায়; কিন্তু ইহা সমাধির প্রধান চিহ্ন নহে। ইহা শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থা; সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাঁহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূরে হয়, ইহারা মনে প্রবেশ করিতে পারে না। যে আন্তরিক অবস্থা হইতে এরূপ মুক্তির উৎপত্তি—শুভাশুভে সুখদুঃখে, বিপদে সম্পদে অবিচলিত মন সহ আত্মার আত্মাতেই যে তৃপ্তি তাহাই প্রকৃত সমাধি। সমাধিস্থ ব্যক্তি বাহিরে কার্য করিলেও তাঁহার ভাব অন্তর্মুখী, বাহিরের বস্তুর দিকে তিনি যখন তাকাইয়া থাকেন' তখনও আত্মাতেই তিনি নিবদ্ধ থাকেন। যখন সাধারণের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখায় যে তিনি সাংসারিক বাহ্য ব্যাপারে ব্যস্ত তখনও সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকে।

'কিম্‌ আসীত'—বাহ্যপ্রকৃতির সম্পর্কে তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন, তৎপ্রতি কি ভাব অবলম্বন করেন, তিনি বাহ্যবিষয়ে কি প্রকারে ইন্দ্রিয় নিরোধ করেন। 'ব্রজেত কিম্‌'—সংসারে থাকিলে তিনি বিষয়কে কিরূপে গ্রহণ করেন। তিনি কি সাধারণ লোকের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত থাকেন, না ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক প্রাপ্ত বিষয় ভোগ করেন? অর্জুনের চারটি প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ দিয়াছেন তাহা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অন্বয় ঃ শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন,) যদা (যে সময়ে) [ইনি] সর্বান্‌ মনোগতান্‌ কামান্‌ (চিত্তস্থিত সমস্ত কামনা) প্রজহাতি (সম্যক্‌ পরিত্যাগ করেন) আত্মনি (আপনাতে, আত্মাতে) আত্মনা তুষ্টঃ (আপনি তুষ্ট থাকেন) তদা (সেই সময়ে) স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ কথিত হন)।

শব্দার্থ ঃ কামান্‌—বিভিন্ন ইচ্ছাসমূহ (শ); কামসংকল্পাদি মনোবৃত্তিবিশেষ (ম)। মনোগতান্‌—মনে প্রবিষ্ট, হৃদ্‌গত (শ); আত্মাতে স্থিত নহে, মনেতেই স্থিত, সুতরাং সহজে পরিত্যাজ্য (ম)। প্রজহাতি—সম্যক্‌ পরিত্যাগ করেন (শ)। আত্মনি আত্মনা তুষ্টঃ—পরমার্থ লাভহেতু বিষয়ে তুষ্ট না হইয়া আত্মাতেই তুষ্ট (ম); পরমানন্দরূপ স্বকীয় আত্মাতেই তুষ্ট, আত্মারাম (শ্রী); বাহ্যবিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া তুচ্ছ বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত।

শ্লোকার্থ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন— হে অর্জুন, যখন যোগী হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা-বাসনা সম্যক্‌ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কোনও বাহ্যবিষয় আত্মাতে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া স্বীয় আত্মাতেই স্বয়ং পরিতৃপ্ত থাকেন তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন। কোনও বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার সমস্ত লক্ষণই আন্তরিক। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রথম লক্ষণ এই যে তিনি সমস্ত বিষয়কামনা ত্যাগ করেন। কারণ যতক্ষণ মন কামনাবাসনা দ্বারা চালিত হয়,

ততক্ষণ উহা আত্মাতে স্থির হইতে পারে না। কামনাই মনের চঞ্চলতার হেতু। কাজেই বিষয়বাসনা দূর না হইলে কেহই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। মানুষের কামনা বহুবিধ। যত বিষয় তত কামনা। অর্থের কামনা, যশের কামনা, স্বর্গলাভের কামনা—এইপ্রকারে বিষয়ভেদে কামনা অসংখ্য। এই সমস্ত কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর কামনা শুভ হউক কি অশুভ হউক—সর্বপ্রকারের কামনাই পরিত্যাজ্য।

'মনোগতান্‌' শব্দে এই বুঝায় যে কামনাসকল মনেতেই আবদ্ধ, উহারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কাজেই সহজেই পরিত্যাজ্য। তারপর কামনামধ্যে কতকগুলি মনেতে উদয় হয়, কিন্তু তাহারা কোনও বাহ্যিক ক্রিয়াতে প্রকাশিত হয় না, উহারা মনেতেই লয় হয়, আর কতকগুলি বাহ্যিক কর্মে পরিণত হয়। কামনা বলিতে এস্থলে স্ফুট অস্ফুট সকল কামনাই বুঝাইতেছে।

কিন্তু কথা হইতে পারে যে কামনার পূরণেই মানুষের সুখ। কামনা বিনষ্ট হইলে তো সুখের সমস্ত উৎস বিলুপ্ত হইয়া যায়, জীবন নিরানন্দ হইয়া পড়ে। এজন্যই বলা হইতেছে কামনার পূরণে যে সুখ তাহা অনিত্য, অতি তুচ্ছ, উহা দুঃখেরই নামান্তর। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে আনন্দ অনুভব করেন তাহার তুলনায় কামনা পূরণের সুখ অকিঞ্চিৎকর। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ বিষয় হইতে উৎপন্ন নহে, সেই আনন্দের উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে। নিজের আত্মাতেই তিনি তৃপ্ত, বাহিরের কোনও সুখ তিনি কামনা করেন না। সাধক যখন বাহিরের বস্তুতে সুখ না খুঁজিয়া আত্মানন্দেই তৃপ্ত থাকেন তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। শ্রুতিও বলেন ঃ যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ মর্ত্যধামে অমরত্বলাভ করিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। ব্রহ্মের উপভোগ হইতেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরমানন্দ লাভ হয়, এই আনন্দের তুলনায় বিষয়সুখ অকিঞ্চিৎকর।[১]

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

অন্বয় ঃ দুঃখেষু (সর্ববিধ দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অক্ষুব্ধচিত্ত) সুখেষু (সর্ববিধ সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষারহিত) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মুনিঃ (আত্মমননশীল ব্যক্তি) স্থিতধীঃ উচ্যতে (স্থিতধী বলিয়া কথিত হন)।

শব্দার্থ ঃ দুঃখেষু—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইলে (শ)। অনুদ্বিগ্নমনাঃ—দুঃখপ্রাপ্ত হইলেও যাঁহার মন ক্ষুব্ধ হয় না। বিগতস্পৃহঃ—প্রাপ্তসুখে যাহার স্পৃহা [তৃষ্ণা] নাই (শ)। বীতরাগভয়ক্রোধঃ—বীত [অপগত] রাগ [অনুরাগ, আকর্ষণ] ভয় ও ক্রোধ যাহার। মুনিঃ—আত্মমননশীল [যোগী] (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ সর্ববিধ দুঃখে যাঁহার চিত্তে কোনরূপ উদ্বেগ জন্মে না, কোন প্রকার সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, যাঁহার চিত্ত হইতে আসক্তি, ভয়, ক্রোধ দূরীভূত হইয়াছে তাদৃশ আত্মমননশীল ব্যক্তি স্থিতধী বলিয়া কথিত হন।

১ যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ কঠ ২।৩।১৪

ব্যাখ্যা ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ আরও বিস্তারিতভাবে বলা হইতেছে। দুঃখ উপস্থিত হইলে অথবা দুঃখের আশঙ্কায় সকাম ব্যক্তির মনে একটা উদ্বেগ উপস্থিত হয়—সে একটা যাতনা অনুভব করে, কেমন করিয়া আগত দুঃখকে দূর করিবে, অনাগতকে প্রতিরোধ করিবে তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের এরূপ কোন উদ্বেগই হয় না—দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে স্থিতধী ব্যক্তি তাহা ধীরভাবে গ্রহণ করেন, সেই হেতু কোনও ব্যথা বা উদ্বেগ তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। স্থিতপ্রজ্ঞের দুঃখে যেমন উদ্বেগ হয় না, সুখেতেও তাঁহার কোনও স্পৃহা থাকে না। যদি সুখকর কোনও বিষয় উপস্থিত হয় তাহা ভোগ করিবার অথবা কোনও প্রত্যাশিত সুখকর বস্তু লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার কোনও স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। সুখে এবং দুঃখে তিনি সমভাবাপন্ন থাকেন।

তিনি বীতরাগ। কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁহার রাগ বা আকর্ষণ নাই। প্রীতিকর বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবতঃ একটা আকর্ষণ বা টান জন্মে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা হয় না। প্রীতিকর বস্তুর প্রতি রাগ বা আকর্ষণই মানুষকে অনেক স্থলে দুঃখে নিপাতিত করে; তাহাকে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে। তাঁহার ভয়ও নাই; কারণ অনিষ্টের আশঙ্কাতে মানুষের ভয় হয়। সর্প দেখিলেই ভয় হয় দংশন করিয়া প্রাণহরণ করিবে, রাজপুরুষ দেখিলেই ভয় হয় বাঁধিয়া নিবে। কিন্তু যাঁহার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই, তাঁহার ভয় হইবে কোথা হইতে? তারপর যাহারা ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য লালায়িত তাহাদের মনে সর্বদা ভয় থাকে: 'আমরা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বুঝি পাইলাম না, যাহা পাইয়াছি তাহাও বুঝি হারাইয়া গেল'—এই আশঙ্কা ও ভয় সর্বদা তাহাদের জাগ্রত থাকে। কিন্তু সুখকর বা প্রীতিকর বিষয়ে যাঁহার আকর্ষণ নাই, সুখে দুঃখে যিনি সমভাবাপন্ন তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। ক্রোধও এমন লোকের জন্মিতে পারে না। কামনা প্রতিহত হইলে যে জ্বালাময়ী চিত্তবৃত্তি উপস্থিত হয় তাহাই ক্রোধ। কোনও ব্যক্তিবিশেষ হইতে এই ব্যাঘাত জন্মিলে ক্রোধ তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু যিনি সমস্ত কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ক্রোধ হইবে কোথা হইতে?

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহরহিত) তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য (সেই সেই শুভ ও অশুভ প্রাপ্ত হইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দ প্রকাশ করেন না) ন দ্বেষ্টি (বিরক্তি প্রকাশও করেন না) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহারই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত)।

শব্দার্থ ঃ সর্বত্র—দেহজীবনাদি বিষয়েও (শ); পুত্র-কলত্রাদি প্রিয়জনেও (শ্রী); এই সংসারের যাবতীয় পদার্থে। অনভিস্নেহঃ—স্নেহবর্জিত (ম), মমতারহিত, যে প্রেমবশতঃ লোকে অপরের হানিবৃদ্ধিকে নিজের হানিবৃদ্ধি বলিয়া মনে করে, সেই তামসী বৃত্তির নাম স্নেহ, এইপ্রকার স্নেহ রহিত (ম)। শুভাশুভম্‌—শুভ [অনুকূল, সুখপ্রদ বিষয়] এবং অশুভ [প্রতিকূল, অসুখজনক বিষয়]। ন অভিনন্দতি—হৃষ্ট হন না, তুষ্ট হন না (শ); প্রশংসা করেন না (শ্রী); অন্তরানুরাগপূর্বক প্রশংসা করেন না (ম); 'তুমি ধর্মিষ্ঠ, চিরকাল বাঁচিয়া থাক, এরূপ অভিনন্দন করেন না (ব)। ন দ্বেষ্টি—দ্বেষ করেন না, বিষণ্ণ হন না (শ)'

নিন্দা করেন না (শ্রী); 'পাপিষ্ঠ, তোমার মৃত্যু হউক' এরূপ অভিশাপ দেন না (ব)।

শ্লোকার্থ ঃ যিনি সকল বস্তুতেই স্নেহ বা মমতাশূন্য, যিনি কোন শুভ বা প্রিয় বস্তু পাইয়াও হর্ষপ্রকাশ করেন না, অশুভ বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিরক্তি প্রকাশ করেন না, তাঁহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয়জনের সুখে দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ বোধ, তাহার হানিবৃদ্ধিতে নিজের হানিবৃদ্ধির অনুভবরূপ যে তামস বৃত্তি তাহার নাম স্নেহ। যাহারা আমাদের স্বজন তাহাদের প্রতিই আমরা সাধারণতঃ এই স্নেহ অনুভব করিয়া থাকি। নিজের দেহ, বিত্ত প্রভৃতির প্রতিই মমতা দেখা যায়। কিন্তু এই মমতা অন্ধ সংকীর্ণ চিত্তবৃত্তি; প্রিয়জন আমাদের সুখের হেতু বলিয়াই তাহাদের প্রতি আমরা স্নেহবান। কাজেই স্নেহ মমতা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর, স্বার্থভাব হইতেই ইহার জন্ম। মানুষ যেমন নিজের সুখ কামনা করে এবং নিজের দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়, তেমনি সে যাহাদের স্নেহমমতায় আবদ্ধ, যাহাদিগকে সে আপনার জন বলিয়া মনে করে তাহাদের সুখে সুখী এবং তাহাদের দুঃখেও সে দুঃখী হয়। স্বজনের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ, স্বজনের হানিবৃদ্ধিকে নিজের হানিবৃদ্ধি বলিয়া অনুভব করে। স্নেহ বা মমতাত্মক বৃত্তি হইতেই এই সহানুভূতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্বজনের গণ্ডীর মধ্যেই ইহা আবদ্ধ; যাহারা স্বজন নহে তাহাদের প্রতি কোনই সহানুভূতি হয় না, বরং কোন স্থলে স্বজনের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি অপরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এই মমতাত্মিকা বৃত্তি নাই। তিনি নিজের সুখ যেমন কামনা করেন না, তেমনি মমতাবশতঃ স্বজনের সুখও কামনা করেন না; নিজের দুঃখে যেমন উদ্বেগ নাই, স্বজনের দুঃখেও তাঁহার কোনও উদ্বেগ জন্মে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, এমন কি নিজের দেহ প্রাণ, কাহারও প্রতি তিনি সংকীর্ণ মমতা দ্বারা আবদ্ধ নন।

এখন কথা হইতে পারে যে চিত্তের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলিই মানুষের সুখের উৎপাদক। এই বৃত্তিগুলি মনুষ্যজগতে সমাজবন্ধনের হেতু, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি। মানুষ স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনগণকে ভালোবাসিয়াই তো সংসারে যা কিছু সুখ অনুভব করে। যদি এই সুখটুকু জীবন হইতে চলিয়া যায় তবে জীবনের তো আর কিছু থাকে না। তাহা হইলে মানুষ জড় মাটি-পাথরের মত সুখদুঃখ ও স্নেহমমতাবিহীন হইয়া যায়। তবে কি গীতা মানুষকে জড় পাথরের মত অনুভববিহীন হইতে শিক্ষা দিয়াছে? না—তা নয়। আমাদের চিত্তের সংকীর্ণ অহংকার-প্রসূত যে অশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি, গীতা তাহাই পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ যে মমতা দ্বারা বিচলিত হই তাহা অশুদ্ধ মনের উত্তেজনা-প্রসূত; তাহাতে আবিলতা, সংকীর্ণতা বর্তমান। উহা অন্ধ মোহাত্মক বৃত্তি। গীতা এই সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করতঃ শান্ত সম বিশ্বপ্রেম লাভ করিতে বলিয়াছে। এই প্রেমের আনন্দ লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের মমতাত্মক সংকীর্ণ চিত্তবৃত্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ আমাদের চিত্ত কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা বিরাট বা মহানের সন্ধান পাই না। কাজেই এই বিরাট সত্তার মধ্যে আত্মসত্তাকে ডুবাইয়া দিতে হইলে এই স্নেহাত্মক চিত্তবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বজনের প্রতি স্নেহমমতা দ্বারা আবদ্ধ না হইলেও তিনি স্বজন-

গণকে ত্যাগ করেন না। তাহাদের মধ্যেই তিনি বাস করেন এবং শান্ত সম প্রেমের ভাব হইতেই স্বজনগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তারপর স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট শুভাশুভ দুইই তুল্য। সাধারণ লোকে অজ্ঞানের বশে শুভাশুভ স্থির করে। যাহা বাসনার অনুকূল তাহাই শুভ এবং যাহা বাসনার প্রতিকূল তাহাই অশুভ বলিয়া মনে করে। ধন, জন, যশ, মান, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য—এই প্রকারের বিষয়সমূহই শুভ এবং ইহাদের বিপরীত বিষয়ই অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই শুভ পাইলে মানুষ আনন্দপ্রকাশ করে এবং অশুভ উপস্থিত হইলে বিষাদগ্রস্ত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু এরূপ ভাবে শুভাশুভের বিচার করেন না। তিনি কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নিকট কামনাবাসনার মাপকাঠি দ্বারা শুভাশুভের বিচার হইতে পারে না। সাধারণ লোকে যাহা শুভ বলিয়া বিবেচনা করে তাহা উপস্থিত হইলেও তিনি হৃষ্ট হন না এবং যাহা অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা উপস্থিত হইলেও তিনি বিরক্তি বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না। উভয়ই তাঁহার নিকট তুল্য। এরূপে শুভাশুভ সমস্ত ব্যাপারেই যিনি সমভাবাপন্ন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

কেহ কেহ 'নাভিনন্দতি' ও 'ন দ্বেষ্টি' শব্দের এরূপ অর্থ করেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও নিকট অশুভ প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে দ্বেষ বা নিন্দা করেন না। তিনি শুভাশুভ ও নিন্দাপ্রশংসার অতীত। কেহ উপকার করিলেও তাঁহাকে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন না। কাহার নিকট অপকার বা অসদ্ব্যবহার পাইলেও তাহাকে অভিশাপ দেন না। যিনি এরূপ সমভাবাপন্ন হইতে পারেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ কূর্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপ তাহার অঙ্গসকলের ন্যায়) যদা চ (যখন) অয়ং (ইনি) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে) সর্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়) সংহরতে (প্রত্যাহৃত করেন) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [তখন] (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)।

শব্দার্থঃ অয়ং—এই আত্মমননশীল ব্যক্তি, এই যোগী (শ্রী); জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত যতি (শ); ব্যুত্থিত যোগী (ম)। সর্বশঃ—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে (ম); সর্বপ্রকারে। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—শব্দস্পর্শাদি সমস্ত বিষয় হইতে (ম); ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ্যবিষয় হইতে। অঙ্গানি—মুখ, কর, চরণ প্রভৃতি অঙ্গসকল (শ্রী)। সংহরতে—প্রত্যাহৃত করে, সঙ্কুচিত করে (ম); অনায়াসে প্রত্যাহৃত করে (শ্রী); সমাকর্ষণ করে (ব)।

শ্লোকার্থঃ কচ্ছপ যেমন হস্তপদাদি অঙ্গসকল নিজের মধ্যে টানিয়া লয় সেইরূপ সাধক যখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উহাদের ভোগ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মস্থ রাখেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যাঃ যোগী কি প্রকারে ইন্দ্রিয়সংযম করেন—কচ্ছপের সহিত তুলনা দ্বারা—তাহাই স্পষ্ট করিয়া বোঝান হইয়াছে এবং 'কিম্ আসীত' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সম্মুখে কোন ভীতিজনক পদার্থের দর্শন বা স্পর্শ হইলে কচ্ছপ যেমন তাহার বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটাইয়া ভিতরে টানিয়া লয় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়সকলের স্বাভাবিক বহির্মুখী গতিকে ফিরাইয়া অন্তঃস্থ করিয়া লন। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে মনেরই যন্ত্রবিশেষ; ইহারা মনের বিশেষ

বিশেষ শক্তি। এই সকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই মন বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। কাজেই ইন্দ্রিয়সকলের স্বাভাবিক গতি বহির্মুখী। চক্ষু (অথবা চক্ষুর ভিতর দিয়া মন) সর্বদা খুঁজিয়া বেড়ায় কোথায় সুন্দর দৃশ্য আছে, কর্ণ খুঁজিয়া বেড়ায় কোথায় সুমিষ্ট শব্দ শোনা যাইবে। আর যেমনি সুন্দর দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি চক্ষু তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; কোনও সুমিষ্ট শব্দ শুনিলে কর্ণ তাহাতে আকৃষ্ট হয়। বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ের এই যে স্বাভাবিক উত্তেজনা সাধারণ মানুষ তাহা দমন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারিয়া মানুষ তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। এই কারণে সকল শাস্ত্রেই ইন্দ্রিয়সংযমের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অনেকে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতি নিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পলায়ন করে। কিন্তু গীতা এরূপ পলায়নের উপদেশ দেয় নাই। কচ্ছপ ভীতিজনক পদার্থ হইতে পলায়ন করে না, পরন্তু নিজের অঙ্গগুলিকে গুটাইয়া লয়। যোগীও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পলায়ন করেন না, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের গতিকে ফিরাইয়া অন্তঃস্থ করেন। এই যে ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী গতিকে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করা—ইহাই হইল ইন্দ্রিয়সংযমের আন্তরিক সাধনা। গীতা এই সাধনার উপরই বিশেষ জোর দিয়াছে। বাহ্যিক বস্তুসকল সর্বদাই ইন্দ্রিয়গুলিকে টানিয়া ধরিতেছে, ইন্দ্রিয়ও ঐ সকল বস্তুর দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। এই অবস্থায় বাহ্য বস্তুর দিকে উহাদের গতিকে নিরুদ্ধ করিয়া, বাহিরের আকর্ষণকে সংযত করিয়া উহাদিগকে ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। ইহাই ইন্দ্রিয়সংযমের প্রকৃত পন্থা।

কচ্ছপ তাহার হস্তপদাদি গুটাইয়া রাখে বটে, কিন্তু কখনও বিনাশ করে না। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে বিনষ্ট বা অকর্মণ্য করেন না। অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহারও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। তিনিও অন্য লোকের ন্যায় চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কি শ্রবণশক্তি কখনও লুপ্ত হয় না, কিন্তু ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে প্রবল আকর্ষণ এবং ভোগের বিষয় প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়ের যে উত্তেজনা, তাহা স্থিতপ্রজ্ঞের হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল উদ্দাম হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে না। ইহারা সর্বদা মনের অধীন এবং মনেতেই বিলীন হইয়া থাকে, মন আবার বুদ্ধির অধীন এবং বুদ্ধিতে বিলীন থাকে, বুদ্ধি আত্মস্থ বা ঈশ্বরে সমর্পিত থাকে—ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।

আর একটি বিষয়েও কচ্ছপের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সাদৃশ্য আছে। কচ্ছপ নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই তাহার হস্তপদ গুটাইয়া রাখে। সেইজন্য উহাকে আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরের দিকে টানিয়া লন। অবশ্য প্রথমাবস্থায় এই প্রকারের সংযম অতি কঠিন কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে উহা ক্রমশঃ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া থাকে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করেন, কি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে দূরে অবস্থান করেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয় হয় না।

গীতা এই বাহ্যিক উপায়ের ব্যর্থতা প্রদর্শন করিয়া আন্তরিক চেষ্টারই অনুমোদন করিয়াছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সাধককে স্থলবিশেষে এই বাহ্যিক উপায়েরও আশ্রয়

লইতে হয়। কোন বস্তুর প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল হইলে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। এই অবস্থায় প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত। এই উপায়ে স্থায়ীভাবে বা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয় না হইলেও ইহাদ্বারা স্থলবিশেষে যে উপকার হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ নিরাহারস্য দেহিনঃ (আহারশূন্য ব্যক্তির) বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে (বিষয়সকল নিবৃত্ত হয়) রসবর্জং (রস বা তৃষ্ণাকে বাদ দিয়া) অস্য (ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) রসঃ অপি (আসক্তিও) পরং দৃষ্ট্বা (পরমাত্মাকে দেখিয়া) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়)।

শব্দার্থঃ নিরাহারস্য—উপবাসপরায়ণ, আহারবিহীন ব্যক্তির (ব) ; শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহই ইন্দ্রিয়গণের আহার, যিনি এই আহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন তিনি নিরাহার, এই প্রকার নিরাহার দেহাভিমানী ব্যক্তির (শ্রী) ; কষ্টকর তপস্যায় স্থিত মূর্খব্যক্তির (শ)। দেহিনঃ—দেহাভিমানী ব্যক্তির (শ্রী)। বিষয়া বিনিবর্তন্তে—শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ বিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় গ্রহণ করে না, বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হয় (শ্রী)। অস্য—এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির (শ্রী)। রসঃ অপি—রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণাও (শ্রী) ; বিষয়াসক্তিও (শ) ; 'রস' শব্দ এস্থলে রাগ, তৃষ্ণা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরং দৃষ্ট্বা—পরমাত্মার সাক্ষাৎ করিয়া, পরমাত্মার দর্শন ও তাহাতে স্থিতিনিবন্ধন। রসবর্জম্—বিষয়ে অনুরাগ ব্যতীত (শ) ; রস [তৃষ্ণা] বর্জন করিয়া (ম) ; অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হয়, কিন্তু রস [তৃষ্ণা] দূর হয় না।

শ্লোকার্থঃ আহার পরিত্যাগ করিলে ভোজ্যপদার্থের সহিত সংস্পর্শের অভাববশতঃ ইন্দ্রিয়ভোগের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না ; কিন্তু যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়া আত্মাতেই বাস করেন তাঁহার আসক্তিও সমূলে নষ্ট হয়।

ব্যাখ্যাঃ যাঁহারা উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের চেষ্টা করেন এখানে তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে। বহুদিন ব্যাপিয়া উপবাস করিলে মানুষের ইন্দ্রিয়সকল দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন ভোগের শক্তি কমিয়া যাওয়াতে বিষয়ভোগ হইতে অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হয়। এস্থলে উপবাসকে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য কারণেও বিষয়ভোগের নিবৃত্তি হইতে পারে। শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িলে বা জরা বার্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগের শক্তি কমিয়া যায়। কেহ কেহ তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে দুর্বল ও নিস্তেজ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়ভোগের লালসা দূর হয় না। বিষয়ের যে রস অর্থাৎ বিষয়ের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের যে সুখ হয় তৎপ্রতি যে আকর্ষণ সেটি বর্তমান থাকে। যদিও বাহ্যিক ভোগ নিবৃত্ত হয় তথাপি আন্তরিক আকর্ষণ থাকিয়া যায়। কাজেই চিত্তের চঞ্চলতা দূর হয় না। চিত্তের চঞ্চলতার দরুন বুদ্ধিও নির্মল, স্থির এবং একাগ্র হইতে পারে না।

তারপর আকর্ষণ থাকিয়া গেলে যে কোন সময়ে বাহ্যিক সংযমীর পতন হইতে

পারে। কারণ সময় সময় প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া এই আকর্ষণ এমন প্রবল হয় যে যোগী আর তাহা জয় করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহার বাহ্য সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া তিনি পতিত হন। কোনও ভোগ্যবিষয় লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা—এবিষয়টি আমার চাই-ই, না হইলে কিছুতেই চলিবে না—এপ্রকার মনোবৃত্তিই বাসনার তীব্র রূপ। কিন্তু এই তীব্রভাব না থাকিলেও অনেক স্থলে প্রীতিকর বিষয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকিয়া যায়। এই আকর্ষণকে দূর করা বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু এই আকর্ষণ যতক্ষণ সমূলে নষ্ট না হয় ততক্ষণ ইন্দ্রিয়জয় সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে কোনও বাহ্যিক উপায় দ্বারা এই আকর্ষণের বিনাশ করা যদি অসম্ভব হয় তবে কি উপায়ে ইহাকে বিনাশ করা যাইবে? তাহার উত্তরেই বলা হইল যে একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারিলেই কেবল যে বিষয়ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে তাহা নহে, ভোগ্যবস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ তাহাও সমূলে বিনষ্ট হইবে। বিষয়তৃষ্ণা আপনা হইতেই দূর হইবে, সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধনাদি বাহ্যিক উপায়ের প্রয়োজন হইবে না।

মানুষ যতক্ষণ ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাস করে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হয়, ততক্ষণ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয় অসম্ভব। যতক্ষণ সে দেহমন ইন্দ্রিয়কেই 'আমি' বলিয়া মনে করে এবং দেহেন্দ্রিয় প্রাণের সুখদুঃখেই বিচলিত হয়, ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণকে জয় করিতে পারে না। কিন্তু এই অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন পরমাত্মার দর্শনলাভ করে তখনই তাহার মধ্যে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থামিয়া যায় এবং ভোগবস্তুর প্রতি আকর্ষণের অবসান হয়।

উপবাস ও কৃচ্ছ্রাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের চেষ্টা প্রাচীনকালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তপস্বিগণ তপস্যা দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এই উপায়ে যে তাঁহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারিতেন না প্রাচীন গ্রন্থে উহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক তপস্বী বহুকাল তপস্যা করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। প্রবল প্রলোভনের সম্মুখে পড়িয়া তাঁহাদের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তথাপি এই উপায় যে একবারে নিরর্থক একথা বলা যায় না। কারণ কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ের সাহায্য হয় এবং প্রথমাবস্থায় উহাদের দ্বারা যে উপকার পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক উপায়ের উপর নির্ভর করিয়া যোগীর নিশ্চিত থাকা কিছুতেই কর্তব্য নহে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

অন্বয়ঃ কৌন্তেয় (হে অর্জুন) যততঃ বিপশ্চিতঃ অপি পুরুষস্য (যত্নশীল বিবেকবান পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি (বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল) প্রসভং হরন্তি হি (বলপূর্বক হরণ করে)।

শব্দার্থঃ যততঃ পুরুষস্য—প্রযত্নকারী পুরুষের (শ) ; মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্নবান (শ্রী) ; পুনঃ পুনঃ বিষয়দোষদর্শনাত্মক যত্নকারী (ম); ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযত্নবান পুরুষের (ব)। বিপশ্চিতঃ—মেধাবী (শ) ; বিবেকী (শ্রী) ; অত্যন্ত বিবেকী (ম) ;

শাস্ত্রাচার্যোপদেশবান্ (নী)। প্রমাথীনি—প্রমথনশীল (ম) ক্ষোভক (শ্রী); অতি বলবত্তা হেতু বিবেকের উপমর্দনে সক্ষম (ম)। প্রসভং হরন্তি—বলপ্রয়োগ করিয়া হরণ করে, বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া বিষয়প্রবণ করে (ব); বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া বিকৃত করে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, যে বিবেকবান পুরুষ ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন করেন এরূপ ব্যক্তির মনকেও বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্বক বিপথে চালিত করে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা বাহ্যিক উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনের চেষ্টা করেন তাঁহারা সম্যক কৃতকার্য হন না। কারণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভোগ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও চিত্তের আকর্ষণ থাকিয়া যায়। কাজেই তাঁহাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয়জয় হয় না।

কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ভোগের দোষ দর্শন করিয়া বিচারমূলে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষকে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে। এই প্রকার বিচারবান পুরুষকেই এখানে 'বিপশ্চিতঃ' বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি সৎ অসৎ, নিত্য অনিত্যের বিচার দ্বারা দেখেন যে ইন্দ্রিয়ভোগ ক্ষণস্থায়ী, ইহা প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারে না, ভোগের দ্বারা কামনাবাসনার উপশম হয় না। এই প্রকার বিচার করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হন না এবং ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ এত প্রবল যে ঈদৃশ বিচারবান পুরুষেরও চিত্ত উহারা বলপূর্বক হরণ করিয়া লয়। বিবেকীর বুদ্ধি তাঁহার মনকে ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিতে চেষ্টা করে, অপরদিকে ইন্দ্রিয়গণ মনকে টানিয়া ভোগের দিকে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান যে এইরূপ যত্নবান বিচারশীল পুরুষেরও শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন বলবান চোর প্রহরী বা রক্ষকগণকে বিধ্বস্ত করিয়া সতর্ক গৃহস্থেরও বহুমূল্য ধনরত্নাদি অপহরণ করে সেইরূপ শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গুলি বিবেকবান ব্যক্তির বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁহার মনকে হরণ করিয়া লয়।

এই সংসারে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের মুনি ঋষিদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। কৃচ্ছ্র তপস্যারত বিবেকবান মুনিঋষিগণও কোন কোন স্থলে কামক্রোধাদির অধীন হইয়াছেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপস্বীও অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বয়ং বশিষ্ঠ মুনিও কোন কোন স্থলে ক্রোধের পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান কালে ইহার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেকবান ব্যক্তিও যদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিমোহিত হন, তবে অবিবেকী ব্যক্তির তো কথাই নাই। প্রত্যেকের নিজের জীবন পর্যালোচনা করিলেও ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু বিচার দ্বারা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয় না হইলেও তাহাদ্বারা যে ইন্দ্রিয়জয়ের বিশেষ সাহায্য হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কাজেই ইন্দ্রিয়জয়াভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বিচারবুদ্ধি সর্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

অন্বয় ঃ তানি সর্বাণি সংযম্য (সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া) মৎপরঃ (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত) [ও] যুক্তঃ (সমাহিত হইয়া) আসীত (অবস্থান করিবে) হি (যেহেতু) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) যস্য বশে (যাঁহার বশীভূত) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত)।

শব্দার্থ ঃ মৎপরঃ—অহং [আমি, বাসুদেব, সর্বপ্রত্যক্ আত্মা] পর [উৎকৃষ্ট, উপাদেয়] যাঁহার (শ); একান্তভক্ত, মন্নিষ্ঠ (ব)। যুক্তঃ—সমাহিত সন্ন্যাসী (শ); যোগী (শ্রী); নিগৃহীতমনা (ম)। বশে—বশবর্তী (শ্রী)। আসীত—অবস্থান করিবে; নির্ব্যাপার হইয়া থাকিবে (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণপূর্বক সমাহিতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিবে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ব কয়েক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে উপবাসাদি বাহ্যিক উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ের চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয় না, বিচারবুদ্ধির দ্বারাও ইন্দ্রিয় সম্যক্ জয় করা যায় না। ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া 'আমার' অর্থাৎ পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে (মৎপরঃ), 'আমাতে' যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

৫৯ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পরমাত্মার দর্শনলাভ করিলে ভোগ্যবিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে আকর্ষণ তাহাও বিনষ্ট হয়। এই শ্লোকে বলা হইল যে যোগী পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়া তাহাতেই যুক্ত হইয়া থাকিবেন। বুদ্ধি ঈশ্বরে যুক্ত হইলে মন বা ইন্দ্রিয় আর তাহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবে না। মানুষের মন বুদ্ধির মধ্যে ইন্দ্রিয়জয়ের সম্পূর্ণ শক্তি নাই, আত্মার মধ্যেই সেই শক্তি আছে; অতএব এই আত্মাকে লাভ করিয়া তাহাতেই যুক্ত হইয়া থাকিবে। যেমন প্রবল দস্যুর আক্রমণ হইলে শক্তিমান রাজাকে আশ্রয় করিয়া দস্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যায় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করা দরকার। রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলে দস্যু তস্কর যেরূপ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হইবে, বুদ্ধিও স্থির হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়জয়ের যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার উপকারিতা সাধারণ মানবজীবনেও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল হইলে অনেক স্থলে নিজের চেষ্টাদ্বারা তাহা জয় করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন ভগবানের শরণ লইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে অনেক সময় বল পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয় সংযত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়জয়ের পক্ষে ভগবানের আশ্রয় লওয়াই হইতেছে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই প্রকারের ইন্দ্রিয়জয় করিয়া যে নিগৃহীত-মন সমাহিত যোগী ভগবান বাসুদেবের প্রতি আসক্ত হন তাঁহার আর পতনের আশংকা থাকে না। বলবান ইন্দ্রিয়গুলিও আর তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। এইরূপে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া যিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমে আপনাকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনিই যে ভগবান একথা বলেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে তিনি যেকথা বলিয়াছেন তাহা জীবভাবেই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তির যে বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহাই পরে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু সঙ্গঃ জায়তে (তাহাতে আসক্তি জন্মে) সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে (আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়) কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (কাম হইতে ক্রোধ জন্মে) ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি (ক্রোধ হইতে চিত্তের সম্মোহ হয়) সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (সম্মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম হয়) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (স্মৃতিবিভ্রংশ হইলে বুদ্ধির নাশ হয়) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (বুদ্ধিনাশ হইলে মানুষ বিনষ্ট হয়)।

শব্দার্থঃ বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ—শব্দাদি-বিষয়-বিশেষের চিন্তা বা আলোচনাকারী পুরুষের (শ); বিষয়সকলের পুনঃপুনঃ চিন্তাকারী পুরুষের (ম, ব)। সঙ্গঃ—আসক্তি, প্রীতি (শ); সম্বন্ধ (নী); 'ইহারা আমার অত্যন্ত সুখের হেতু' : এই প্রকার প্রীতিবিশেষ (ম)। কামঃ—তৃষ্ণা (শ); 'ইহারা আমার হউক' : এইপ্রকার তৃষ্ণা (ম)। কামাৎ—কোনও কারণে প্রতিহত কাম হইতে (শ)। ক্রোধঃ—চিত্তজ্বালা (ব); আত্মার জ্বালাকর ক্রোধ (ম)। সম্মোহঃ—অবিবেক, কার্যাকার্য বিষয়বিভ্রম (শ) ; কার্যাকার্য বিবেকের অভাব (ম, শ্রী) স্মৃতিবিভ্রমঃ—শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-সংস্কারজনিত স্মৃতির ভ্রংশ (শ); ইন্দ্রিয়-বিজয়াদির যে প্রযত্ন ছিল তাহার বিভ্রম (ব)। বুদ্ধিনাশঃ—কার্যাকার্য বিষয়-বিচারে অন্তঃকরণের অযোগ্যতা (শ); আত্মজ্ঞান লাভার্থ অধ্যবসায়ের নাশ (ব)। প্রণশ্যতি—সর্বপুরুষার্থ লাভের অযোগ্য হয় (শ, ম); মৃত্যুতুল্য হয় (শ্রী); পুনরায় বিষয়ে নিমগ্ন হয় (ব); সংসারকূপে পতিত হয় (ব)।

শ্লোকার্থঃ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মানুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, কামনা ব্যাহত হইলে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে অবিবেক এবং অবিবেক হইতে স্মৃতির বিলোপ হয়। স্মৃতি বিভ্রম হইলে বিচারবুদ্ধি লোপ পায় এবং বিচারবুদ্ধি নষ্ট হইলে মানুষ স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

ব্যাখ্যাঃ কি প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ সংযত করা যাইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের ফল কি পূর্ব শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও মন সংযত না হইলে কি অনিষ্ট হয়, কেমন করিয়া যোগীর সর্বনাশ উপস্থিত হয় তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

ধ্যায়তঃ বিষয়ান্ পুংসঃ—ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য কোনও বস্তু উপস্থিত হইলেই মন অনুরাগের সহিত উহার পর্যবেক্ষণ করে এবং উহার বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে থাকে। কোনও সুন্দরী রমণী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে চক্ষু তাহার রূপসুধা পান করে। তারপর সেই রমণী দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইলেও মন তাহার রূপের চিন্তা করিয়া থাকে।

সঙ্গঃ তেষু উপজায়তে—কোনও বিষয়ের বারংবার চিন্তা বা আলোচনা হইলে সেই বিষয়ের প্রতি মনের একটা আসক্তি জন্মে। এই আসক্তি প্রথমে অস্ফুট আকারে উপস্থিত হয়, ইহা একটা অন্ধ আকর্ষণ বা টানমাত্র।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ—আসক্তি বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিনষ্ট বা দূরীভূত না হইলে ঐ বস্তু

পাওয়ার জন্য মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আসক্তির বস্তুটিকে পাওয়াই চাই, উহা না পাইলে চলিবে না—এরূপ একটা আগ্রহ উপস্থিত হয়। ইহাই বাসনার তীব্র রূপ।

কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে—যতক্ষণ কামনার বস্তুটি না পাওয়া যায় ততক্ষণ প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। কোনও কারণে কামনাপূরণের বাধা জন্মিলে চিত্তে একটা জ্বালা উপস্থিত হয়—ইহাই ক্রোধ। কোনও ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক কামনা ব্যাহত হইলে ক্রোধ তাহার প্রতি ধাবিত হয়।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ—মনে ক্রোধের উদয় হইলে সমস্ত অন্তঃকরণ একটা মোহে যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। অজ্ঞান আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। সদসৎ বিচার-বুদ্ধি লুপ্ত হয়। বুদ্ধি আত্মাকে হারাইয়া ফেলে। উহাকে আর দেখিতে পায় না—ইহাই সম্মোহ।

সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ—অন্তঃকরণ মোহাচ্ছন্ন হইলে শাস্ত্রাচার্যোপদেশে যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল তাহা আর মানসপথে উদিত হয় না ; ইন্দ্রিয়জয়ের, আত্মজ্ঞানলাভের যে চেষ্টা হইতেছিল তাহারও বিস্মৃতি হয়। বুদ্ধি তখন শান্ত সাক্ষী আত্মাকে দেখিতে এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইতে ভুলিয়া যায়। এই সংসারই আমাদের জীবনের সবখানি বলিয়া মনে হয়—ইহাই স্মৃতিবিভ্রম।

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ—এইপ্রকার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিলে আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। আত্মজ্ঞানলাভই জীবনের লক্ষ্য, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহার লোপ পায়। দুঃখক্রোধাদির আতিশয্যে বুদ্ধি যেন অদৃশ্য হয়। উহা আর তাহার প্রকৃত কার্য সদসৎ বিচার, তাহা করিতে পারে না—ইহাই বুদ্ধিনাশ।

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়ে, সে কামক্রোধপূর্ণ, শোকদুঃখময় হইয়া উঠে। মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। সে পশুরই তুল্য হইয়া পড়ে—ইহা মানুষের মৃত্যুতুল্য অবস্থা। যতক্ষণ সে বুদ্ধিকে ফিরিয়া না পাইতেছে ততক্ষণ বলিতে পারা যায় যে সে বিনষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং বিনাশ হইতে যদি আপনাকে রক্ষা করিতে হয় তবে ইন্দ্রিয়জয় করিতেই হইবে।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ তু (রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত) আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ (আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা) বিষয়ান্ চরন্ (বিষয়সকলে বিচরণ করিয়া) বিধেয়াত্মা (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি (প্রসন্নতা লাভ করেন)।

শব্দার্থঃ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ—রাগ [আসক্তি] এবং দ্বেষ হইতে বিমুক্ত, রাগদ্বেষ-রহিত (শ্রী)। আত্মবশ্যৈঃ—মনের বশীভূত (শ্রী) ; আত্মবশীভূত, স্বাধীন (ম)। বিষয় বিষয়ান্ চরন্—বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়া, বিষয়সকল প্রাপ্ত হইয়া (ম); বিষয় উপভোগ করিয়া (শ্রী)। বিধেয়াত্মা—বিধেয় [বশবর্তী] আত্মা [মন] যাহার (শ্রী); স্বাধীনমনাঃ, মদর্পিতমনাঃ (ব), কিঙ্করীকৃতমনাঃ (নী)। প্রসাদম্—প্রসন্নতা, চিত্তের স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য (শ) ; শান্তি (শ্রী) ; নির্মলতা (রা) ; সাক্ষাৎকার (ম)।

শ্লোকার্থ ঃ নিজের চিত্ত যাঁহার বশে আছে এরূপ ব্যক্তি রাগদ্বেষবিহীন আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ বিষয়ের চিন্তা হইতে কি মারাত্মক অনর্থের উৎপত্তি হয় পূর্বের দুই শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। বিষয়ের ধ্যান হইতে মনের আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে একেবারে বিনাশ। প্রশ্ন হইতে পারে বিষয় যদি এতই অনিষ্টকর হয় তবে তো বিষয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করাই শ্রেয়। এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'না—তা নয়, শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত সংসার কি বিষয় কিছুই ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই।' কর্ম করিয়াও কি প্রকারে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় একথা পূর্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সংসারে থাকিয়া বিষয়ভোগ করিয়াও কি প্রকারে চিত্তের প্রসন্নতা, সেইহেতু সর্বদুঃখের হানি এবং পরিশেষে স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে তাহাই এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে।

অনুকূল বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি বিরাগ, ইন্দ্রিয়-গণের এই ধর্ম প্রকৃতি কর্তৃকই নির্দিষ্ট আছে। মিষ্ট দ্রব্যের প্রতি জিহ্বার আকর্ষণ এবং তিক্ত দ্রব্যের প্রতি বিরাগ—ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ সুন্দর দ্রব্যের উপর চক্ষুর অনুরাগ এবং কুৎসিত বস্তুর উপর বিরাগ—ইহাও সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি ইন্দ্রিয়গণের এই স্বাভাবিক গতিকে নিরোধ করিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে আপনার বশীভূত করিয়াছেন তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বিষয় পাইলেও তাহাতে অনুরক্ত হন না, অপ্রীতিকর বিষয় পাইলেও তাহাতে বিরক্ত হন না। আবার কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়েও দ্বেষ দেখা যায়। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতিকে চাপিয়া রাখিয়া অনুকূল বিষয়ের প্রতি একটা দ্বেষের সৃষ্টি করিয়া লন। যেমন অনেকে মিষ্ট দ্রব্যকে, সুন্দর রূপকে, সুমিষ্ট শব্দকে বর্জন করিয়া থাকে। অনেকের বিবাহের উপর বিতৃষ্ণা হয়। এস্থলে বলা হইয়াছে যে অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক কোনটার প্রতিই অনুরাগও থাকিবে না, দ্বেষও থাকিবে না—সর্বত্র সমভাবাপন্ন হইতে হইবে।

কিন্তু মন জয় না হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয় না। মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা। অনুরাগ ও দ্বেষ বাস্তবিক পক্ষে মনেরই বৃত্তি। ইন্দ্রিয় মনের বাহন মাত্র। অশ্বারোহী যেমন সর্বদা অশ্বের উদ্দাম গতিকে সংযত করিয়া রাখেন, মন তদনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করে। মনকে সংযত করিতে বুদ্ধির দরকার। কাজেই সাধক মন দ্বারা ইন্দ্রিয়কে এবং বুদ্ধি দ্বারা সর্বদা মনকে সংযত করিয়া রাখিবেন। এই-প্রকারে যাঁহার ইন্দ্রিয় অনুরাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত, যাঁহার মন আত্মার বশীভূত, তিনি বিষয়ে বিচরণ করিলেও, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।

যাহারা মনে করে যে আত্মার শান্তিলাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করা আবশ্যক, কর্ম ত্যাগ করা দরকার, তাহাদের মত গীতার অনুমোদিত নহে। এই শ্লোকে এবং পরেও গীতা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে আত্মার শান্তি এবং প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত সংসারত্যাগ বা কর্মত্যাগ আবশ্যক নহে। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত হইতে কামনাবাসনা [illegible]রিত

হইয়াছে তিনি সংসারে থাকিয়াও ব্রাহ্মী স্থিতি বা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই যে চিত্তপ্রসাদের কথা বলা হইয়াছে ইহা হৃদয়ের একটি সুন্দর মধুর অবস্থা। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নিজ আনন্দেই বিভোর, সুখেও তাহার হর্ষ নাই, দুঃখেও বিষাদ নাই। কত সুখদুঃখ, আপদ-সম্পদের ঝড় তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু নির্বিকার, নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় তিনি ধীর স্থির। তাঁহার চিত্ত উদার বিশাল স্থির সমুদ্রের মত। আত্মানন্দে তিনি মগ্ন, কাহারও প্রতি অনুরাগ নাই, দ্বেষ নাই—সর্বত্র সমভাবাপন্ন। এপ্রকার চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

অন্বয় ঃ প্রসাদে [সতি] (চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে) অস্য (ইহার) সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে (সকল দুঃখের অবসান হয়) প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি) আশু পর্যবতিষ্ঠতে হি (শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়)।

শব্দার্থ ঃ প্রসাদে [সতি]—চিত্ত প্রসন্ন হইলে, চিত্তের স্বচ্ছতা জন্মিলে (ম)। সর্বদুঃখানাম্—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের (শ); অজ্ঞানবিলসিত (ব); কামমূলক (নী); প্রকৃতিসংসর্গকৃত দুঃখসমূহের। প্রসন্নচেতসঃ—স্বচ্ছান্তঃকরণ যতির (শ)। বুদ্ধিঃ—বিবিক্তা আত্মবিষয়া বুদ্ধি (রা); ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যনিশ্চয়কারিণী বুদ্ধি। পর্যবতিষ্ঠতে—প্রতিষ্ঠিত হয়, আত্ম-স্বরূপে নিশ্চল হয় (শ); স্থির হয় (ব); সুদৃঢ় হয় (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে অর্থাৎ চিত্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল হইলে যোগীর সকল দুঃখের অবসান হয়। যাঁহার চিত্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল তাঁহার বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত-প্রসন্নতার কি ফল তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। কারণ যে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ তাহা না পাইলে অথবা যে বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিরক্তি তাহা উপস্থিত হইলে চিত্তে দুঃখ জন্মে। কিন্তু যাহার ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক রাগদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে, যাহার মন আত্মার বশবর্তী, চিত্ত প্রসন্ন, তাহার আর দুঃখের কি কারণ থাকিতে পারে? ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, মন প্রশান্ত এবং সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইলে বুদ্ধির চঞ্চলতাও দূর হইবে। বুদ্ধি তখন মনের অসংখ্য কামনাবাসনা দ্বারা বিচলিত না হইয়া ঈশ্বরে সমাহিত হইবে।

এই আত্মপ্রসাদই আত্মার প্রকৃত সুখের মূল। এইরূপ শান্ত প্রসন্ন আত্মাকে কোন দুঃখই স্পর্শ করিতে পারে না, দুঃখের অবসান হয়। এইরূপ আত্মজ্ঞানে আত্ম-প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির শান্ত বাসনাশূন্য স্থিরতাকেই গীতাতে সমাধি বলা হইয়াছে।[১]

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

অন্বয় ঃ অযুক্তস্য (অযুক্ত পুরুষের) বুদ্ধিঃ ন অস্তি (বুদ্ধি নাই) অযুক্তস্য

১ অনিলবরণ রায়, অরবিন্দের গীতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯

(অযুক্ত পুরুষের) ভাবনা চ ন (ভাবনাও নাই) অভাবয়তঃ (ভাবনাবিহীনের) শান্তিঃ চ ন (শান্তিও নাই) অশান্তস্য সুখম্ কুতঃ (অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়)।

শব্দার্থ ঃ অযুক্তস্য—অসমাহিতান্তঃকরণ (শ), অবশীকৃতেন্দ্রিয় (শ্রী), অজিত-চিত্ত (ম) পুরুষের; অযোগীর; 'আমাতে' অনিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির (ব); 'আমাতে' সংন্যস্তমনরহিত লোকের (রা)। বুদ্ধিঃ—আত্মরূপবিষয়া বুদ্ধি (শ); শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতা আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা (শ্রী); আত্মবিষয়া শ্রবণ-মননাখ্য-বেদান্ত-বিচারজন্যা বুদ্ধি (ম)। ভাবনা—আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শ); ধ্যান (শ্রী); পরমেশ্বরধ্যান (বি); আত্মচিন্তা (ব)। অভাবয়তঃ—আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ-শূন্য ব্যক্তির (শ); আত্মধ্যানরহিত (শ্রী); পরমেশ্বরের চিন্তাশূন্য পুরুষের। শান্তিঃ – বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তি (ব); আত্মাতে চিত্তের উপরতি (শ্রী); উপশম (শ)। অশান্তস্য—বিষয়স্পৃহাযুক্ত (রা); বিষয়তৃষ্ণাকুল (ব); আত্মসাক্ষাৎকার-শূন্য (ম) পুরুষের। সুখম্—আত্মানন্দরূপ সুখ, মোক্ষানন্দ (শ্রী); নিত্য, নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি (রা)।

শ্লোকার্থ ঃ যাহার চিত্ত স্থির ও সমাহিত হয় নাই তাহার আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা জন্মিতে পারে না; যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই তাহার পরমেশ্বরে ধ্যান বা আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ না জন্মিলে চিত্তের শান্তি হয় না, চিত্ত শান্ত না হইলে আত্মানন্দরূপ সুখও হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ ইন্দ্রিয়সংযমের কি ফল তাহা পূর্ব দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে। অযুক্ত অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অবস্থার কি পার্থক্য হয় তাহাই এখন বলা হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয় বশীকৃত হয় নাই, যাহার চিত্ত চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত, তাহার ভগবদ্বিষয়ের বুদ্ধি জন্মে না অর্থাৎ যে বুদ্ধি মানুষের মনকে বিষয়ভোগ হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া পরমেশ্বরে সমাহিত করে সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় লোকের হয় না। সে ব্যক্তি পরমেশ্বরের ধ্যান বা চিন্তাও করিতে পারে না; কারণ পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে হইলে চিত্তস্থৈর্যের দরকার, কিন্তু অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্তের স্থৈর্য হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে পারে না, তাহার শান্তি কোথায়? যিনি শান্তিময় তাঁহারই চিন্তায় মন শান্ত হইতে পারে, নচেৎ বিষয়চিন্তায় চঞ্চল মন কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। অশান্তচিত্তে আত্মতৃপ্তি বা আত্মানন্দরূপ যে নির্মল সুখ তাহারও অনুভূতি হয় না। বিষয়ভোগে যে সুখ জন্মে তাহা তো দুঃখেরই নামান্তর।

এই শ্লোকে মানবজীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। মানুষ সংসারে কেবলই সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। দুঃখকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—ইহার জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহা সুখপ্রদ তাহার লাভের জন্য মানুষ কতই না চেষ্টা করিতেছে, কত রকমের পরীক্ষা চলিতেছে, কত বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু দুঃখ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এই প্রশ্নের মীমাংসায় গীতা বলিতেছে—বাহিরের বিষয় হইতে সুখবৃদ্ধির এবং দুঃখনিবৃত্তির যতই চেষ্টা করা হউক তাহাতে সম্যক্ সফলতা লাভ করা যাইবে না। কারণ সুখদুঃখ অন্তরের জিনিষ। কাজেই চিত্তকে সংযত ও নির্মল করিতে না পারিলে প্রকৃত সুখ হইতে পারে না। মন যদি অনুরাগ, দ্বেষ কামনাবাসনা দ্বারা পূর্ণ থাকে তবে সুখের বিস্তর আয়োজন থাকিলেও তাহাতে প্রকৃত

সুখ হইবে না। কোন মানুষেরই সমস্ত কামনা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। আবার কোন বিষয়ে একজনের কামনা পূর্ণ হইলে তাহাদ্বারা হয়তো অপরের কামনা ব্যাহত হয়, একজনের ধনবৃদ্ধি হয়তো অপরের দারিদ্র্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, এক-জনের মান হয়তো অপরের অপমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর এক কামনার পূরণ হইতে না হইতে অপর শত কামনা চিত্তে জাগিয়া উঠে। অতএব বিষয়ের দ্বারা কামনাবাসনা পূর্ণ করিয়া সুখলাভ অসম্ভব ব্যাপার। তারপর অনুরাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিমান, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিগুলি মানুষকে সর্বদাই দুঃখের পথে লইয়া যায়। প্রকৃত সুখলাভের পথ—ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তজয়। কেবল বাহিরের প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্টা না করিয়া আন্তর প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য আদর্শ—বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়া দুঃখের ভাগ কমাইয়া দিয়া সুখের ভাগ বৃদ্ধি করা। প্রাচ্য আদর্শ—আন্তর প্রকৃতিকে জয় করিয়া সুখদুঃখের অতীত হওয়া।

ভারতের আদর্শ যে পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা অনেক উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বাহিরকে একবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ বাহ্য প্রকৃতি ও আন্তর প্রকৃতি একই সূত্রে গ্রথিত। কাজেই বাহ্য প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাগুলিকেও জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আন্তর প্রকৃতির জয়ই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। আন্তর প্রকৃতি জয়লাভ না করিলে বাহিরের শত আয়োজনও প্রকৃত সুখ দিতে পারিবে না। তাই গীতার মহাবাক্য আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—'ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'—যে ঈশ্বরচিন্তা করে না তাহার চিত্তের শান্তি নাই এবং অশান্ত চিত্তের কখনও সুখ হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

অন্বয় ঃ হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চরতাম্ ইন্দ্রিয়ানাং (বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের) যৎ অনুবিধীয়তে (যেটির অনুসরণ করে) তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলমধ্যে নৌকাকে বিচালিত করে) অস্য প্রজ্ঞাং হরতি (তদ্রূপ উহার প্রজ্ঞা হরণ করে)

শব্দার্থ ঃ চরতাম্—স্ববিষয়ে প্রবর্তমান (শ); স্বেচ্ছামত বিষয়ে চরমাণ (শ্রী); অবশীকৃত (ম)। অনুবিধীয়তে—অবশীকৃত হইয়া অনুগমন করে (শ্রী); লক্ষ্য করিয়া প্রবর্তমান হয়। তৎ—সেই এক ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত মন (শ); মন কর্তৃক অনুসৃত এক ইন্দ্রিয় (ম)। প্রজ্ঞাম্—আত্মানাত্মবিবেকরূপ জ্ঞান (শ); বুদ্ধি (শ্রী); আত্মবিষয় শাস্ত্রীয় বুদ্ধি (ম)। হরতি—বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে (শ্রী)। অস্য—ঐ যতির (শ); ঐ পুরুষের বা মনের (শ্রী); ঐ সাধকের (নী, ম)।

শ্লোকার্থ ঃ প্রতিকূল প্রবল বায়ু যেমন জলমধ্যস্থ নৌকাকে বিপথে চালিত করিয়া নষ্ট করে সেইরূপ মানুষের মন বিষয়ভোগনিরত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যখন যেটির বশীভূত হয় তখন সেইটিই উহাকে বিপথে চালিত করিয়া পুরুষের প্রজ্ঞা অর্থাৎ আত্মবিষয়া বুদ্ধিকে বিনাশ করে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে যে অযুক্ত অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই।

কেন নাই তাহা এখন বলা হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়গণ কেবলই উহাদের অনুকূল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুন্দর বস্তু অনিষ্টকর হইলেও চক্ষু সর্বদা তাহা দেখিতে চায়, এইরূপ কর্ণ অনিষ্টকর সুমিষ্ট শব্দের পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং জিহ্বার স্বাভাবিক আকর্ষণ সুস্বাদু বস্তুর উপর। ইন্দ্রিয়ের এই উদ্দাম গতি মন দ্বারাই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সাধকের মন যদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে না রাখিয়া কোন এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তাহা হইলে ঐ একটি উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ই তাহার বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করিতে পারে। যাহার মন ইন্দ্রিয়ের প্রভু না হইয়া উহার দাসত্ব স্বীকার করে তাহার আত্মবিষয়া বুদ্ধি যে বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণ অবশীকৃত ইন্দ্রিয় মনকে আপনার দিকে টানিয়া লয়; ইন্দ্রিয়ানুগত মন আবার বুদ্ধিকে আপনার বশে আনিয়া পুরুষকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে।

সমুদ্রস্থিত তরণীর নাবিক যদি অসাবধান বা প্রমত্ত হয় তবে প্রবল বায়ু সেই নাবিককে সমুদ্রে ইতস্ততঃ ঘুরাইয়া অবশেষে তাহার অবলম্বন নৌকাকে জলমগ্ন করে। সেইরূপ যোগীর মনও যদি অসাবধান হয় তবে ইন্দ্রিয়সকল সেই যোগীকে বিষয়ে ঘূর্ণায়িত করিয়া তাহার বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করে। এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়গণকে বায়ুর সহিত, সাধককে নাবিকের সহিত, সংসার বা বিষয়কে সমুদ্রের সহিত এবং বুদ্ধিকে নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বায়ু যেমন একদিকে বলবান অপর-দিকে চঞ্চল ও উদ্দামগতি, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও অতি বলবান এবং উচ্ছৃঙ্খল। সংসার সমুদ্রেরই ন্যায় বিশাল, দুরতিক্রম্য এবং বিপদসঙ্কুল। নৌকাটি যেমন নাবিকের একমাত্র সম্বল, সমুদ্র অতিক্রমের একমাত্র উপায়, বুদ্ধিও তেমনি পুরুষের একমাত্র আশ্রয় এবং সংসারসমুদ্র অতিক্রম করিবার একমাত্র অবলম্বন। এই বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণ বিপর্যস্ত করিতে না পারে সেইজন্য সাধককে সর্বদা সাবধান ও অপ্রমত্ত থাকিতে হইবে।

মন একটি ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করিলেই যখন পুরুষের বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, তখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় যুগপৎ বলবান হইয়া মনকে আকর্ষণ করিলে তাহার কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা একটি শ্লোকে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।[১] শ্লোকটির অর্থ হইল: কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের একটি ইন্দ্রিয় প্রবল বলিয়া ইহারা প্রাণ হারায়। পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে), মাতঙ্গ স্পর্শে, ভৃঙ্গ পুষ্পের গন্ধে, কুরঙ্গ বাঁশীর শব্দে আর মীন রসে (বঁড়শীর খাদ্যে) মুগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জন দেয়। আর মানুষের মন যদি পাঁচটি বিষয়েই এককালে আসক্ত হয় তবে তাহার যে দুর্গতি হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

অন্বয়ঃ তস্মাৎ (সেই হেতু) মহাবাহো (হে বিশালভুজ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি (যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে) সর্বশঃ নিগৃহীতানি (সর্ব-প্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত)।

১ শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্ ॥

শব্দার্থঃ তস্মাৎ—সেই কারণে; যেহেতু ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিতে বিবিধ দোষ হয় সেই হেতু (শ); যেহেতু মন্নিষ্ঠমনাঃ ব্যক্তির আত্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয় (ব), সেই হেতু। মহাবাহো—প্রভূতবাহুবলসম্পন্ন অর্জুন। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে; শব্দার্থ-বিষয় হইতে (নী)।

শ্লোকার্থঃ যেহেতু ইন্দ্রিয় মনকে টানিয়া নিজের অধীন করে এবং মন বুদ্ধিকে স্ববশে টানিয়া লয়, সেইহেতু, হে মহাভুজশালী অর্জুন, যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যাঃ স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম যে একান্ত আবশ্যক, ইন্দ্রিয়ের অসংযম পুরুষের বুদ্ধিনাশ করিয়া যে তাহাকে মোক্ষপথ হইতে ভ্রষ্ট করে—এই কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া এখানে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। যেহেতু ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইলে বুদ্ধির স্থৈর্য নষ্ট হয়, এই কারণে সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়সংযমের দরকার। ইন্দ্রিয় সংযত হইলে মন স্থির হইবে, মন স্থির হইলে বুদ্ধিও স্থির হইয়া ঈশ্বরে সমাহিত হইবে।[১]

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

অন্বয়ঃ সর্বভূতানাং (সকল জীবের) যা নিশা (যাহা রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে) সংযমী জাগর্তি (সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন) যস্যাং (যাহাতে) ভূতানি জাগ্রতি (জীবগণ জাগ্রত থাকে) সা (তাহা) পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা (তত্ত্বদর্শী মুনির রাত্রি)।

শব্দার্থঃ সর্বভূতানাম্—সকল জীবের, রাত্রিচরস্থানীয় অজ্ঞ জীবগণের (শ); বাসনা-কামনাবদ্ধ জীবসমূহের। যা—আত্মবিষয়া বুদ্ধি (রা); আত্মনিষ্ঠা, আত্মসংযম, 'আমিই ব্রহ্ম': এই প্রজ্ঞা (ম)। নিশা—রাত্রিতুল্যা, রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময়ী। সংযমী—নিগৃহীতেন্দ্রিয় ব্যক্তি (শ্রী); সংযমবান জিতেন্দ্রিয় যোগী (শ)। জাগর্তি—অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সাবধান থাকেন (ম); প্রবুদ্ধ হন (শ্রী)। পশ্যতঃ—আত্মতত্ত্বদর্শনকারী মুনির (শ্রী); আত্মদর্শনবান যোগীর (নী)।

শ্লোকার্থঃ সমস্ত জীবের পক্ষে যাহা রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময় অর্থাৎ যে আত্মবিষয়ক বুদ্ধিতে জীবগণ অন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সে বিষয়েই দৃষ্টিমান; পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারে জীবগণ সচেতন তাহাতে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ সেই বিষয়ে তাঁহার মোটেই দৃষ্টি নাই।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকে দিবাচর ও নিশাচর জীবের তুলনা করিয়া সংযমী যোগী ও অসংযতেন্দ্রিয় বিষয়ীর পার্থক্য দেখান হইয়াছে। মনুষ্যাদি জীবগণ দিবাভাগে জাগ্রত থাকে, সেই সময়েই তাহাদের চেতনা ও কর্মের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; রাত্রিকাল তাহাদের নিকট অন্ধকারময়, তখন তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে, কোন চেতনা বা চেষ্টা থাকে না। পক্ষান্তরে পেচকাদি জন্তু দিবাভাগে নিদ্রিত, দৃষ্টিহীন ও নিশ্চেষ্ট থাকে, রাত্রিকালে দেখিতে পায় ও চলাফেরা করে। সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয়

১ এই অধ্যায়ের ৫৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ভোগী লোকেরা ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্যবিষয়ে সর্বদা জাগ্রত, উহাতেই তাহাদের স্পষ্ট অনুভূতি, উহাই তাহারা বুঝে এবং উহার লাভের জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করে। বিষয়সমূহ তাহাদিগের নিকট দিবার ন্যায় স্পষ্ট। অপরদিকে পরমার্থতত্ত্ব তাহাদের নিকট রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময়, আত্মজ্ঞানে তাহাদের কোনও বোধ নাই, কোন চেতনা নাই, উহা লাভের জন্য কোন চেষ্টাও নাই। পক্ষান্তরে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মুনি বিষয়ভোগে নিদ্রিত, রাত্রির ন্যায় উহা তাঁহার নিকট অন্ধকারময়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তাঁহার কোনও চেতনা নাই, তাহা লাভের জন্য কোন চেষ্টাও নাই। কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষয়ে তিনি জাগ্রত, দিবালোকের ন্যায় উহা তাঁহার নিকট স্পষ্ট এবং ঐ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি সর্বদা ব্যগ্র।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঃ

> সংসারবন্ধ জীবের যে অবস্থা, যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি ইহা (জ্ঞানীর অনুভূতি) তাহার বিপরীত। এই যে দ্বন্দ্বময় জীবন তাহাদের নিকট দিবসের স্বরূপ—এই জীবন তাহাদের জাগ্রতাবস্থা, তাহাদের চেতনা—এই অবস্থাতেই তাহারা কার্য করিবার, জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ পায়—এই জীবন যোগীর নিকট রাত্রিস্বরূপ, আত্মার কষ্টকর নিদ্রা ও অন্ধকার স্বরূপ। আবার তাহাদের যাহা রাত্রি, যে নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হয় তাহাতে সংযমী জাগ্রত হন, সেই অবস্থাতেই তাঁহার প্রকৃত জীবন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির উজ্জ্বল দিবস।

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

অন্বয় ঃ যদ্বৎ (তেমন) আপঃ (বারিধারাসমূহ) আপূর্যমানম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠং (সর্বদা একভাবে স্থিত) সমুদ্রং (সমুদ্রে) প্রবিশন্তি (প্রবিষ্ট হয়) তদ্বৎ (তদ্রূপ) সর্বে কামাঃ (কাম্য বিষয়সমূহ) যং প্রবিশন্তি (যাহাতে প্রবেশ করে) সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি (তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন) কামকামী ন (ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি পায় না)।

শব্দার্থ ঃ আপূর্যমাণম্—নানা নদনদী দ্বারা পরিপূর্ণ (শ্রী); স্বরূপেই পরিপূর্ণ (ম); নিজেই পরিপূর্ণ (রা)। অচলপ্রতিষ্ঠম্—অচলা [স্থিরা] প্রতিষ্ঠা [অবস্থিতি] যাহার (শ), বেলাভূমিকে যে উল্লঙ্ঘন করে না (ব); অনতিক্রান্তমর্যাদ (শ্রী, ম)। আপঃ—সর্বত্রগত জল (শ); নদীর জলসমূহ, বৃষ্ট্যাদিপ্রভব জল (ম); প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয়সকল। যদ্বৎ সমুদ্রং প্রবিশন্তি—যেরূপ সমুদ্রে কোনও হ্রাসবৃদ্ধি উৎপাদন না করিয়া তথায় প্রবেশ করে। তদ্বৎ—সেইরূপ অর্থাৎ কোনও বিকার উৎপাদন না করিয়া। যম্—যে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ভোগদ্বারা অবিক্রিয়মাণ মুনিকে (শ্রী); যে স্থিতপ্রজ্ঞ নির্বিকার পুরুষকে (ম)। শান্তিং আপ্নোতি—মোক্ষপ্রাপ্ত হয় (শ); দুঃখের আত্যন্তিক উপরতি লাভ করে। কামকামী—ভোগকামনাশীল (শ্রী); বিষয়লিপ্সু (ব) ব্যক্তি।

শ্লোকার্থ ঃ স্বয়ংপরিপূর্ণ, হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য, অতএব অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রে জলস্রোতসমূহ প্রবেশ করিলেও যেমন উহার কোন প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি বা বিচলন হয় না, তদ্রূপ বিষয়ভোগসকল সংযমীর চিত্তে সেইভাবে প্রবেশ করিলেও তাঁহার চিত্তের কোনরূপ বিকার বা চঞ্চলতা উৎপাদন করে না; বরং তিনি পরম শান্তিলাভ করেন। পক্ষান্তরে ভোগকামনাপরায়ণ ব্যক্তি কিছুতেই শান্তি পায় না।

ব্যাখ্যা ঃ জিতেন্দ্রিয় যোগীকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সহিত ভোগকামনাশীল ব্যক্তির প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগীর চেতনা বিশাল সমুদ্রের ন্যায়। উহা প্রশান্ত, গভীর, আত্মার বিরাট শান্তিতে নিথর, নিশ্চল। অপরপক্ষে সংসারবন্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্ত কর্দমাক্ত জলস্রোতের মত। কামনার সামান্য বেগেই উহা বিচলিত হয়। যেমন স্বতঃপরিপূর্ণ প্রশান্ত বিরাট সমুদ্রে নদনদী বা বৃষ্টির জলধারা প্রবেশ করিলেও উহার কোনই বিচলন হয় না, পূর্বে যেমন পরিপূর্ণ প্রশান্ত ছিল তেমনই থাকে কখনও উছলিয়া উঠে না অথবা বেলাভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ যোগীর চিত্তও সর্বদাই আত্মানন্দে পরিপূর্ণ থাকে, কামনার ভোগসকল সে চিত্তে প্রবেশ করিলেও তাঁহার কোন বিকার হয় না, তাঁহার চিত্ত কখনও উছলিয়া উঠে না অথবা সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে না। তাঁহার বিশাল চিত্তে উহারা বিলীন হইয়া যায়।

এস্থলে সমুদ্রের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তের যে তুলনা করা হইয়াছে তাহার সাদৃশ্যজ্ঞাপক লক্ষণগুলি প্রণিধানের যোগ্য ঃ (১) সমুদ্র বিশাল গভীর, যোগীর চিত্তও ভগবানে সমাহিত থাকায় তাহারই ন্যায় গভীর, সীমাহীন, অনন্ত, (২) সমুদ্র নদনদী বা বৃষ্টিধারা খোঁজে না, সেইরূপ যোগীও কোন কামনাজাত সুখ খোঁজেন না, (৩) সমুদ্র স্বতঃই পরিপূর্ণ, জলের উৎস উহার ভিতরেই রহিয়াছে, যোগীর চিত্তও তদ্রূপ—আত্মানন্দের উৎস উহার ভিতরেই রহিয়াছে, (৪) বাহির হইতে জলধারা আসিয়া পতিত হইলেও সমুদ্র কখনও উচ্ছলিত হইয়া উঠে না, কখনও বেলাভূমি অতিক্রম করে না; সেই প্রকার যোগীর চিত্তেও কামনার বিষয়সমূহ প্রবেশ করিলেও সে চিত্তে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সামান্য কর্দমাক্ত ক্ষুদ্র নদীর ন্যায়। ক্ষুদ্র নদী স্বতঃপরিপূর্ণ নহে, উহার ভিতরে কোনও জলের উৎস নাই। বাহির হইতে আগত জলধারা দ্বারাই উহা পূর্ণ হইয়া থাকে। কামী ব্যক্তিরও ভিতরে আনন্দের কোনও উৎস নাই, বাহির হইতে কামনার যে স্রোত আসে তাহাদ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র নদীধারা পরিমিত, সংকীর্ণ, অগভীর; বিষয়াসক্ত লোকের হৃদয়ও সংকীর্ণ অগভীর। ক্ষুদ্র নদীর জল সর্বদাই চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ, কখনও স্থির থাকে না; কামীর চিত্তও সর্বদাই চঞ্চল, অস্থির। বাহির হইতে কোন জলধারা প্রবেশ করিলেই ক্ষুদ্র নদী উছলিয়া উঠে এবং তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়, ভোগীর চিত্তও বাহির হইতে আগত বিষয়ের সংস্পর্শে উছলিয়া উঠে এবং সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

অন্বয় ঃ যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্বান্ কামান্ বিহায় (সকল কামনা ত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ নিরহংকারঃ নির্মমঃ (স্পৃহাশূন্য, অহংকারশূন্য ও মমতাবিহীন হইয়া) চরতি (বিষয়ে বিচরণ করেন) সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (তিনি পরম শান্তিলাভ করেন)।

শব্দার্থ ঃ যঃ পুমান্‌—যে স্থিতপ্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, যে সন্ন্যাসী (শ)। সর্বান্‌ কামান্‌—প্রাপ্ত সমুদয় কাম্যবিষয় (ব); বাহ্য গৃহক্ষেত্রাদি, অন্তরস্থ মনোগত অভিলাষসকল। বিহায়—পরিত্যাগ করিয়া (শ); তৃণতুল্য বিবেচনায় উপেক্ষা করিয়া (ম)। নিস্পৃহঃ—শরীরজীবনমাত্রেও স্পৃহাশূন্য (শ, ম); 'ইহা আমার হউক' ঃ এই প্রকার স্পৃহা হইতে মুক্ত (নী)। নির্মমঃ—মমতাবর্জিত (শ), 'শরীরযাত্রামাত্রার্থেও ইহা আমার' ঃ এই অভিমানবর্জিত (শ, ম)। নিরহংকারঃ—বিদ্যাবত্তাদি নিমিত্ত আত্মাভিমানবর্জিত (শ), 'দেহেন্দ্রিয়ই আমি' ঃ এই প্রকার অভিমানশূন্য (ম); অনাত্মা দেহাদিতে আত্মাভিমানশূন্য (ব)। সঃ—এবম্ভূত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ (শ)। শান্তিম্‌—সর্বসংশয়োপরমক্ষমা নির্বাণাখ্যা শান্তি (শ)। অধিগচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মভূত হয় (শ); জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয় (ম), আত্মাকে দেখিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয় (ব)। চরতি—জীবনমাত্র রক্ষার নিমিত্ত ভোজন করে ও যথা তথা গমন করে (ব); সকল বিষয় ভোগ করে (নী)।

শ্লোকার্থ ঃ যে সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া সর্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য, কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত ও মমতারহিত হইয়া বিচরণ করেন (অর্থাৎ বিষয়-ভোগ করেন) তিনি পরম শান্তিলাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ সংসারে বিচরণ করিয়াও যোগী কিরূপে শান্তিলাভ করিতে পারেন এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। হৃদয়ের শান্তিলাভ করিতে হইলে সমস্ত কামনা-বাসনা বর্জন করিয়া সমস্ত ভোগ্য পদার্থে স্পৃহাশূন্য হইতে হইবে। কাম্য পদার্থ পাওয়ার জন্য যে তীব্র ইচ্ছা জন্মে—তাহাই স্পৃহা। এই পদার্থ আমার প্রিয়, ইহা আমি চাই, ইহা না হইলে আমার চলিবে না, যে প্রকারে হউক ইহা পাইতেই হইবে—ইহাই বাসনার তীব্র রূপ। ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। চিত্তকে সর্বদা কামনাবাসনা দ্বারা বিচলিত হইতে দেওয়া চলিবে না। বাসনার তীব্রতা না থাকিলেও অনেক স্থলে কাম্য বস্তুর প্রতি একটা আকর্ষণ থাকিয়া যায়। এই আকর্ষণও বর্জনীয়।

তারপর মায়াবর্জিত বা মমতাশূন্য হইতে হইবে। মমতা মানুষের চিত্তে নানা ভাবে, নানা আকারে প্রকাশ পায়। মানুষের দেহ এবং প্রাণ তাহার নিকট অতি প্রিয়। প্রাণ কেহই পরিত্যাগ করিতে চায় না; দেহের সুখদুঃখেও মানুষ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে। মমতার ইহাই প্রথম অভিব্যক্তি। তারপর আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঘর, আমার বাড়ী—এই প্রকারের মমত্ববুদ্ধি জন্মে। মনে হয় ইহারাই আমার সর্বস্ব, ইহারাই আমার সুখের হেতু, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতেই পারি না—ইহাই মমতার তীব্র রূপ। এই মমতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া আমার দেশ, আমার জাতি, আমার দল বা সম্প্রদায় ইত্যাদি আকার ধারণ করে। এই যে মমত্ববুদ্ধি অর্থাৎ 'আমার' 'আমার' বোধ ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে।

অহংকারও বর্জনীয়। অহংকারেরও একটা স্থূলরূপ আছে। অনেকে ধন, জন ও বিদ্যার গর্ব করিয়া বেড়ায়। আমি ধনী, আমি বিদ্বান, আমার কত উচ্চপদ, আমার কত বেতন, আমার কত ক্ষমতা—অনেক লোক ইহাতে গর্ব অনুভব করে। কেবল তাহা নহে, আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তায় তাহা বাহিরে প্রকাশ করে। ইহারা মূর্খ, দাম্ভিক। আবার কেহ কেহ মনে মনে গর্ব অনুভব করে বটে, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করে না। বাহিরে প্রকাশ হউক বা না হউক—আমি বড়, আমি বিদ্বান—এই প্রকারের যে অনুভূতি তাহাই অহংকারের স্থূলরূপ। ইহা অতি হেয় এবং

ঘৃণ্য, সুতরাং সর্বথা বর্জনীয়। আমি কর্তা, আমিই কর্ম করিতেছি—এই প্রকারের অনুভূতি অহংকারের সূক্ষ্মরূপ। এই আমিত্ববোধকেও বর্জন করিতে হইবে। এই প্রকারে স্পৃহাহীন, মমত্বরহিত ও অহংকারশূন্য হইয়া যিনি সংসারে বিচরণ করেন, যথাপ্রাপ্ত বিষয়ভোগ করেন, তিনিই শান্তিলাভের অধিকারী হন। কারণ কামনা, মমতা ও অহংকার—এই মনোবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ মানুষের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। সুতরাং সংসারে সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে হইলে ইহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

অন্বয় ঃ পার্থ (হে অর্জুন) এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ইহাই ব্রহ্মে স্থিতি) এনাং প্রাপ্য ন মুহ্যতি (ইহাকে পাইলে কেহই মোহ প্রাপ্ত হয় না) অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং স্থিত্বা (ইহাতে স্থিত থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্‌ ঋচ্ছতি (তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন)।

শব্দার্থ ঃ ব্রাহ্মী স্থিতিঃ—সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান (শ); ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা (শ্রী); সর্বকর্ম সন্ন্যাসপূর্বক পরমাত্মলক্ষণা ব্রহ্মবিষয়া স্থিতি (ম); ব্রহ্মপ্রাপিকা অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তদ্রূপ স্থিতি (ব, বি)। ন বিমুহ্যতি—পুনঃ সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না (শ্রী, নী); পুনরায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হন না (ম)। অন্তকালে অপি—শেষ বয়সেও (শ); মৃত্যু সময়েও (শ্রী); অন্তিম বয়সেও (রা)। অস্যাং স্থিত্বা—ক্ষণমাত্রও ইহাতে স্থিতি করিয়া (শ্রী); এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকিয়া (শ)।

শ্লোকার্থ ঃ হে অর্জুন, পূর্বোক্ত অবস্থাই ব্রহ্মে অবস্থান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা। এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিলে যোগী মোহপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে পতিত হন না এবং মৃত্যুকালেও এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত উপায়ে সমস্ত কামনাবাসনা বর্জনপূর্বক, কাম্যবস্তুতে স্পৃহা ত্যাগ করিয়া, মমত্ববুদ্ধি ও অহংকারপরিশূন্য হইয়া পরমাত্মাতে চিত্তের সমাধানকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। যে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী পুরুষ এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন, নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে নির্বাসন দিয়া বিরাট ব্রহ্মসত্তায় বাস করিতে শিখিয়াছেন তিনি জীবনে কখনও মোহের অধীন হন না, আত্মাকে হারাইয়া বিষয়কূপে মগ্ন হন না। মৃত্যুকালেও সেই ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন। গীতায় এই যে নির্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা বৌদ্ধমতানুযায়ী আত্মলোপসাধন নহে; ব্যক্তিগত সত্তাকে সেই এক অনন্ত সত্তার বিরাট সত্তের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়াকে গীতাতে নির্বাণ বলা হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ এত প্রবল যে ইহাদের আকর্ষণে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও (বিপশ্চিতঃ) পতন হয়। কিন্তু যিনি পরমাত্মাকে লাভ করিয়া নিজের আমিত্ব বিসর্জন দিয়া তাহাতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাঁহার আর এ-জীবনে পতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তিনি মোহের আক্রমণ হইতে চিরকালের তরে মুক্তিলাভ করেন। এমন কি মৃত্যুকালেও তিনি এই স্থিতি হইতে বিচলিত হন না। মৃত্যুকালে সাধারণ মানুষের একটা মরণ-মূর্ছা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মবিস্মৃতি ঘটে, জীবনে শাস্ত্রাচার্য হইতে যে জ্ঞান

অর্জিত হইয়াছিল, যে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছিল মরণের সময় সমস্তই সে ভুলিয়া যায়। এমন কি ইষ্টমন্ত্র মনে পড়ে না। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন মরণকালেও তাঁহার এই স্থিতির ভ্রংশ হয় না। তিনি ব্রহ্মেতেই সমাহিত থাকেন, তাঁহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্যক্তি নির্মম, নিরহংকার ও নিস্পৃহ হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তিনি সংসারের সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াও শান্তিলাভ করেন। এই যে শান্তি ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতির শান্তি। এই শ্লোকের 'এষা' শব্দে পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণিত অবস্থাই বুঝাইতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মী স্থিতির লক্ষণ হইতেছে নিস্পৃহতা, নির্মমতা ও নিরহংকার। এ প্রকারের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি সংসারে বিচরণ করিয়াও ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারেন। কাজেই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের পূর্বে অথবা পরে কোন অবস্থাতেই কর্মত্যাগের প্রয়োজন নাই। চিত্তের সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এই শান্তিলাভ করিতে হইলে কামনা, মমতা ও অহংকার ত্যাগ করিতে হইবে। কেবল কর্ম চিত্তের শান্তি নষ্ট করে না, কর্মের সহিত যে কামনা, বাসনা ও অহংকার জড়িত থাকে তাহাতেই চিত্তের শান্তি নষ্ট হয়। সুতরাং কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি যোগী—যিনি কামনা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে পারেন—তিনিই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের যোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ সারমর্ম ॥

অর্জুনের দুর্বলতা

প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অর্জুন শরাসন ত্যাগ করিয়া শোকার্ত হৃদয়ে রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্বজনের প্রতি কৃপাবিষ্ট শোকার্ত অর্জুনকে প্রথমে বুঝাইলেন যে তাঁহার যুদ্ধত্যাগ স্বধর্মোচিত নহে, ইহা অস্বর্গ্য এবং অকীর্তিকর। এই ক্লীবোচিত কাতরতা তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের যোগ্য নহে; অতএব হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। (১—৩)

অর্জুন তাঁহার দুর্বলতা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু নিজের হৃদয়কে কিছুতেই যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে না পারিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি কেমন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব? ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি ইঁহাদিগকে বধ করিতে চাহি না। কারণ এই সকল গুরুজনকে বধ করিয়া যে অর্থ ও কাম আমরা লাভ করিব তাহা গুরুজনের রুধিরলিপ্ত বলিয়াই আমাদের মনে হইবে এবং উহা কোনও প্রকারে সুখকর না হইয়া আমাদিগকে দারুণ দুঃখই প্রদান করিবে। কাজেই আমরা কৌরবদিগকে জয় করি, কি কৌরবেরা আমাদিগকে জয় করে—ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া আমাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও কণ্টকর সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাদের সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিত আছে। আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব দীনতাদোষে অভিভূত হইয়াছে, আমার পক্ষে কর্তব্য কি তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই তোমাকে ধর্মের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম; আমাকে শিক্ষা দাও। আমার চিত্তে যে ইন্দ্রিয়ের শোষণকারী দুর্জয় শোক উপস্থিত হইয়াছে তাহা তোমার উপদেশ ব্যতীত কিছুতেই দূর হইবে না, এমন কি নিষ্কণ্টক রাজত্ব ও দেবতাগণের আধিপত্য লাভেও নহে।

এই কথা বলিয়া অর্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক নীরব হইয়া রহিলেন। (৪—৯)

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জুনের যে যুদ্ধে অনিচ্ছা তাহার প্রধানতঃ চারিটি কারণ: (১) স্বজনগণের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কাজনিত শোক, (২) যুদ্ধের নৃশংসতা, স্বজনবধ এবং তজ্জনিত কুলক্ষয়, (৩) স্বজনবধে ইহকালে দারুণ দুঃখ এবং (৪) ঘোর পাপের দরুন পরকালে নরকবাস। তাই তিনি এক একটি করিয়া উহার উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। (১০)

অর্জুনের শোক

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে অর্জুনের দারুণ শোকের নিবৃত্তি না হইলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু সাধারণভাবে সান্ত্বনা দ্বারা এই শোক দূর করা

অসম্ভব। অজ্ঞান বা ভ্রম হইতেই শোকের উৎপত্তি, তাই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অর্জুনের ভ্রম নিরসনপূর্বক তাঁহার শোক দূর করিবার আশায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানই তোমার শোকের কারণ। তুমি দেহকেই আত্মা মনে করিতেছ। কাজেই ভীষ্ম, দ্রোণ ও অপর রাজন্যবৃন্দের দেহের বিনাশে তাঁহাদের আত্মার বিনাশ হইবে মনে করিয়া তুমি কাতর হইয়াছ। ইহা তোমার ভ্রম। আত্মা দেহাতিরিক্ত বস্তু। ভীষ্ম দ্রোণাদির মৃত্যুতে তাঁহাদের দেহেরই বিনাশ হইবে, আত্মার বিনাশ হইবে না। আত্মা অজ, সর্বব্যাপী, অবিনাশী, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য। ভীষ্মদ্রোণাদি ব্যক্তিগণ জন্মের পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু নাই, কাজেই শোকের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তারপর দেহেরও আত্যন্তিক বিনাশ হইবে না। আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করিবে। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ ভীষ্ম-দ্রোণাদি ব্যক্তিগণও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিবেন। কাজেই জীর্ণ বস্ত্র পরিবর্তনে মানুষের যেমন দুঃখ হয় না, ভীষ্মদ্রোণাদির এই জীর্ণ দেহ ত্যাগেও তোমার দুঃখ করা কর্তব্য নহে। (১১—৩০)

যুদ্ধে স্বজনবধ ও কুলক্ষয়

কথা হইতে পারে যে স্বজনের মৃত্যুর জন্য শোক না হইলেও যুদ্ধ ও প্রাণিহত্যা যে ঘোর নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রাণিহত্যার ব্যাপক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষতঃ স্বজনগণকে বধ করা কিছুতেই কর্তব্য হইতে পারে না। ইহাতে কুলক্ষয় এবং তাহার দরুন বিবিধ অনিষ্ট ফলের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এই আপত্তির উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়; ধর্মযুদ্ধ করা তোমার স্বধর্ম, তোমার কর্তব্য। অত্যাচারীর শাস্তিদান এবং ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করা প্রয়োজন হয় তবে ক্ষত্রিয়কে তাহা করিতেই হইবে। ইহাতে যদি প্রাণিবধ হয়, এমন কি, যদি আত্মীয়স্বজনের বিনাশ হয়, কুলক্ষয় হয় তাহা হইলেও ক্ষত্রিয় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না; কারণ ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোনও শ্রেয় নাই। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এরূপ যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে তুমি স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে। (৩১—৩৩)

স্বজনবধে ইহকালে দুঃখ

অর্জুনের তৃতীয় আপত্তি এই যে যুদ্ধ করিয়া স্বজনগণকে বধ করিলে ইহকালেই তাহাকে দারুণ দুঃখভোগ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—স্বধর্ম পালনার্থ যদি দুঃখভোগ করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। দুঃখভোগের ভয়ে ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে। তারপর যুদ্ধ না করিলেও তোমার দুঃখ কম হইবে না। কারণ লোকে চিরকাল তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিক। তোমার অহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক কটু কথা বলিবে। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি আছে! অতএব যদি ইহকালের সুখদুঃখের দিক দিয়াও বিবেচনা কর তবে তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। (৩৪—৩৬)

স্বজনবধের পাপ

অর্জুনের চতুর্থ আপত্তি হইল যে গুরুজন ও স্বজনগণকে বিনাশ করিলে তাঁহার দারুণ পাপ হইবে এবং তাহাতে তাঁহার পরলোকে নরকবাস নিশ্চিত। ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—স্বধর্ম পালনার্থ যদি স্বজনগণকে বধ করিতেও হয় তাহাতে পাপ হইবে না, বরং স্বধর্ম ও কীর্তিকে ত্যাগ করিলেই পাপ হইবে। যদি যুদ্ধে হত হও তবে তোমার স্বর্গবাস সুনিশ্চিত। তারপর তুমি যদি নিজের সুখভোগ বা জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ কর তবে তোমার পাপ হইতে পারে; কিন্তু যদি সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ তুল্য জ্ঞান করিয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর তবে কোনপ্রকারেই তোমার পাপ হইবে না। (৩৭—৩৮)

নিষ্কাম কর্মযোগ

এইরূপে অর্জুনের সমস্ত যুক্তি ও আপত্তির উত্তর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই বলিলেন—হে অর্জুন, তোমাকে ইতিপূর্বে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলিয়াছি, এক্ষণে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মের কথা বলিলাম। ইহাই কর্মযোগ। এই কর্মযোগ অবলম্বন করিলে কর্মজনিত সংসার-বন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ হইতে হইবে না। ইহাতে প্রারম্ভের নাশ নাই, কোন প্রত্যবায়েরও ভয় নাই। এই ধর্মের অনুসরণে অল্প কর্ম করিলেও তাহা মানুষকে সংসারের সমস্ত ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। এই নিষ্কাম কর্মযোগে ঈশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া তদর্থে তোমার সমস্ত কর্ম করিতে হইবে। এই ঈশ্বরাশ্রিতা বুদ্ধি এক এবং নিশ্চয়াত্মিকা, পক্ষান্তরে সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি নানাপ্রকার এবং নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। (৩৯—৪১)

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—ঐসকল কর্ম সকাম, উহাতে ভোগ ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়, কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। বেদসকল ত্রিগুণাত্মক কাম্যকর্মের প্রকাশক। কিন্তু হে অর্জুন, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও, সমস্ত দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ কর এবং যোগক্ষেমের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আত্মবান হও। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বেদে কোনও প্রয়োজন নাই। (৪২—৪৬)

নিষ্কাম কর্মযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন—হে অর্জুন, কর্মতেই তোমার অধিকার, কর্মফলে যেন তোমার অধিকার না হয়। তুমি ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কোনও কর্ম করিও না, অথচ ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না বলিয়া কর্ম না করিবার দিকেও যেন তোমার ঝোঁক না হয়। তুমি পরমেশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া কর্ম কর। চিত্তের সমভাবই যোগ। হে ধনঞ্জয়, ঈশ্বরে বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহা অপেক্ষা কাম্যকর্ম অতিশয় নিকৃষ্ট; সুতরাং এই বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। যাহারা ফলের নিমিত্ত কর্ম করে তাহারা অতি দীন। (৪৭—৪৯)

বুদ্ধিযোগের উৎকর্ষ ও ফল

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগের উৎকর্ষ ও ফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন—বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত দুষ্কৃত, পাপ পুণ্য উভয়েরই ঊর্ধ্বে উত্থিত হন; এই বুদ্ধিযোগেই ফলাকাঙ্ক্ষা কর্ম করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা বুদ্ধিকে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্ম করেন তাঁহারা জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষরূপ

অনাময় পদ লাভ করেন। হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা তোমার বুদ্ধি যখন মোহমুক্ত ও নির্মল হইবে তখন যে সকল কাম্যকর্মের ফলের কথা তুমি শুনিয়াছ বা পরে শুনিবে, তাহাতে আর তোমার স্পৃহা থাকিবে না। নানা শাস্ত্র ও লোকবাক্য শ্রবণদ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হইয়া ঈশ্বরে স্থিতিলাভ করিবে, তখনই তোমার স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হইবে। (৫০—৫৩)

এই স্থিতপ্রজ্ঞতার কথা শুনিয়া অর্জুন জানিতে চাহিলেন যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, তিনি কিরূপ কথা বলেন এবং কিরূপ আচরণ করেন। (৫৪)

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তে কোনও কামনাবাসনা স্থান পায় না। তাঁহার চিত্ত স্থির, অচঞ্চল; দুঃখে তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই, সুখে স্পৃহা নাই, তাঁহার আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ দূর হইয়াছে। তিনি মমত্ববুদ্ধিবর্জিত, কোন বস্তুতেই তাঁহার মমতাজনিত স্নেহ নাই; শুভ পাইলেও তিনি হৃষ্ট হন না, অশুভ পাইলেও তিনি দ্বেষ করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করেন এবং উহাদিগকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তঃস্থ করিয়া রাখেন। (৫৫—৫৮)।

ইন্দ্রিয়সংযমের আবশ্যকতা

উপরে যে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা বলা হইল এই ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। এই ইন্দ্রিয়সংযমের নিমিত্ত বিভিন্ন লোকে বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে দূরে পলায়ন করেন, কেহ কেহ উপবাস তপস্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের চেষ্টা করেন, আর বিবেকবান ব্যক্তিগণ বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমে ব্রতী হন। কিন্তু এই সকল বাহ্যিক উপায়ে ইন্দ্রিয় সম্যক্ বিজিত হয় না। এই প্রকারের সংযমীর পতনের সম্ভাবনা থাকে। পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া তাহাতে যুক্ত হইয়া থাকাই ইন্দ্রিয়সংযমের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। অতএব হে অর্জুন, তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) যুক্ত হইয় অবস্থান কর। (৫৯—৬১)

ইহার পর অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের কি প্রকারে বিনাশ হয় তাহাই বলা হইয়াছে। বিষয়ের সর্বদা চিন্তা করিলে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা ব্যাহত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে চিত্তের মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম হয়, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। (৬২—৬৩)

জিতেন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ

বিষয়ভোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে বিষয়ে বিচরণ করিয়াও স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা যায়। আসল কথা হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে, আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে, রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইলে ঐ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়ে বিচরণ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। চিত্ত প্রসন্ন হইলে সর্বপ্রকার দুঃখের উপশম হয় এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধিও শীঘ্র স্থির হয়। পক্ষান্তরে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি হয় না। যাহার ঈশ্বরচিন্তা নাই তাহার

শান্তিও নাই; অশান্তচিত্ত ব্যক্তির সুখও হইতে পারে না। একটি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলেই মানুষের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। কাজেই যোগীকে সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্থির হইবে। (৬৪—৬৮)

ব্রাহ্মী স্থিতি

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে জাগরিত; কিন্তু বিষয়ভোগে নিদ্রিত অর্থাৎ বিষয়ভোগে তাঁহার কোনও চেতনা বা চেষ্টা নাই। তাঁহার চিত্ত বিশাল সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল, নিথর, আত্মানন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ; কাম্যবিষয়সকল তথায় প্রবেশ করিলেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন, যিনি মমতাহীন ও অহংকারশূন্য, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ উপসংহারে বলিলেন—হে অর্জুন, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীর আর মোহ হয় না এবং মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া তিনি ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষলাভ করেন। (৬৯—৭২)